চৌধুরীর অভিযান

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

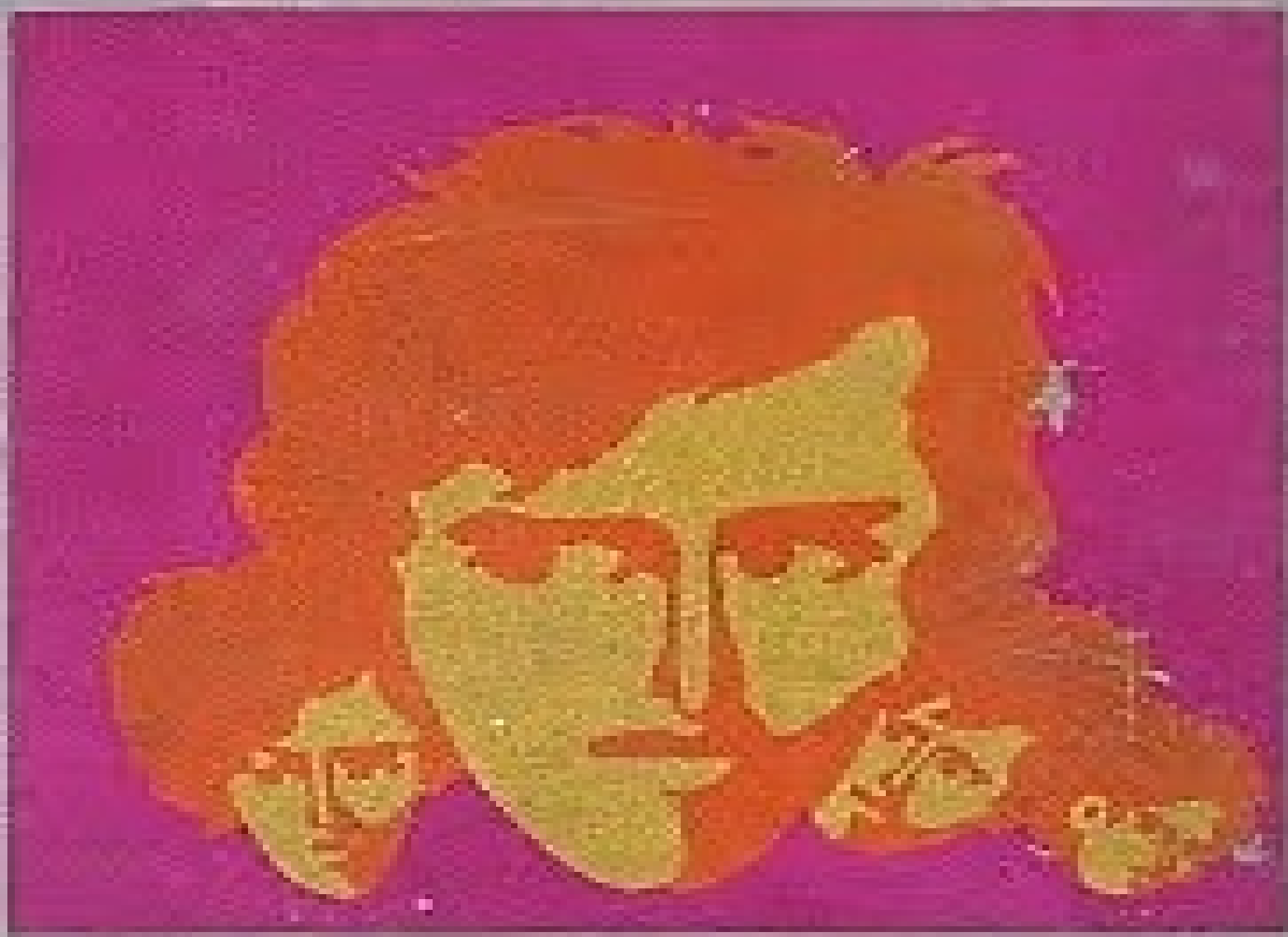

টেনিদার অভিযান

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স

মেসোমশায়ের অট্টহাসি

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। চাটুজ্যেদের রোয়কে আমাদের আড্ডা জমেছে। আমরা তিনজন আছি। সভাপতি টেনিদা, হাবুল সেন, আর আমি পালারাম বাঁড়ুজ্যে—পটলডাঙায় থাকি আর পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খাই। আমাদের চতুর্থ সদস্য ক্যাবলী এখনও এসে পৌঁছয়নি ।

চারজনে পরীক্ষা দিয়েছি । লেখাপড়ায় ক্যাবলা সবচেয়ে ভালো—হেডমাস্টার বলেছেন ও নাকি স্কলারশিপ পাবে। ঢাকাই বাঙাল হাবুল সেনটাও পেরিয়ে যাবে ফার্স্ট ডিভিশনে। আমি দু-বার অঙ্কের জন্যে ডিগবাজি খেয়েছি--এবার থার্ড ডিভিশনে পাশ করলেও করতে পারি। আর টেনিদা—

তার কথা না বলাই ভালো। সে ম্যাট্রিক দিয়েছে-কে জানে এনট্রান্সও দিয়েছে কি না। এখন স্কুল ফাইনাল দিচ্ছে-এর পরে হয়তো হায়ার সেকেন্ডারিও দেবে। স্কুলের ক্লাস টেন-এ সে একেবারে মনুমেন্ট হয়ে বসে আছে--তাকে সেখান থেকে টেনে এক ইঞ্চি নড়ায় সাধ্য কার।

টেনিদা বলে, হেঁ-হেঁ—বুঝলিনে? ক্লাসে দু-একজন পুরনো লোক থাকা ভালো—মানে, সব জানে-টানে আর কি! নতুন ছোকরাদের একটু ম্যানেজ করা চাই তো !

তা নতুন ছেলের ম্যানেজ হচ্ছে বইকি। এমনকি টেনিদার ডুঁদে বড়দা—যাঁর হাঁক শুনলে আমরা পালাতে পথ পাই না, তিনি স্বন্ধু ম্যানেজড় হয়ে এসেছেন বলতে গেলে। তিন-চার বছর আগেও টেনিদার ফেলের খবর এলে চেঁচিয়ে হাট বাধাতেন, আর টেনিদার মগজে ক-আউন্স, গোবর আছে তাই নিয়ে গবেষণা করতেন। এখন তিনিও হাল ছেড়ে দিয়েছেন । টেনিদার ফেল করাটা তাঁর এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে, হঠাৎ যদি পাশ করে ফেলে তা হলে সেইসঙ্গে তিনি একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে পড়বেন।

অতএব নিশ্চিন্তে আড্ডা চলছে। ওরই মধ্যে হতভাগ্য হাবুলটা একবার পরীক্ষার কথা তুলেছিল, টেনিদা নাক কুঁচকে বলেছিল, নেঃ--নেঃ-রেখে দে! পরীক্ষা-ফরীক্ষা সব জোচ্চুরি। কতকগুলো গাধা ছেলে গাদা-গাদা বই মুখস্থ করে আর টকাটক পাশ করে যায়। পাশ না করতে পারাই সবচেয়ে শক্ত; দ্যাখ না বছরের পর বছর হলে গিয়ে বসছি, সব পেপারের অ্যানসার লিখছি--তকু দ্যাখ কেউ আমাকে পাশ করাতে পারছে না। সব এগজামিনারকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছি। বুঝলি, আসল বাহাদুরি এখানেই।

আমি বললাম, যা বলেছ। এইজন্যেই তো দু-বছর তোমার শাগরেদি করছি। ছোটকাকা কান দুটো টেনে-টেনে প্রায় আধ-হাত লম্বা করে দিয়েছে—তবু ইস্কুল কামড়ে ঠিক বসে আছি!

টেনিদা বললে, চুপ কর, মেলা বকিসনি ! তোর ওপরে আমার আশা-ভরসা ছিল-ভেবেছিলুম, আমার মনের মতো শিষ্য হতে পারবি তুই। কিন্তু দেখছি তুই এক-নম্বর বিশ্বাসঘাতক ! কোন আক্কেলে অঙ্কের খাতায় ছত্রিশ লম্বর শুদ্ধ করে ফেললি? আর ফেললিই যদি, ঢ্যারা দিয়ে কেটে এলিনে কেন?

আমি ঘাড়-টাড় চুলকে বললাম, ভারি ভুল হয়ে গেছে। টেনিদা বললে, দুনিয়াটাই নেমকহারাম! মরুক গে! কিন্তু এখন কী করা যায় বল দিকি? পরীক্ষার পর শ্রেফ কলকাতায় বসে ভ্যারেন্ডা ভজিব? একটু বেড়াতে-টেড়াতে না গেলে কি ভালো লাগে?

আমি খুশি হয়ে বসলাম, বেশ তো চলে না। লিলুয়ায় আমার রাঙা-পিসিমার বাড়ি আছে-দুদিন সেখানে বেশ হই-হল্লা করে—

—থাম বলছি প্যালা-থামলি ?—টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, যেমন তোর ছাগলের মতো লম্বা লম্বা কান, তেমনি ছাগলের মতো বুদ্ধি। লিলুয়া! আহ ভেবে-চিন্তে কী একখানা জায়গাই বের করলেন। তার চেয়ে হাতিবাগান বাজারে গেলে ক্ষতি কী? ছাতের ওপরে উঠে হাওয়া খেলেই বা ঠ্যাকাচ্ছে কে? যতসব পিলে রুগি

নিয়ে পড়া গেছে, রামোঃ।

হাবুল সেন চিন্তা করে বললে, আর অ্যাকটা জায়গায় যাওন যায়। বর্ধমানে যাইবা? সেইখানে আমার বড়মামা হইল গিয়া পুলিশের ডি এস পি--

দুদ্দুর। সেই ধ্যাড়ধেড়ে বর্ধমান?--টেনিদা নাক কোঁচকাল: ট্রেনে চেপেছিস কি রক্ষে নেই-বর্ধমানে যেতেই হবে। মানে, যে-গাড়িতেই চড়বি-ঠিক বর্ধমানে নিয়ে যাবে। সেই রেলের বক-বক আর পি পি—প্লাটফর্মে যেন রথের মেলা। তবে-চাঁদির ওপরটা একবার চুলকে নিয়ে টেনিদা বললে-তবে হাঁ-সীতাভোগ মিহিদানা পাওয়া যায় বটে। সেদিক থেকে বর্ধমানের প্রস্তাবটা বিবেচনা করা যেতে পারে বইকি; অন্তত লিলুয়ার চাইতে ঢের ভালো।

রাঙা-পিসিমার বাড়িকে অপমান; আমার ভারি রাগ হল।

বললাম, সে তো ভালেই হয়। তবে, বর্ধমানের মশার সাইজ প্রায় চড়ুই পাখির মতো, তাদের গোটকয়েক মশারিতে ঢুকলে সীতাভোগ মিহিদানার মতো তোমাকেই ফলার করে ফেলবে। তাছাড়া -- আমি বলে চললাম--আরও আছে। শুনলে তো, হাবুলের মামা ডি. এস. পি। ওখানে যদি কারও সঙ্গে মারামরি বাঁধিয়েছ তা হলে আর কথা নেই-সঙ্গে সঙ্গে হাজতে পুরে দেবে।

টেনিদা দমে গিয়ে বললে, যাঃ-যাঃ—মেলা বকিসনি। কী রে হাবুল--তোর মামা কেমন লোক?

হাবুল ভেবে-টেবে বললে, তা , প্যালা নিতান্ত মিথ্যা কথা কয় নাই; আমার মামায় আবার মিলিটারিতে আছিল-মিলিটারি মেজাজ--

—এই সেরেছে। নাঃ—এ ঢাকার বাঙালটাকে নিয়ে পারবার জো নেই; ও সব বিপজ্জনক মামার কাছে খামকা মরতে যাওয়া কেন? দিবি আছি--মিথ্যে ফ্যাচাঙের ভেতরে কে পড়তে চায় বাপু।

আলোচনাটা এ-পর্যন্ত এসেছে—হঠাৎ বেগে ক্যাবলার প্রবেশ। হতে একঠোঙা আলু-কবলি।

—এই যে—কাবলা এসে পড়েছে। বলেই টেনিদা লাফিয়ে উঠল, তারপরেই চিলের মতে ছোঁ মেরে ক্যাবলার হাত থেকে কেড়ে নিলে আলু-কবলির ঠোঙাটা। প্রায় আদ্ধেকটা একেবারে মুখে পুরে দিয়ে বললে, কোত্থেকে কিনলি রে? তোফা বানিয়েছে তো !

আলুকাবলির শোকে ক্যাবলাকে বিমর্ষ হতে দেখা গেল না। বরং ভারি খুশি হয়ে বললে, মোড়ের মাথায় একটা লোক বিক্রি করছিল।

—এখনও আছে লোকটা? আরও আনা-চারেক নিয়ে আয় না! ক্যাবল বললে, ধ্যাৎ, আলু-কবলি কেন? পোলাও--মুরগি—চিংড়ির কাটলেট-আনরিসের চাটনি-দই-রসগোল্লা--

টেনিদা বললে, ইস, ইস,—আর বলিসনি! এমনিতেই পেট চুই-চুই করছে, তার ওপরে ওসব বললে একদম হার্টফেল করব।

ক্যাবলা হেসে বললে, হার্টফেল করলে তুমিই পস্তাবে; আজ রাত্তিরে আমাদের বাড়িতে এ-সবই রান্না হচ্ছে কিনা? আর মা তোমাদের তিনজনকে নেমন্তন্ন করতে বলে দিয়েছেন।

শুনে আমরা তিনজনেই একেবারে থ। পুরো তিন মিনিট মুখ দিয়ে একটা রা বেরুলো না।

তারপর তিড়িং করে একটা লাফ দিয়ে টেনিদা বললে, সত্যি বলছিস ক্যাবলা—সত্যি বলছিস? রসিকতা করছিস না তো?

ক্যাবলা বললে, রসিকতা করব কেন? রাঁচি থেকে মেসোমশাই এসেছেন যে তিনিই তো বাজার করে আনলেন।

—আর মুরগি? মুরগি আছে তো? দেখিস ক্যাবলা—বামুনকে আশা দিয়ে নিরাশ করিসনি ! পরজন্মে তাহলে তোকে কিন্তু মুরগি হয়ে জন্মাতে হবে-খেয়াল থাকে যেন!

—সে-ভাবনা নেই। আধ-ডজন দড়ি-বাঁধা মুরগি উঠনে ক্যাঁ-ক্যাঁ করছে দেখে এলাম।

ট্রিম-ট্রিম-টু-লা-লা-লা--লা—

টেনিদা আনন্দে মেটে উঠল; সেইসঙ্গেআমরা তিনজন কোরাস ধরলাম। গলি দিয়ে একটি নেড়ি কুকুর আসছিল-~সেটা ঘাঁক করে একটা ডাক দিয়েই লাজ গুটিয়ে উল্টেদিকে ছুটে পালাল।

রাত্তিরে যাওয়ার তা ব্যবস্থা হল—-সে আর কী বলব! টেনিদার খাওয়ার বহর দেখে মনে হচ্ছিল, এর পরে ও আর এমনি উঠতে পারবে না-ক্রেনে করে তুলতে হবে। সের দুই মাংসের সঙ্গে ডজন খানেক কাটলেট তো খেলই--এর পরে প্লেট-ফ্লেটসুদ্ধু খেতে আরম্ভ করবে এমনি আমার মনে হল।

খাওয়ার টেবিলে আর-একজন মজার মানুষকে পাওয়া গেল। তিনি ক্যাবলার মেসোমশাই। ভদ্রলোক কত গল্পই না জানেন। একবার শিকার করতে গিয়ে বুনো মোষের ল্যাজ ধরে কেমন বন-বন করে ঘুরিয়েছিলেন, সে-গল্প শুনে হাসতে-হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরবার জো হল। আর-একবার নাকি গাছের ডাল ভেঙে সোজা বাঘের পিঠের উপর পড়ে গিয়েছিলেন-বাঘ তাঁকে টপাৎ করে খেয়ে ফেলা দূরের কথা—সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান! বোধহয় ভেবেছিল তাকে ভূতে ধরেছে। এমনকি সবাই মিলে জলজান্ত বাঘকে যখন খাঁচায় পুরে ফেলল—তখনও তার জ্ঞান হয়নি। শেষকালে নাকি স্মেলিং সল্ট শুকিয়ে আর মাথায় জলের ছিটে দিয়ে তবে বাঘের মূর্ছা ভাঙাতে হয়।

খাওয়ার পর ক্যাবলাদের ছাতে বসে এইসব গল্প হচ্ছিল। ইজি-চেয়ারে বসে একটার পর একটা সিগারেট খেতে খেতে গল্প বলছিলেন ক্যাবলার মেসোমশাই-আর আমরা মাদুরে বসে শুনছিলাম; মেসোমশাইয়ের টাকের ওপর চাঁদের আলো চিকচিক করছিল—থেকে-থেকে লালচে আগুনে অদ্ভুত মনে হচ্ছিল তাঁর মুখখানা।

মেসোমশাই বললেন, ছুটিতে বেড়াতে যেতে চাও? আমি একজায়গায় যাওয়ার কথা বলতে পারি। অমন সুন্দর স্বাস্থ্যকর জায়গা আশেপাশে বেশি নেই।

ক্যাবল বললে, রাঁচি?

মেসোমশাই বললেন, না—-না, এখন বেজায় গরম পড়ে গেছে ওখানে? তা ছাড়া বড় ভিড়-ও সুবিধে হবে না।

টেলিদা বললে, দার্জিলিং, না শিলং?

মেসোমশাই বললেন, বেজায় শীতঃ গরমে পুড়তে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু শীতে জমে যেতেই বা কী সুখ, সে আমি ভেবে পাইনে। ও-সব নয়।

আমার একটা কিছু বলার দরকার এখন। কিন্তু কিছুই মনে এল না। ফস করে বলে বসলাম, তা হলে গোবরডাঙা?

—চুপ কর বলছি প্যালা—চুপ কর –টেনিদা দাঁত খিঁচোল—নিজে এক-নম্বর গোবর-গণেশ-গোবরডাঙা আর লিলুয়া ছাড়া আর কী বা খুঁজে পাবি?

মেসোমশাই বললেন, থামো-থামো। ও-সব নয় আমি যে-জায়গার কথা বলছি, কলকাতার লোকে তার এখনও খবর রাখে না। জায়গাটা রাঁচির কাছাকাছি বটে—হাজারিবাগ আর রামগড় থেকে সেখানে যাওয়া যায়। বাস থেকে নেমে গোরুর গাড়ি চড়ে মাইল-তিনেক পথ ভারি সুন্দর জায়গা-শাল আর মহুয়ার বন, একটা লেক রয়েছে—তাতে টলটলে নীল জল দিনের বেলাতেই হরিণ দেখা যায়—খরগোশ আর বন-মুরগি ঘুরে বেড়ায়। কাছেই সাঁওতালদের বস্তি, দুধ আর মাংস খুব শস্তায় পাওয়া যায়—লেকেও কিছু মাছ আছে—দু-পয়সা চার পয়সা সের। আর সেইখানে পাহাড়ের একটা টিলার ওপর একটা খাসা বাংলো আমি কিনেছি। বাংলোটা এক সাহেব তৈরি করিয়েছিল--বিলেত যাওয়ার আগে আমাকে বেঁচে দিয়ে গেছে। চমৎকার

বাংলো। তার বারান্ডায় বসে কতদূর পর্যন্ত যে দেখতে পাওয়া যায় ঠিক নেই। পাশেই ঝরনা—বারো মাস তির-তির করে জল বইছে। ওখানে গিয়ে যদি একমাস থাকো-—এই রোগ প্যাঁকাটির দল সব একেবারে ভীম-ভবানী হয়ে ফিরে আসবে।

টেনিদা পাহাড়-প্রমাণ আহার করে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পড়েছিল, তড়াক করে উঠে বসল।

—আমরা যাব; আমরা চারজনেই! মেসোমশাই আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, সে তো ভালো কথাই! কিন্তু একটা মুস্কিল আছে যে!

—কী মুস্কিল?

—কথাটা হল-ইয়ে-মানে বাড়িটার কিছু গোলমাল আছে।

--গোলমাল কিসের ?

—ওখানকার সাঁওতালরা বলে, বাড়িটা নাকি দানো-পাওয়া। ওখানে মাকি অপদেবতার উপদ্রব হয় মধ্যে-মধ্যে। কে যেন দুম-দাম করে হেঁটে বেড়ায়--অদ্ভুতভাবে চেঁচিয়ে ওঠে—অথচ কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। আমি অবশ্য বাড়িটা কেনবার পরে মাত্র বার-তিনেক গেছি—তাও সকালে পৌঁছেছি, আর সন্ধেবেলায় চলে এসেছি। কাজেই রাত্তিরে ওখানে কী হয় না হয় কিছুই টের পাইনি। তাই ভাবছি—ওখানে যেতে তোমাদের সাহসে কুলোবে কি না!

টেনিদা বললে, ছোঃ! ওসব বাজে কথা ; ভূত-টুত বলে কিছু নেই মেসোমশাই। আমরা চারজনেই যাব। ভূত যদি থাকেই, তাহলে তাকে একেবারে রাঁচির পাগলাগারদে পাঠিয়ে দিয়ে তবে ফিরে আসব কলকাতায়। আর কিন্তু তারপরেই আর কিছু বলতে পারল না টেনিদা-হঠাৎ থমকে গিয়ে দুহাতে হাবুল সেনকে প্রাণপণে জাপটে ধরল।

হাবুল ঘাবড়ে গিয়ে বললে, আহা-হা—কর কী, ছাইড়া দাও, ছাইড়া দাও। গলা পর্যন্ত খাইছি, প্যাটটা ফাইট যাইব যে!

টেনিদা তবু ছাড়ে না। আরও শক্ত করে হাবলুকে জাপটে ধরে বললে, ও কী-ও কী-বাড়ির ছাতে ও কী।

আকাশে চাঁদটা ঢাকা পড়েছে একফালি কালো মেঘের আড়ালে। চারিদিকে একটা অদ্ভুত অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে পাশের বাড়িতে ছাতে কার যেন দুটো অমানুষিক চোখ দপদপ করে জ্বলছে।

আর সেই মুহূর্তে ক্যাবলার মেসোমশাই আকাশ ফটিয়ে প্রচণ্ড অট্টহাসি করে উঠলেন। সে-হাঁসিতে আমার কান বোঁ-বোঁ করে উঠল, পেটের মধ্যে খটখটিয়ে নড়ে উঠল পালাজ্বরের পিলে--মনে হল মুরগি টুরগিগুলো বুঝি পেট-ফেট চিরে কঁকঁ--ক করতে করতে বেরিয়ে আসবে।

এমন বিরাট কিম্ভূত অট্টহাসি জীবনে আর কখনও শুনিনি।

যোগ-সর্পের হাঁড়ি

একে তো ক্যাবলার মেসোমশাইয়ের ওই উৎকট অট্টহাসি—তারপর আবার পাশের বাড়ির ছাতে দুটো আগুন-মাখা চোখ! 'জয় মা কালী' বলে সিঁড়ির দিকে ছুট লাগাব ভাবছি, এমন সময়—মিয়্যাঁও—মিয়্যাঁও—মিয়্যাঁও —

সেই জ্বলন্ত চোখের মালিক এক লাফে ছাতের পাঁচিলে উঠে পড়ল, তারপর আর-এক লাফে আর-এক বাড়ির কার্নিশে ।

পৈশাচিক অট্টহাসিটা থামিয়ে মেসোমশাই বললেন, একটা হুলো-বেড়াল দেখেই চোখ কপালে উঠল, তোমরা যাবে সেই ডাক-বাংলোয়!—ভেংচি কাটার মতো করে আবার খানিকটা খ্যাঁকখেঁকে হাসি হাসলেন ভদ্রলোক : বীর কী আর গাছে ফলে!

আমাদের ভেতর ক্যাবলাটা বোধহয় ভয়-টয় বিশেষ পায়নি—এক নম্বরের বিচ্ছু ছেলে। তাই সঙ্গে সঙ্গেই বললে, না—পটোলের মতো পটলডাঙায় ফলে।

টেনিদার কাছে থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে হাবুল হাঁসফাঁস করে বললে,'কিংবা ঢ্যাঁড়সের মতন গাছের ওপর ফলে।

এবার আমাকেও কিছু বলতে হল: কিংবা চালের ওপর চাল-কুমড়োর মতো ফলে। টেনিদা দম নিচ্ছিল এতক্ষণ, এবার দাঁত খিঁচিয়ে উঠল,—থাম থাম সব—বাজে বকিসনি! সত্যি বলছি মেসোমশাই—ইয়ে—আমরা একদম ভয় পাইনি। এই প্যালাটা বেজায় ভিতু কিনা, তাই ওকে একটু ঠাট্টা করছিলাম।

বা রে, মজা মন্দ নয় তো! শেষকালে আমার ঘাড়েই চালাবার চেষ্টা। আমার ভীষণ রাগ হল। আমি ছাগলের মতো মুখ করে বললাম, না মেসোমশাই, আমি মোটে ভয় পাইনি। টেনিদার দাঁত-কপাটি লেগে যাচ্ছিল কিনা, তাই চেঁচিয়ে ওকে সাহস দিচ্ছিলাম ।

—ইঃ, সাহস দিচ্ছিল। ওরে আমার পাকা পালোয়ান রে —টেনিদা নাক-টাক কুঁচকে মুখটাকে আমের মোরব্বার মতো করে বললে, দ্যাখ প্যালা, বেশি জ্যাঠাম করবি তো এক চড়ে তোর কান দুটোকে কানপুরে পাঠিয়ে দেব!

মেসোমশাই বললেন, আচ্ছা থাক, থাক। তোমরা যে বীরপুরুষ এখন তা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু আসল কথা হোক। তোমরা কি সত্যিই ঝণ্টিপাহাড়ে যেতে চাও?

ঝণ্টিপাহাড়। সে আবার কোথায়? যা-বাববা, সেখানে মরতে যাব কেন ?—টেনিদা চটাং করে বলে ফেলল।

মেসোমশাই বললেন, কী আশ্চর্য—এক্ষুনি তো সেখানে যাওয়ার কথা হচ্ছিল।

–তাই নাকি?—টেনিদা মাথা চুলকে বললে, বুঝতে পারিনি। তবে কিনা—ঝণ্টিপাহাড় নামটা, কী বলে —ইয়ে—তেমন ভালো নয়।

হাবুল বললে, হ, বড়ই বদখত।

আমি বললাম, শুনলেই মনে হয় ব্রহ্মদৈত্য আছে।

মেসোমশাই আবার খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে বললেন, তার মানে তোমরা যাবে না? ভয় ধরছে বুঝি?

টেনিদা এবার তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তারপর সাঁ করে একটা বুক-ডন দিয়ে বললে, ভয়? দুনিয়ায় আছে বলে আমি জানিনে –নিজের বুকে একটা থাপ্পড় মেরে বললে, কেউ না যায়—হাম জায়েঙ্গা! একাই জায়েঙ্গা!

ক্যাবলা বললে, আর যখন ভূতে ধরেঙ্গা? .

—তখন ভূতকে চাটনি বানিয়ে খায়েঙ্গা! –টেনিদা বীররসে চাগিয়ে উঠল সত্যি, কেউ না যায় আমি একাই যাব!

হঠাৎ আমার ভারি উৎসাহ হল।

—আমিও যাব!

ক্যাবলা বললে, আমিও!

হাবুল সেন ঢাকাই ভাষায় বললে, হ, আমিও জামু!

মেসোমশাই বললেন, তোমরা ভয় পাবে না?

টেনিদা বুক চিতিয়ে বললেন, একদম না!

আমিও ওই কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ হতভাগা ক্যাবলা একটা ফোড়ন কেটে দিলে—তবে, রাত্তিরবেলা হুলোবেড়াল দেখলে কী হবে কিছুই বলা যায় না।

মেসোমশাই আবার ছাত-ফাটানো অট্টহাসি হেসে উঠলেন। টেনিদা গর্জন করে বললে, দ্যাখ কাবলা, বেশি বকবক করবি তো এক ঘুষিতে তোর নক—

আমি জুড়ে দিলাম : নাসিকে পাঠিয়ে দেব !

—যা বলেছিস ! একখানা কথার মতো কথা —এই বলে টেনিদা এমনভাবে আমার পিঠ চাপড়ে দিলে যে, আমি উহু-উহু শব্দে চেঁচিয়ে উঠলাম।

তার পরের খানিকটা ঘটনা সংক্ষেপে বলে যাব। কেমন করে আমরা চার মূর্তি বাড়ি থেকে পারমিশন আদায় করলাম সে-সব কথা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। সে-সব এলাহি কাণ্ড এখন থাক। মোট কথা, এর তিনদিন পরে, কাঁধে চারটে সুটকেশ আর বগলে চারটে সতরঞ্চি জড়ানো বিছানা নিয়ে আমরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছুলাম।

ট্রেন প্রায় ফাঁকাই ছিল । এই গরমে নেহাত মাথা খারাপ না হলে আর কে রাঁচি যায়?

ফাঁকা একটা ইন্টার ক্লাস দেখে আমরা উঠে পড়লাম, তারপর চারটে বিছানা পেতে নিলাম।

ভাবলাম, বেশ আরামে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি, হঠাৎ টেনিদা ডাকল—এই প্যালা !

—আবার কী হল!

—ভারি খিদে পেয়েছে মাইরি! পেটের ভেতর যেন একপাল ছুঁচো বক্সিং করছে !

বললাম, সে কী এই তো বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে প্রায় তিরিশখানা লুচি আর সের-টাক মাংস সাবাড় করে এলে! গেল কোথায় সেগুলো?'

হাবুল বললে, তোমার প্যাটে ভস্মকীট ঢুইক্যা বসছে !

টেনিদা বললে, যা বলেছিস। ভস্মকীটই বটে। যা ঢোকে সঙ্গে সঙ্গে স্রেফ ভস্ম হয়ে যায়! বলেই দরাজভাবে হাসল: বামুনের ছেলে, বুঝলি—সাক্ষাৎ অগস্ত্য মুনির বংশধর। বাতাপি ও ইম্বল-ফিম্বল যা ঢুকবে দেন-অ্যান্ড-দেয়ার হজম হয়ে যাবে। হুঁ-হুঁ –এরই নাম ব্রহ্মতেজ !

ক্যাবলা বলে বসল : ঘোড়ার ডিমের বামুন তুমি৷ পৈতে আছে তোমার?

—পৈতে? টেনিদা একটা ঢোক গিলল : ইয়ে, ব্যাপারটা কী জানিস? গরমের সময় পিঠ চুলকোতে গিয়ে কেমন পটাং করে ছিড়ে যায়। তা আদত বামুনের আর পৈতের দরকার কী, ব্রহ্মতেজ থাকলেই হল। কিন্তু সত্যি, কী করা যায় বল তো? পেটের ভেতর ছুঁচোগুলো যে রেগুলার হাডু-ডু খেলছে !

ক্যাবলা বললে, তা আর কী করবে! তুমি রেফারিগিরি করো।

—কী বললি ক্যাবলা?

—কী আর বলব—কিছুই বলিনি—বলেই ক্যাবলা বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ল।

হাবুল সেন এর মধ্যে বলে বসল, প্যাটে কিল মাইরা বইস্যা থাকো।

—কার পেটে কিল মারব? তোর?—বলে ঘুষি বাগিয়ে টেনিদা উঠে পড়ে আর কি!

হাবুল চটপট বলে বসল, আমার না—আমার না—প্যালার।

বা-রে, এ তো বেশ মজা দেখছি। মিছিমিছি আমি কেন পেটে কিল খেতে যাই? তড়াক করে একটা বাঙ্কের ওপর উঠে বসে আমি বললাম, আমি কেন কিল খাব? কী দরকার আমার?

টেনিদা বললে, খেতেই হবে তোকে! হয় আমায় যা-হোক কিছু খাওয়া, নইলে শুধু কিল কেন—রাম-কিল আছে তোর বরাতে। ওই তো কত ফিরিওলা যাচ্ছে—ডাক না একটাকে। পুরি-কচৌরি, কমলালেবু চকোলেট —ডালমুট—

—আমি তো দেখছি একটা জুতো-ব্রাশ যাচ্ছে। ওকেই ডাকব?—আমি নিরীহ গলায় জানতে চাইলাম।

—তবে রে—বলে টেনিদা প্রায় তেড়ে আসছিল আর আমি জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ব কি না ভাবছিলুম, এমন সময় ঢনাঢঢন করে ঘণ্টা বাজল । ইঞ্জিনে ভোঁ করে আওয়াজ হল—আর গাড়ি নড়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে আর একজন ঢুকে পড়ল কামরায়, তার হাতে এক প্রকাণ্ড সন্দেহজনক চেহারার হাঁড়ি । আর তক্ষুনি পেছন থেকে কে যেন কী-একটা ছুঁড়ে দিলে। সেটা পড়বি তো পড়, একেবারে টেনিদার ঘাড়ের ওপর । টেনিদা হাই-মাই করে উঠল।

তারপরে চোখ পাকিয়ে 'এটা কী হল মশাই—বলতে গিয়েই স্পিকটি নট ! সঙ্গে সঙ্গে আমরাও !

গাড়িতে যিনি ঢুকেছেন তাঁর চেহারাখানা দেখবার মতো। একটি দশাসই চেহারার সাধু। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, দাড়িগোঁফে মুখ একেবারে ছয়লাপ। গলায় অ্যাই মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে লাল টকটকে সিঁদুরের তিলক আঁকা, পায়ে শুঁড়-তোলা নাগরা ।

হাতের সন্দেহজনক হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে সাধুবাবা বললেন, ঘাবড়ে যেও না বৎস-ওটা আমার বিছানা। তাড়াহুড়োতে আমার শিষ্য জানালা গলিয়ে ছুড়ে দিয়েছে। তোমার বিশেষ লাগেনি তো?

—না, তেমন আর কী লেগেছে বাবা! তবে সাতদিনে ঘাড়ের ব্যথা ছাড়লে হয়!—টেনিদা ঘাড় ডলতে লাগল। আমি কিন্তু ভারি খুশি হয়ে গেলাম সাধুবাবার ওপরে। যেমন আমার পেটে কিল মারতে এসেছিল—বোঝে এবার !

সাধুবাবা হেসে বললেন, একটা বিছানার ঘায়েই কাবু হয়ে পড়লে বৎস, আর আমার কাঁধে একবার একটা আস্ত কাবুলিওয়ালা এক মন হিংয়ের বস্তা নিয়ে বাঙ্ক থেকে পড়ে গিয়েছিল। তবু আমি অক্কা পাইনি—সাতদিন হাসপাতালে থেকেই সামলে নিয়েছিলুম। বুঝেছ বৎস—এরই নাম যোগবল!

—তবে তো আপনি মহাপুরুষ স্যার—দিন দিন পায়ের ধুলো দিন –বলেই টেনিদা ঝাঁ করে সাধুবাবাকে একটা প্রণাম ঠুকে বসল।

সাধু বললেন, ভারি খুশি হলুম—তোমার সুমতি হোক। তা তোমরা কারা? এমন দল বেঁধে চলেছই বা কোথায়?

—প্রভু, আমরা রামগড়ে যাচ্ছি। বেড়াতে। আমার নাম টেনি—খুড়ি, ভজহরি মুখুজ্যে। এ হচ্ছে প্যালারাম বাঁড়ুজ্যে—খালি জ্বরে ভোগে আর পেটে মস্ত একটা পিলে আছে। এ হল হাবুল সেন—যদিও ঢাকাই বাঙাল, কিন্তু আমাদের পটলডাঙা থান্ডার ক্লাবে অনেক টাকা চাঁদা দেয়। আর ও হল ক্যাবলা মিত্তির, ক্লাসে টকাটক ফার্স্ট হয় আর ওদের বাড়িতে আমাদের বিস্তর পোলাও-মাংস খাওয়ায়।

—পোলাও-মাংস ! আহ!—তা বেশ—দাড়ির ভেতরে সাধুবাবা যেন নোলার জল সামলালেন মনে হল: তা বেশ—তা বেশ !

—বাবা, আপনি কোন্ মহাপুরুষ—হাবুল সেন হাত জোড় করে জানতে চাইল।

—আমার নাম? স্বামী ঘুটঘুটানন্দ।

—ঘুটাঘুটানন্দ ওরে বাবা —ক্যাবলার স্বগতোক্তি শোনা গেল।

—এতেই ঘাবড়ালে বৎস ক্যাবল? আমার গুরুর নাম কী ছিল জানো? ডমরু-ঢক্কা-পট্টানানন্দ; তাঁর গুরুর নাম ছিল উচ্চণ্ড-মার্তণ্ড-কুক্কুটডিম্বভর্জনন্দ; তাঁর গুরুর নাম ছিল—

—আর বলবেন না প্রভু ঘুটঘুটানন্দ—এতেই দম আটকে আসছে। এরপর হার্টফেল করব!—বাঙ্কের ওপর থেকে এবার কথাটা বলতেই হল আমাকে।

শুনে ঘুটঘুটানন্দ করুণার হাসি হাসলেন : আহা—নাবালক। তা, তোমাদের আর দোষ কী—আমার গুরুদেবের উর্ধ্বতন চতুর্থ গুরুর নাম শুনে আমারই দু-দিন ধরে সমানে হিক্কা উঠেছিল। সে যাক—তোমরা চারজন আছ দেখছি, যাবেও রামগড়ে। আমি নামব মুরিতে—সেখান থেকে রাঁচি। তা বৎসগণ, আমার যোগনিদ্রা একটু প্রবল—চট করে ভাঙতে চায় না। মুরিতে গাড়ি ভোরবেলায় পৌছয়—যদি উঠিয়ে দাও বড় ভাল হয় ।

— সেজন্য ভাববেন না প্রভু, ঘাটশিলাতেই উঠিয়ে দেব আপনাকে। —ক্যাবলা আশ্বাস দিলে।

—না—না বৎস, অত তাড়াতাড়ি জাগাবার দরকার নেই। ঘাটশিলায় মাঝরাত।

—তাহলে টাটানগরে?

—সেটা শেষরাত, বৎস—অত ব্যস্ত হয়ো না। মুরিতে উঠিয়ে দিলেই চলবে।

টেনিদা বললে, আচ্ছা তাই দেব। এবার আপনি যোগনিদ্রায় শুয়ে পড়তে পারেন।

—তা পারি। —ঘুটঘুটানন্দ এবার চারিদিকে তাকালেন ; কিন্তু শোব কোথায়? চারজনে তো চারটে নীচের বেঞ্চি দখল করে বসেছ। আমি সন্ন্যাসী মানুষ—বাঙ্কে উঠলে যোগনিদ্রার ব্যাঘাত হবে।

টেনিদা বললে, আপনি উঠবেন কেন প্রভু—প্যালা বাঙ্কে শোবে। ও ব্যাঙ্কে শুতে ভীষণ ভালবাসে।

দ্যাখো তো—কী অন্যায় ! বাঙ্কে ওঠা আমি একদম পছন্দ করি না, খালি মনে হয় কখন ছিটকে পড়ে যাব —আর টেনিদা কিনা আমাকেই—

আমি বললাম, কক্ষনো না—বাঙ্কে শুতে আমি মোটেই ভালোবাসি না!

টেনিদা চোখ পাকাল।

—দ্যাখ প্যালা—সাধু-সন্নিসি নিয়ে ফাজলামো করিসনি—নরকে যাবি! প্রভু, আপনি প্যালার বিছানা ফেলে দিয়ে ওইখানেই লম্বা হোন—প্যালা যেখানে হোক শোবে ।

—আহা, বেঁচে থাকো বৎস—বলে ঘুটঘুটানন্দ আমার বিছানা ওপরে তুলে দিয়ে নিজের বিছানাটা পাতলেন । আমি জুলজুল করে চেয়ে রইলাম।

তারপর শোয়ার আগে সেই সন্দেহজনক হাঁড়িটি নিজের বেঞ্চির তলায় টেনে নিলেন । টেনিদা অনেকক্ষণ লক্ষ করছিল, জিজ্ঞেস করল, হাঁড়িতে কী আছে প্রভু ?

শুনেই ঘুটঘুটানন্দ চমকে উঠলেন; হাঁড়িতে? হাঁড়িতে বড় ভয়ঙ্কর জিনিস আছে বৎস। যোগসর্প!

—যোগসপ ?—হাবুল বললে, সেইটা আবার কী প্রভু ?

ঘুটঘুটানন্দ চোখ কপালে তুলে বললেন, সে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার! ভীষণ সমস্ত বিষধর সাপ—তপস্যাবলে আমি তাদের বন্দি করে রেখেছি। তারা দুধকলা খায় আর হরিনাম করে ।

—সাপে হরিনাম করে —আমি জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারলুম না।

—তপস্যায় সব হয় বৎস! ঘুটঘটানন্দ হাসলেন : তা বলে তোমরা ওর ধারেকাছে যেও না ! যোগবল না থাকলে বোঁ করে ছোবল মেরে দেবে । সাবধান !

—আজ্ঞে আমরা খুব সাবধানে থাকব—টেনিদা গোবেচারির মতো বললে ।

ঘুটাঘুটানন্দ আর-একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন । বললেন, হ্যাঁ, খুব সাবধান ! ওই হাঁড়ির দিকে ভুলেও তাকিও না। —তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ি ?

—পড়ুন ।

তারপর পাঁচ মিনিট কাটল না। ঘর ঘর ঘরাৎ করে ঘুটঘুটানন্দের নাক ডাকতে লাগল। বাঙ্কের উপরে দুলুনি খেতে খেতে আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। হঠাৎকার যেন খোঁচা খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, টেনিদা, আমার পাঁজরায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

—নেমে আয় না গাধাটা । সাধুবাবা জেগে উঠলে তখন লবডঙ্কা পাবি । চেয়ে দেখি, টেনিদার বিছানার ওপর যোগসপের হাঁড়ি । আর তার ঢাকনা খুলে ক্যাবলা আর হাবুল সেন পটাপট রসগোল্লা আর লেডিকেনি সাবড়ে দিচ্ছে ।

টেনিদা আবার ফিসফিসিয়ে বললে, হাঁ করে দেখছিস কী ? নেমে আয় শিগগির । যোগসর্পের হাঁড়ি শেষ করে আবার তো মুখ বেঁধে রাখতে হবে ।

আর বলবার দরকার ছিল না। একলাফে নেমে পড়লুম এবং এক থাবায় দুটো লেডিকেনি তুলে ফেললুম।

টেনিদা এগিয়ে এসে বললে, দাঁড়া দাঁড়া—সবগুলো মেরে দিসনি ! দুটো-একটা আমার জন্যেও রাখিস ।

ট্রেন টাটানগর ছেড়ে আবার অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। স্বামী ঘুটঘুটানন্দের নাক সমানে ডেকে চলল : ঘরাৎ—ফোঁ—ফরর ফোঁ—ফুরুৎ—ফুর্‌র্‌-—

চারজনে মিলে যেভাবে আমরা স্বামী ঘুটঘুটানন্দের হাঁড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম, তাতে সেটা চিচিং ফাঁক হতে পাঁচ মিনিট সময় লাগল না। অর্ধেকের ওপর টেনিদা সাবড়ে দিলে—বাকিটা আমি আর হাবুল সেন ম্যানেজ করে নিলুম। বয়েসে ছোট ক্যাবলাই বিশেষ জুত করতে পারল না। গোটা-দুই লেডিকেনি খেয়ে শেষে হাত চাটতে লাগল।

টেনিদা তবু হাঁড়িটাকে ছাড়ে না। শেষকালে মুখের ওপর তুলে চোঁ করে রসটা পর্যন্ত নিকেশ করে দিলে। তারপর নাক-টাক কুঁচকে বললে, দুৎ্তোর, গোটাকয়েক ডেয়ো পিঁপড়েও খেয়ে ফেললুম রে । জ্যান্তও ছিল দু-তিনটে ! পেটের ভেতরে গিয়ে কামড়াবে না তো ?

হাবুল বললে, কামড়াইতেও পারে ।

—কামড়াক গে, বয়ে গেল ! একবার ভীমরুল-সুদ্ধ একটা জামরুল খেয়ে ফেলেছিলুম, তা সে-ই যখন কিছু করতে পারলে না, তখন কটা পিঁপড়েতে আর কী করবে !

—ইচ্ছে করলে গোটাকয়েক বাঘ-সুদ্ধ সুন্দরবন পর্যন্ত তুমি খেয়ে ফেলতে পারো—তোমাকে ঠেকাচ্ছে কে —হাত চাটা শেষ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল ক্যাবলা ।

এর মধ্যে স্বামী ঘুটঘটানন্দের নাক সমানেই ডেকে চলছিল। যোগসিদ্ধ নাক কিনা—সে-নাকের ডাকবার কায়দাই আলাদা ! ঘর-র-ঘোঁ-ঘুরৎ !

টেনিদা বললে, যতই ঘুরুৎ-ঘুরুৎ করো না কেন—তোমার হাঁড়ি ফুড়ৎ। চালকি পেয়েছে ! কাঁধের ওপর দেড়মনি বিছানা ফেলে দেওয়া ! ঘাড়টা টনটন করছে এখনও ! প্রতিশোধ ভালোই নেওয়া হয়েছে—কী বলিস প্যালা ?

আমি বললুম, প্রতিশোধ বলে প্রতিশোধ ! একেবারে নির্মম প্রতিশোধ !

যোগসর্পের শূন্য হাঁড়িটার মুখ টেনিদা বেশ করে বাঁধল । তারপর বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ে বললে, এবার একটু ঘুমোনো যাক। পেটের জ্বলুনিটা এতক্ষণে একটু কমেছে।

আমার আর হাবুলেরও তাতে সন্দেহ ছিল না। কেবল ক্যাবলাই গজগজ করতে লাগল : তোমরাই সব

খেয়ে নিলে, আমি কিছু পেলুম না !

টেনিদা বললে, যা যা, মেলা বকিসনি। ছেলেমানুষ, বেশি খেয়ে শেষে কি অসুখে পড়বি ? নে, চুপচাপ ঘুমো—

ক্যাবলা ঘুমোলো কি না কে জানে, কিন্তু টেনিদার ঘুমোতে দু-মিনিটও লাগল না। স্বামীজীর, নাক বললে, ঘুরুৎ—টেনিদার নাক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, ফুড়ুৎ । এই উত্তর-প্রত্যুত্তর কতক্ষণ চলল জানি না—মুখের ওপর থেকে দেওয়ালি পোকা তাড়াতে আমিও ঘুমিয়ে পড়লুম।

কলার খোসা

মুরি। মুরি জংশন।

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠতেই দেখি, বাইরে আবছা সকাল। ক্যাবলা কখন উঠে বসে এক ভাঁড় চায়ে মন দিয়েছে। হাবুল সেন দুটো হাই তুলে শোয়া অবস্থাতেই স্বামী ঘুটঘুটানন্দের দিকে জুলজুল করে তাকালে । কিন্তু স্বামীজীর নাক তখন বাজছে—গোঁ-গোঁ—আর টেনিদার নাক জবাব দিচ্ছে—ভোঁ-ভোঁ—অথাৎ হাঁড়িতে আর কিছুই নেই।

হঠাৎ ক্যাবলা টেনিদার পাঁজরায় একটা খোঁচা দিলে ।

—আই—আই ! কে সুড়িসুড়ি দিচ্ছে রে ?—বলে টেনিদা উঠে বসল।

ক্যাবলা বললে, গাড়ি যে মুরিতে প্রায় দশ মিনিট থেমে আছে! স্বামীজীকে জাগাবে না ?

টেনিদা একবার হাঁড়ি, আর একবার স্বামীজীর দিকে তাকাল । তারপর বললে, গাড়িটা ছাড়তে আর কত দেরি রে ?

—এখুনি ছাড়বে মনে হচ্ছে ।

—তা ছাড়ক। গাড়ি নড়লে তারপর স্বামীজীকে নড়াব। বুঝছিস না, এখন ওঠালে হাঁড়ির অবস্থা দেখে কি আর রক্ষা রাখবে? যা ষণ্ডামার্কা চেহারা-রসগোল্লার বদলে আমাদেরই জলযোগ করে ফেলবে । তার চেয়ে—

টেনিদা আরও কী বলতে যাচ্ছিল—ঠিক সেই মুহূর্তেই বাইরে থেকে বাজখাই গলায় বিটকেল হাঁক শোনা গেল : প্রভুজী,—কোন গাড়িতে আপনি যোগনিদ্রা দিচ্ছেন দেবতা ?

সে তো হাঁক নয়—যেন মেঘনাদ । সারা ইস্টিশন কেঁপে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী ঘুটঘুটানন্দ তড়াক করে উঠে বসলেন ।

—প্রভুজী, জাগুন ! গাড়ি যে ছাড়ল—

অ্যাঁ ! এ যে আমারই শিষ্য গজেশ্বর —জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে স্বামীজী ডাকলেন : গজ—বৎস গজেশ্বর ! এই যে আমি এখানে ।

গাড়ির দরজা খটাৎ করে খুলে গেল। আর ভেতরে যে ঢুকল, তার চেহারা দেখেই আমি এক লাফে বাঙ্কে চেপে বসলুম। হাবুল আর টেনিদা সঙ্গে সঙ্গেই শুয়ে পড়ল—আর ক্যাবলা কিছু করতে পারল না—তার হাত থেকে চায়ের ভাঁড়টা টপাৎ করে পড়ে গেল মেঝেতে ।

—উহু হুঁ গেছি—পা পুড়ে গেল রে—স্বামীজী চেচিয়ে উঠলেন । উঃ—ছোঁড়াগুলো কী তাঁদোড় ? বলেছিলুম মুরিতে তুলে দিতে—তা দ্যাখো কাণ্ড ? একটু হলেই তো ক্যারেড-ওভার হয়ে যেতুম !

গজেশ্বর একবার আমাদের দিকে তাকাল—সেই চাউনিতেই রক্ত জল হয়ে গেল আমাদের। গজেশ্বরের বিরাট চেহারার কাছে অমন দশাসই স্বামীজীও যেন মূর্তিমান প্যাঁকাটি । গায়ের রঙ যেন হাঁড়ির তলার মতো কালো—হাতির মতোই প্রকাণ্ড শরীর—মাথাটা ন্যাড়া, তার ওপর হাতখানেক একটা টিকি। গজেশ্বর কুতকুতে চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে, আজকাল ছোঁড়াগুলো এমনি হয়েছে প্রভু—যেন কিষ্কিন্ধ্যা থেকে আমদানি হয়েছে সব ! প্রভু যদি অনুমতি করেন, তা হলে এদের কানগুলো একবার পেঁচিয়ে দিই !

গজেশ্বর কান প্যাঁচাতে এলে আর দেখতে হবে না—কান উপড়ে আসবে সঙ্গে সঙ্গেই ।

আমরা চারজন ভয়ে তখন পাস্তুয়া হয়ে আছি ! কিন্তু বরাত ভালো—সঙ্গে-সঙ্গে টিন-টিন করে ঘণ্টা বেজে উঠল ।

গজেশ্বর ব্যস্ত হয়ে বললে, নামুন—নামুন প্রভু ! গাড়ি যে ছাড়ল ! এদের কানের ব্যবস্থা এখন মুলতুবি রইল—সময় পেলে পরে দেখা যাবে এখন ! নামুন—আর সময় নেই—

বাক্স-বিছানা, মায় স্বামীজীকে প্রায় ঘাড়ে তুলে গজেশ্বর নেমে গেল গাড়ি থেকে । সেই সঙ্গেই বাঁশি বাজিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করে দিল ।

আমরা তখনও ভয়ে কাঠ হয়ে বসে আছি—গজেশ্বরের হাতির শুড়ের মতো প্রকাণ্ড হাতটা তখনও আমাদের চোখের সামনে ভাসছে। মস্ত ফাঁড়া কাটল একটা !

কিন্তু ট্রেন হাতকয়েক এগোতেই স্বামীজী হঠাৎ হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন : হাঁড়ি—আমার রসগোল্লার হাঁড়ি—

যোগসর্প ! এই নিন—

বলেই হাঁড়িটা ছুড়ে দিলে প্ল্যাটফর্মের ওপর ।

—আহা-আহ –করে দু-পা ছুটে এসেই স্বামীজী থমকে দাঁড়ালেন । হাঁড়ি ভেঙে চুরমার । কিন্তু আধখানা রসগোল্লাও তাতে নেই—সিকিখানা লেডিকেনি পর্যন্ত না ।

—প্রভু, আপনার যোগসর্প সব পালিয়েছেআমি চিৎকার করে বললুম। এখন আর ভয় কিসের!

কিন্তু এ কী—এ কী ! হাতির মতো পা ফেলে গজেশ্বর যে দৌড়ে আসছে । তার কুতকুতে চোখ দিয়ে যেন আগুন-বৃষ্টি হচ্ছে ! এ যেন ট্রেনের চাইতেও জোরে ছুটছে—কামরাটা প্রায় ধরে ফেললে ।

আমি আবার বাঙ্কে উঠতে যাচ্ছি—টেনিদা ছুটেছে বাথরুমের দিকে—সেই মুহূর্তে—ভগবানের দান ! একটা কলার খোসা!

হড়াৎ করে পা পিছলে সোজা প্ল্যাটফর্মে চিত হল গজেশ্বর । সে তো পড়া নয়—মহাপতন যেন ! মনখানেক খোয়া বন্দুকের গুলির মতো ছিটকে পড়ল আশেপাশে ।

—গেল—গেল—চিৎকার উঠল চারপাশে । কিন্তু গজেশ্বর কোথা ও গেল না—প্ল্যাটফর্মের ওপর সেকেণ্ড পাঁচেক পড়ে থেকেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে দাঁড়াল—

—খুব বেঁচে গেলি !—দূর থেকে গজেশ্বরের হতাশ হুঙ্কার শোনা গেল ।

গাড়ি তখন পুরো দমে ছুটতে শুরু করেছে। টেনিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, হরি হে, তুমিই সত্য ।

চা র
ঝন্টিপাহাড়ির ঝন্টুরা

পথে আর বিশেষ কিছু ঘটেনি। গজেশ্বরের সেই আছাড়-খাওয়া নিয়ে খুব হাসাহসি করলুম আমরা । অত বড় হাতির মতো লোকটা পড়ে গেল একেবারে ঘটোৎকচের মতো ! তবে আমাদের ওপর চেপে পড়লে কী যে হত, সেইটেই ভাববার কথা ।

হাউল বললে, আর একটু হইলেই প্রায় উইঠ্যা পড়ছিল গাড়িতে। মাইর্যা আমাগো ছাতু কইর্যা দিত!

টেনিদা নাক-টাক কুঁচকে হাবলাকে ভেংচে বললে, হঃ—হঃ—ছাতু কইর্যা দিত । বললেই হল আর-কি ! আমিও পটলডাঙার টেনি মুখুজ্যে—অ্যায়স্যা একখানা জুজুৎস্থ হাঁকড়ে দিতুম যে মুরি তো মুরি—বাছাধন একেবারে মুড়ি হয়ে যেত ! চ্যাপটাও হতে পারত চিড়ের মতো !

শুনে ক্যাবলা খিকখিক করে হাসল।

—অ্যাই ক্যাবলা, হাসছিস যে ? টেনিদার সিংহনাদ শোনা গেল ।

ক্যাবলা কী ঘুঘু ! সঙ্গে সঙ্গেই বললে, আমি হাসিনি তো—প্যালা হাসছে !

—প্যালা— !

বা—আমি হাসতে যাব কেন ? যোগসর্পের হাঁড়ির লেডিকেনি খেয়ে সেই তখন থেকে আমার পেট কামড়াচ্ছে। আমার পেটেও গোটাকয়েক ডেয়ো পিঁপড়ে ঢুকেছে কিনা কে জানে ! মুখ ব্যাজার করে বললাম,

আমি হাসব কেন—কী দায় পড়েছে আমার হাসতে !

টেনিদা বললে, খবরদার—মনে থাকে যেন ! খামকা যদি হাসবি তাহলে তোর ওই মূল্যের মতো দাঁতগুলো পটাপট উপড়ে দেব !—ইস-স, ব্যাটা গজেশ্বর বড় বেঁচে গেল ! একবার ট্রেনে উঠে এলেই বুঝতে পারত পটলডাঙার প্যাঁচ কাকে বলে। আবার যদি ওর সঙ্গে দেখা হয়—

কিন্তু সত্যিই যে দেখা হবে সে-কথা কে জানত! আর আমি, পটলডাঙার প্যালারাম, অন্তত সে-দেখা না হলেই খুশি হতুম।

ট্রেন একটু পরেই রামগড়ে পৌঁছল। ক্যাবলার মেসোমশাই বলে দিয়েছিলেন গোরুর গাড়ি চাপতে, কিন্তু কলকাতার ছেলে হয়ে আমরা গোরুর গাড়িতে চাপব ! ছোঃ—ছোঃ !

টেনিদা বললে, ছ-মাইল তো রাস্তা ! চল—হেঁটেই মেরে দিই—

আমি বললুম, সে তো বটেই—সে তো বটেই ! দিব্যি পাখির গান আর বনের ছায়া—

ক্যাবলা বললে, ফুলের গন্ধ আর দক্ষিণের বাতাস—

টেনিদা বললে, আর পথের ধারে পাকা পাকা আম আর কাঁঠাল ঝুলছে—

হাবুল সেন বললে, আর গাছের মালিক ঠাঙা নিয়া তাইড়া আসছে—

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, ইস, দিলে সব মাটি করে ! হচ্ছিল আম-কাঁঠালের কথা, মেজাজটা বেশ জমে এসেছিল—কোত্থেকে আবার ঠ্যাঙা-ফ্যাঙা এসে হাজির করলে ! এইজন্যেই তোদের মতো বেরসিকের সঙ্গে আসতে ইচ্ছে করে না ! নে, এখন পা চালা—

সুটকেস কাঁধে, বিছানা ঘাড়ে আমরা হাঁটতে শুরু করলুম।

কিন্তু বিকেলে গড়ের মাঠে বেড়ানো আর সুটকেস বিছানান নিযে ছ'-মাইল রাস্তা পাড়ি দেওয়া যে এক কথা নয় সেটা বুঝতে বেশি দেরি হল না । আধ মাইল হাঁটতে না-হাঁটতে আমার পালাজ্বরের পিলে—টন-টন করে উঠল ।

—টেনিদা, একটু জিরিয়ে নিলে হয় না ?

টেনিদা তৎক্ষণাৎ রাজি ।

—তা মন্দ বলিসনি। খিদেটাও বেশ চাঙা হয়ে উঠেছে। একটু জল-টল খেয়ে নিলে হয়—কী বলিস ক্যাবলা ?—বলে টেনিদা ক্যাবলার সুটকেসের দিকে তাকাল । এর আগেই দেখে নিয়েছে, ক্যাবলার সুটকেসে নতুন বিস্কুটের টিন রয়েছে একটা ।

ক্যাবলা সঙ্গে সঙ্গেই সুটকেসটাকে বগলে চেপে ধরল। —জল-টল খাবে মানে ? এক্ষুনি তো রামগড় স্টেশনে গোটা-আষ্টেক সিঙ্গাড়া খেয়ে এলে ।

—তা খেয়েছি তো কী হয়েছে –একটানে ক্যাবলার বগল থেকে সুটকেসটা কেড়ে নিয়ে টেনিদা : ওই খেয়েই ছ-মাইল রাস্তা চলবে নাকি ! আমার বাবা খিদেটা একটু বেশি—সে তোমরা যাই বলো !

বলেই ধপ করে একটা গাছতলায় বসে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই খুলে ফেলল সুটকেস । চাবি ছিল না—পত্রপাঠ বেরিয়ে এল টিনটা ।

একরাশ খাস্তা ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কুট । কী করি, আমরাও বসে পড়লুম। টেনিদা একই প্রায় সব-কটা সাবাড় করলে—আমরা ছিটে-ফোঁটার বেশি পেলুম না। শুধু ক্যাবলাই কিছু খেল না, হাঁড়ির মতো মুখ করে বসে রইল ।

ছ-মাইল রাস্তা—সোজা কথা নয়। হাবুল সেন দুখানা পাউরুটি রেখেছিল, এর পরে সেগুলোও গেল। কিন্তু টেনিদার খিদে আর মেটে না। রাস্তায় চিড়ে—মুড়ির দোকান দেখলেই বসে পড়ে আর হাঁক ছাড়ে ; দুআনা পয়সা বের কর, প্যালা—খিদেয় পেটটা ঝিম-ঝিম করছে !

মাইল-চারেক পেরুতেই পাহাড়ি পথ আরম্ভ হল। দু-ধারে শালের জঙ্গল, আর তার ভেতর দিয়ে রাঙামাটির পথ ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। খানিকটা হাঁটতেই গা ছম-ছম করতে লাগল ।

ক্যাবলা বলে বসল : টেনিদা—এ-সব জঙ্গলে বাঘ থাকে ।

টেনিদার মুখ শুকিয়ে গেল, বললে, যাঃ—যাঃ—

হাবুল বললে, শুনছি ভালুকও থাকে।

টেনিদা বললে, হুম্ !

বাঘ ভালুকের পরে আর কী আছে আমার মনে পড়ল না । আমি বললাম, বোধহয় হিপোপোটেমাসও থাকে ।

টেনিদা দাঁত খিচিয়ে উঠল : থাম থাম প্যালা, বেশি পাকামো করিসনি ! আমাকে ছাগল পেয়েছিস, না ? হিপোপোটেমাস তো জলহস্তী । জঙ্গলে থাকে কী করে ?

আমি বললুম, আচ্ছা যদি ভূত থাকে ?

টেনিদা রেগে বললে, তুই একটা গো-ভূত । ভূত এখানে কেন থাকবে শুনি ? মানুষই নেই, চাপবে কার ঘাড়ে ?

ক্যাবলা ফস করে বলে বসল ; যদি আমাদের ঘাড়েই চাপতে আসে ? আর তুমি তো আমাদের লিডার—যদি তোমার ঘাড়টাই ভূতের বেশ পছন্দ হয়ে যায় ?

টেনিদা সঙ্গে সঙ্গেই ধাঁ করে ডান হাতটা লম্বা করে বাড়িয়ে দিলে ক্যাবলার কান পাকড়ে ধরার জন্যে । তৎক্ষণাৎ পট করে সরে গেল ক্যাবলা, আর টেনিদা খানিকটা গোবরে পা দিয়ে একেবারে গজেশ্বরের মতো—

ধপাস—ধাই !

আনন্দে আমার হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ঠিক তৎক্ষণাৎ— জঙ্গলের মধ্য থেকে হঠাৎ প্রায় ছ-হাত লম্বা একটা মূর্তি বেরিয়ে এল। প্যাকাটির মতো রোগা—মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল—কটকটে কালো গায়ের রঙ । বিকট মুখে তার উৎকট হাসি। ভূতের নাম করতে করতেই জঙ্গল থেকে সোজা বেরিয়ে এসেছে।

—বাবা গো—বলে আমিই প্রথম উর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগালুম। ক্যাবলা এক লাফে পাশের একটা গাছে উঠে পড়ল, টেনিদা উঠতে গিয়ে আবার গোবরের মধ্যে আছাড় খেল, আর হাবুল সেন দু-হাতে চোখ চেপে ধরে চ্যাঁচাতে লাগল ; ভূত—ভূত—রাম—রাম—

সেই মূর্তিটা বাজখাই গলায় হা-হা করে হেসে উঠল।

—খোঁকাবাবু আপনারা মিছাই ভয় পাচ্ছেন ! হামি হচ্ছি ঝণ্টিপাহাড়ির ঝন্টুরাম—বাবুর চিঠি পেয়ে আপনাদের আগ বাড়িয়ে নিতে এলাম। ভয় পাবেন না—ভয় পাবেন না—

আমি তখন আধ মাইল রাস্তা পার হয়ে গেছি—ক্যাবলা গাছের মগডালে । হাবুল সমানে বলে চলেছে ; ভূত আমার পুত, শাকচুন্নি আমার ঝি ! টেনিদা তখনও গোবরের মধ্যেই ঠায় বসে আছে। ভিরমিই গেছে কি না কে জানে ।

মূর্তিটা আবার বললে, কুছ ডর নেই খোঁকাবাবু, কুছ ডর নেই। আমি হচ্ছি ঝণ্টিপাহাড়ির ঝন্টুরাম—আপনাদের নোকর—

চলমান জুতো

কী যে বিতিকিচ্ছিরি ঝামেলা ! ভূত নয়—তবু কেমন ভূতের ভয় ধরিয়ে দিলে হতচ্ছাড়া ঝন্টুরাম । আধ ঘণ্টা ধরে বুকের কাঁপুনি আর থামতেই চায় না। গোবর-টোবর মেখে টেনিদা উঠে দাঁড়াল । গোটাকয়েক অ্যায়সা অ্যায়সা কাঠ-পিঁপড়ের কামড় খেয়ে প্রাণপণে পা চুলকোতে চুলকোতে নামল ক্যাবলা। হাবুলের হাঁটু দুটো থেকে-থেকে ধাক্কা খেতে লাগল। আর মাইলখানেক বাঁই-বাই করে দৌড়োনোর ফলে আমার পালা-জ্বরের পিলেটা পেট ফুড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল ।

টেনিদাই সামলে নিলে সক্কলের আগে ।

—ঝন্টুরাম ? দাঁত খিচিয়ে টেনিদা বললে, তা অমন ভূতের মতো চেহারা কেন ? +

—কী করব খোঁকাবাবু, ভগবান বানিয়েছেন ।

—ভগবান বানিয়েছেন—ছোঃ !—টেনিদা ভেংচি কাটাল - ভগবানের আর খেয়েদেয়ে কাজ ছিল না ! ভগবানের হাতের কাজ এত বাজে নয়—তোকে ভূতে বানিয়েছে, বুঝলি ?

—হাঁঃ —ঝন্টুরাম আপত্তিও করলে না।

এবার ক্যাবলা এগিয়ে এল ; তা, এই ঝোপের মধ্যে ঢুকে বসেছিলি কেন ?

ঝন্টুরাম কতকগুলো এলোমেলো দাঁত বের করে বললে, কী করব দাদাবাবু—ইস্টিশনে তো যাচ্ছিলাম। তা, পথের মধ্যে ভারি নিদ এসে গেল, ভাবলম একটু ঘুমিয়ে নিই। তা ঘুমাচ্ছি তো ঘুমাচ্ছি, শেষে নাকের ভেতরে দু-তিনটে মচ্ছর (মশা) ঘুসে গেল। উঠে দেখি, আপনারা আসছেন । আমি আপনাদের কাছে এলম তো আপনারা ডর খেয়ে অ্যায়সা কারবার করলেন--

বলেই খ্যাঁক-খ্যাঁক খিকখিক করে লোকটা ভুতুড়ে হাসি হাসতে আরম্ভ করে দিলে ।

ক্যাবলা বললে, খুব হয়েছে, আর হাসতে হবে না । দাঁত তো নয়—যেন মুলোর দোকান খুলে বসেছে মুখের ভেতর । চল—চল এখন শিগগির, পথ দেখিয়ে নিয়ে চল ঝণ্টিপাহাড়িতে—

সত্যি, চমৎকার জায়গা এই ঝণ্টিপাহাড়ি ।

নামটা যতই বিচ্ছিরি হোক—এখানে পা দিলেই গা যেন জুড়িয়ে যায়। তিনদিকে পাহাড়ের গায়ে শাল-পলাশের বন—পলাশ ফুল ফুটে তাতে যেন লাল আগুন জ্বলছে। নানারকমের পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে—কত যে রঙের বাহার তাদের গায়ে । সামনে একটা ঝিল—তার নীল জল টলমল করছে দুটো-চারটে কলমি-লতা কাঁপছে, তার ওপর আবার থেকে-থেকে কেউটে সাপের ফণার মতো গলা-তোলা পানকৌড়ি টপটপ করে ডুব দিচ্ছে তার ভেতরে।

ঝিলের কাছেই একটা টিলার ওপর তিনদিকে বনের মাঝখানে মেসোমশায়ের বাংলো । লাল ইটের গাঁথুনি—সবুজ দরজা জানালা—লাল টালির চাল । হঠাৎ মনে হয় এখানেও যেন একরাশ পলাশ ফুল জড়ো হয়ে রয়েছে আর দুটো-চারটে সবুজ পাতা উকি দিচ্ছে তাদের ভেতরে ।

এমন সুন্দর জায়গা—এমন মিষ্টি হাওয়া—এমন ছবির মতো বাড়ি—এখানে ভূতের ভয় ! রাম রাম ! হতেই পারে না !

বাংলোর ঘরগুলোও চমৎকার সাজানো । টেবিল, চেয়ার, ডেক-চেয়ার, আয়না, আলনা—কত কী ? খাটো মোটা জাজিম। আমরা পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই ঝন্টুরাম দুখানা ঘরের চারখানা খাটে চমৎকার করে বিছানা পেতে দিলে । বাংলোর বারান্দায় বেতের চেয়ারে আমরা আরাম করে বসলুম। ঝন্টুরাম ডিমের ওমলেট আর চা এনে দিলে। তারপর জানতে চাইল : খোকাবাবুরা কী খাবেন দুপুরে ? মাছ, না মুরগি ?

—মুরগি—মুরগি !—আমরা কোরাসে চিৎকার করে উঠলুম।

টেনিদা একবার উস্ করে জিভের জল টানল : আর হ্যাঁ—চটপট পাকিয়ে ফেলো—বুঝলে ? এখন বেলা বারোটা বাজে—পেটে ৰৰক্ষা খাই-খাই করছেন। আর বেশি দেরি হলে চেয়ার-টেবিলই খেতে আরম্ভ করব বলে দিচ্ছি !

—হঃ, তুমি তা পারবা । হাবুল সেন ঠুকে দিলে ।

—কী—কী বললি হাবুল ?

—না না—আমি কিছু কই নাই।

—হাবুল সামলে দিলে, কইতেছিলাম ঝন্টু খুব তাড়াতাড়ি রাঁধতে পারবে ।

ঝন্টুরাম চলে গেল।

টেনিদা বললে, চেহারাটা যাচ্ছেতাই হলে কী হয়—ঝন্টুরাম লোকটা খুব ভালো—না রে ?

আমি বললাম, হ্যাঁ, যত্ন-আত্তি আছে। রোজ যদি মুরগি-টুরগি খাওয়ায়—সাতদিনে আমরা লাল হয়ে উঠব ।

টেনিদা চোখ পাকিয়ে বললে, আর লাল হয়ে কাজ নেই তোর পালা-জ্বরে ভুগিস, বাসক পাতার রস দিয়ে কবরেজি বড়ি খাস, তোর এ-সব বেশি সইবে না। কাল থেকে তোর জন্যে কাঁচকলা আর গাঁদালের ঝোল বরাদ্দ করে দেব। বিদেশে-বিভুঁয়ে এসে যদি পটাৎ করে পটল তুলিস, তাহলে সে ম্যাও সামলাবে কে—শুনি ?

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, আচ্ছা আচ্ছা, সেজন্যে তোমায় ভাবতে হবে না । গাঁদালের ঝোল খেতে বয়ে গেছে আমার ! মরি তো মুরগি খেয়েই মরব !

—আর পরজন্মে মুরগি হয়ে জন্মাবি। ডাকবি, কঁর—কঁর—কোঁকোর—কোঁ— ইস্টুপিড ক্যাবলাটা বদ রসিকতা করলে। আমি বেদম চটে বসে বসে নাক চুলকোতে লাগলাম।

খেতে খেতে দুটো বাজল । আহা, ঝন্টুর রান্না তো নয়—যেন অমৃত । পেটে পড়তে পড়তেই যেন ঘুম জড়িয়ে এল চোখে । রাত্রে ট্রেনের ধকলও লেগেছিল কম নয়—নরম বিছানায় এসে গা ঢালতেই আমাদের মাঝ-রাত্তির ।

বিকেলের চা নিয়ে এসে ঝন্টুরাম যখন আমাদের ডেকে তুলল, পাহাড়ের ওপারে তখন সূর্য ডুবে গেছে। শাল-পলাশের বন কালো হয়ে এসেছে, শিসের মতো রঙ ধরেছে ঝিলের জলে । দুপুরবেলা চারিদিকের যে মন-মাতানো রূপ চোখ ভুলিয়েছিল, এখন তা কেমন থমথমে হয়ে উঠেছে। ঝাঁ-ঝাঁ করে ঝিঁঝির ডাক উঠেছে ঝোপঝাড় আর বাংলোর পেছনের বন থেকে ।

প্ল্যান ছিল ঝিলের ধারে বিকেলে মন খুলে বেড়ানো যাবে, কিন্তু এখন যেন কেমন ছম-ছম করে উঠল শরীর। মনে পড়ে গেল, কলকাতার পথে পথে—বাড়িতে বাড়িতে এখন ঝলমলে আলো জ্বলে উঠেছে, ভিড় জমেছে সিনেমার সামনে। আর এখানে জমেছে কালো রাত—ক্রমাগত বেড়ে চলেছে ঝিঁঝির চিৎকার, একটা চাপা আতঙ্কের মতো কী যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে আশেপাশে ।

বারান্দায় বসে আমরা গল্প করার চেষ্টা করতে লাগলুম—কিন্তু ঠিক জমতে চাইল না । ঝন্টুরাম একটা লণ্ঠন জ্বেলে দিয়ে গেল সামনে, তাইতে চারিদিকের অন্ধকারটা কালো মনে হতে লাগল ।

শেষ পর্যন্ত টেনিদা বললে, আয়, আমরা গান গাই ।

ক্যাবলা বললে, সেটা মন্দ নয় । এসো—কোরাস ধরি। —বলেই চিৎকার করে আরম্ভ করলে--

আমরা ঘুচাব মা তোর কলিমা,
মানুষ আমরা নহি তো মেষ—

আর বলতে হল না। সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তিনজনে গলা জুড়ে দিলুম। সে কী গান !

আমাদের চারজনের গলাই সমান চাঁছাছোলা—টেনিদার তো কথাই নেই। একবার টেনিদা নাকি অ্যায়সা কীর্তন ধরেছিল যে তার প্রথম কলি শুনেই চাটুজ্যেদের পোষা কোকিলটা হার্টফেল করে । আমরা এমনই গান আরম্ভ করে দিলুম যে ঝন্টুরাম পর্যন্ত ভ্যাবাচাকা খেয়ে ছুটে এল ।

আমরা সবাই বোধ হয় একটা কথাই ভাবছিলুম। ঝন্টিপাহাড়ের বাংলোতে যদি ভূত থাকে, তবুও এ-গান তাকে বেশিক্ষণ সইতে হবে না—আপনি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাবে এখান থেকে ।

কিন্তু সেই রাত্রে—

আমি আর ক্যাবলা এক ঘরে শুয়েছি—পাশের ঘরে হাবুল সেন আর টেনিদা। একটা লন্ঠন আমাদের ঘরে মিটিমিটি করছে ঘরের চেয়ার টেবিল আয়নাগুলো কেমন অদ্ভূত মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন । ভয়টা আমার বুকের ভেতরে চেপে বসল। অনেকক্ষণ বিছানায় আমি এপাশ-ওপাশ করতে লাগলুম—কান পেতে শুনলুম, টেনিদার নাকে—সা রে গা মা-র সাতটা স্বর বাজছে । কাচের জানালা দিয়ে দেখলুম বাইরে কালো পাহাড়ের মাথায় একরাশ জ্বলজ্বলে তারা । তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে গেছি।

হঠাৎ খুট—খুট—খটাৎ—খটাৎ—

চমকে জেগে উঠলাম। কে যেন হাঁটছে।

কোথায় ?

এই ঘরের মধ্যেই । যেন পায়ে বুট পরে কে চলে বেড়াচ্ছে ঘরের ভেতর। হাত বাড়িয়ে লন্ঠনটা বাড়িয়ে দিলুম। না—ঘরে তো কিছু নেই। তবু সেই জুতোর আওয়াজ । কেউ হাঁটছে—নির্ঘাত হাঁটছে। খুট-খুট—খটাত-খটাত—

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম : ক্যাবলা !

ক্যাবলা লাফিয়ে উঠল : কী-কী হয়েছে ?

—কে যেন হাঁটছে ঘরের ভেতর ?

কী গোঁয়ার-গোবিন্দ এই পুঁচকে ক্যাবলা ! তক্ষুনি তড়াক করে নেমে পড়ল মেঝেতে । আর সঙ্গে সঙ্গেই একটু ইঁদুর দুড়দুড় করে দরজার চৌকাটের গর্ত দিয়ে বাইরে দৌড়ে পালাল ।

ক্যাবলা হেসে উঠল ।

—তুই কী ভিতু রে প্যালা ! একটা পুরোনো ছেঁড়া জুতোর মধ্যে ঢুকে ইঁদুরটা নড়ছিল—তাই এই আওয়াজ । এতেই এত ভয় পেলি !

শুনেই আমি বীরদর্পে বললুম—যাঃ—যাঃ—আমি সত্যিই ভয় পেয়েছি নাকি –বেশ ডাঁটের মাথায় বললুম, ইঁদুর তো ছার—সাক্ষাৎ ব্রহ্মদত্যি যদি আসে–

কিন্তু মুখের কথা মুখেই থেকে গেল আমার । সেই মুহূর্তেই কোথা থেকে জেগে উঠল এক প্রচণ্ড অমানুষিক আর্তনাদ । সে-গলা মানুষের নয়। তারপরেই আর-একটা বিকট অট্টহাসি । সে-হাসির কোনও তুলনা হয় না । মনে হল, পাতালের অন্ধকার থেকে তা উঠে আসছে, আর তার শব্দে ঝণ্টিপাহাড়ির বাংলোটা থর-থর করে কেঁপে উঠছে !

ছয়

রোমাঞ্চকর রাত

সে-ভয়ঙ্কর হাসির শব্দটা যখন থামল, তখনও মনে হতে লাগল ঝন্টিপাহাড়ির ডাকবাংলোটা ভয়ে একটানা কেঁপে চলেছে। আমি বিদ্যুৎবেগে আবার চাদরের তলায় ঢুকে পড়েছি, সাহসী ক্যাবলাও এক লাফে

উঠে গেছে তার বিছানায় । আমার হাত-পা হিম হয়ে এসেছে—দাঁতে-দাঁতে ঠকঠকানি শুরু হয়েছে। যতদূর বুঝতে পারছি, ক্যাবলার অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয়।

প্রায় দশ মিনিট ।

তারপর ক্যাবলাই সাহস ফিরে পেল । শুকনো গলায় বললে, ব্যাপার কী রে প্যালা ?

চাদরের তলা থেকেই আমি বললাম, ভূ—ভূ—ভূত ।

ক্যাবলা উঠে বসেছে । আমি চাদরের তলা থেকে মিটমিট করে ওকে দেখতে লাগলাম ।

ক্যাবলা বললে, কিন্তু কথা হল, ভূত এখানে খামকা হাসতে যাবে কেন ?

ভুতুড়ে বাড়িতে ভূত হাসবে না তো হাসবে কোথায় ? তারও তো হাসবার একটা জায়গা চাই। —আমি বলতে চেষ্টা করলুম।

ক্যাবলা মাথা চুলকে বললে, তাই বলে মাঝরাতে অমন করে হাসতে যাবে কেন ? লোকের ঘুম নষ্ট করে অমন বিটকেল আওয়াজ ঝাড়বার মানে কী ?

আমি বললুম, ভূত তো মাঝরাতেই হাসে। নইলে কি দুপুরবেলা কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে বসে হাসবে নাকি ?

ক্যাবলা বললে, তাই তো উচিত ! তাহলে অন্তত ভূতের সঙ্গে একটা মোকাবিলা হয়ে যায়। তা নয়, সময় নেই অসময় নেই, যেন হাহা শব্দরূপ আউড়ে গেল—হাহা-হাহৌ-হাহাঃ ! আচ্ছা প্যালা, ভূতদের যখন-তখন এ-রকম যাচ্ছেতাই হাসি পায় কেন বল দিকি ?

আমি চটে গিয়ে বললুম, তার আমি কী জানি ! তোর ইচ্ছে হয় ভূতের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয় না ।

ক্যাবলা আবার চুপ করে নেমে পড়ল খাট থেকে । বললে, তাই চল না প্যালা—ভূতের চেহারাটা একবার দেখেই আসিগে ! সেইসঙ্গে এ-কথাও বলে আসি যে আপাতত এ-বাড়িতে চারটি ভদ্রলোকের ছেলে এসে আস্তানা নিয়েছে। এখন রাত দুপুরে ও-রকম বিটকেল হাসি হেসে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত করা নিতান্ত অন্যায়।

বলে কী ক্যাবলা ! আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল।

—খেপেছিস নাকি তুই ?

—খেপব কেন ? বুকের পাটা আছে বটে ক্যাবলার । একটুখানি হেসে বললে, আমার কী মনে হয় জানিস ? ভূতও মানুষকে ভয় পায় ।

—কী বকছিস যা-তা ?

—ভয় পায় না তো কী ! নইলে কলকাতায় ভূত আসে না কেন ? দিনের বেলায় তাদের ভুতুড়ে টিকির একটা চুলও দেখা যায় না কেন ? বাইরে বসে বসে হাসে কেন ? ঘরে ঢুকতে ভূতের সাহস নেই কেন ?

আমি আঁতকে উঠে বললুম, রাম—রাম । ও-সব কথা মুখেও আনিসনি ক্যাবলা ! হাসির নমুনাটা একবার শুনলি তো ? এখুনি হয়তো দুটো কাটা মুণ্ডু ঘরে ঢুকে নাচতে শুরু করে দেবে।

ক্যাবলাটা কী ডেঞ্জারাস ছেলে । পটাং করে বলে ফেলল—তা নচুক না। কাটা মুণ্ডুর নাচ আমি কখনও দেখিনি, বেশ মজা লাগবে । আচ্ছা—আমি ওয়ান-টু-থ্রি বলছি। ভূতের যদি সাহস থাকে, তাহলে থ্রি বলবার মধ্যেই এই ঘরে ঢুকে নাচতে আরম্ভ করবে। আই চ্যালেঞ্জ ভূত । ওয়ান—টু—

কী সর্বনাশ ? করছে কী ক্যাবলা ! ভূতের সঙ্গে চালাকি। ওরা যে পেটের কথা শুনতে পায় । ভয়ে সিটিয়ে গিয়ে আমি চাদরের তলায় মুখ লুকোলুম। এবার এল—নির্ঘাত—এল—

ক্যাবলা বললে, থ্রি !

চাদরের তলায় আমি পাথর হয়ে পড়ে আছি । একেবারে নট-নড়ন-চড়ন ঠকাস মার্বেল । এক্ষুনি একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে যাবে ! এল—এল—ওই এসে পড়ল—

কিন্তু কিছুই হল না। ভূতেরা ক্যাবলার মতো নাবালককে গ্রাহাই করল না বোধহয় ।

ক্যাবলা বললে, দেখলি তো ! চ্যালেঞ্জ করলুম—তবু আসতে সাহস পেল না । চল—এক কাজ করি । টেনিদা আর হাবুল সেনও নিশ্চয়ই জেগেছে এতক্ষণে । আমরা চারজনে মিলে ভূতেদের সঙ্গে দেখা করে আসি ।

ভয়ে আমার দম আটকে গেল ।

—ক্যাবলা, তুই নির্ঘাত মারা যাবি !

ক্যাবলা কর্ণপাত করল না। সোজা এসে আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারলে ।

— ওঠ —

আমি প্রাণপণে চাদর টেনে বিছানা আঁকড়ে রইলুম !

—কী পাগলামি হচ্ছে ক্যাবলা ! যা, শুয়ে পড়—

ক্যাবলা নাছোড়বান্দা। ওর ঘাড়ে ভূতই চেপে বসেছে না কি কে জানে । আমাকে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে বললে, ওঠ বলছি । ভূতে মাঝরাতে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেবে আর আমরা চুপটি করে সয়ে যাব । সে হতেই পারে না। ওঠ—ওঠ—শিগগির—

এমন করে টানতে লাগল যে চাদর-বিছানাসুদ্ধ আমাকে ধপাস করে মেঝেতে ফেলে দিলে ।

—এই ক্যাবলা, কী হচ্ছে ?

ক্যাবলা কোনও কথা শোনবার পাত্রই নয় । টেনে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলে । বললে, চল দেখি, পাশের ঘরে টেনিদা আর হাবুল কী করছে।

বলে লণ্ঠনটা তুলে নিলে ।

অগত্য রাম-রাম দুর্গা-দুর্গা বলে আমি ক্যাবলার সঙ্গেই চললুম। ও যদি লণ্ঠন নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়—তাহলে এক সেকেন্ডও আর আমি ঘরে থাকতে পারব না ! দাঁতে দাঁতে লেগে যাবে, অজ্ঞান হয়ে যাব—হয়তো মরেও যেতে পারি। এমনিতেও তো আমার পালাজ্বরের পিলেটা থেকে-থেকে কেমন গুরগুরিয়ে উঠছে ।

পাশের দরজাটা খোলাই ছিল । ওদের ঘরে ঢুকেই ক্যাবলা চেঁচিয়ে উঠল ; এ কী, ওরা গেল কোথায়?

তাই তো—কেউ নেই! দুটো বিছানাই খালি ! না টেনিদা—না হাবুল । অথচ দুটো ঘরের মাঝের দরজা ছাড়া আর সমস্ত জানালা-দরজাই বন্ধ। আমাদের ঘরের ভেতর দিয়ে ছাড়া ওদের তো আর বেরুবার পথ নেই।

ক্যাবলা বললে, গেল কোথায় বল দিকি !

আমি কাঁপতে কাঁপতে বললুম, নির্ঘাত ভূতে ভ্যানিশ করে দিয়েছে। এতক্ষণে ঘাড় মটকে রক্ত খেয়ে ফেলেছে ওদের !

এতক্ষণে বোধহয় ক্যাবলার খটকা লেগে গিয়েছিল । এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, তাই তো রে, কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব ! দু-দুটো জলজ্যান্ত মানুষ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নাকি !

আর ঠিক তক্ষুনি—

ক্যাঁক-ক্যাঁক করে একটা অদ্ভুত আওয়াজ। যেন ঘরের মধ্যে সাপে ব্যাঙ ধরেছে কোথাও । ক্যাবলা চমকে একটা লাফ মারল, একটুর জন্যে পড়তে-পড়তে বেঁচে গেল হাতের লণ্ঠনটা । আর আমিও তিড়িং করে একেবারে টেনিদার বিছানায় চড়ে বসলুম।

আবার সেই ক্যাঁক-ক্যাঁক-কোঁক !

নির্ঘাত ভূতের আওয়াজ ! আমার পালাজ্বরের পিলেতে প্রায় ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। চোখ বুজে ভাবছি এবার একটা যাচ্ছেতাই ভুতুড়ে কাণ্ড হয়ে যাবে, ঠিক সেই সময় হঠাৎ বেখাপ্পাভাবে ক্যাবলা হা-হা করে হেসে উঠল ।

চমকে তাকিয়ে দেখি, লণ্ঠনটা নিয়ে হাবুলের খাটের তলায় ঝুঁকে রয়েছে ক্যাবলা । তেমনি বেয়াড়াভাবে হাসতে হাসতে বললে, দ্যাখ প্যালা আমাদের লিডার টেনিদা আর হাবুলের কাণ্ড ! ভূতের ভয়ে এ-ওকে জাপটে ধরে খাটের তলায় বসে আছে! :

বলেই ক্যাবলা দস্তুরমতো অট্টহাসি করতে শুরু করলে ।

খাটের তলা থেকে টেনিদা আর হাবুল গুড়ি মেরে বেরিয়ে এল। দুজনেরই নাকে-মুখে ধুলো আর মাকড়সার ঝুল। টেনিদার খাঁড়ার মতো নাকটা সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে, আর হাবুল সেনের চোখ দুটো ছানাবড়ার মতো গোল গোল হয়ে প্রায় আকাশে চড়ে বসে আছে।

ক্যাবলা বললে, টেনিদা, এই বীরত্ব তোমার ! তুমি আমাদের দলপতি—আমাদের পটলডাঙার হিরো—গড়ের মাঠে গোরা পিটিয়ে চ্যাম্পিয়ন—

টেনিদা তখন সামলে নিয়েছে। নাক থেকে ঝুল ঝাড়তে-ঝাড়তে বললে, থাম থাম, মেলা ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করিসনি । আমরা খাটের তলায় ঢুকেছিলুম একটা মতলব নিয়ে ।

হাবুলের কাঁধের ওপর একটা আরশোলা হাঁটছিল । হাবুল টোকা মেরে সেটাকে দূরে ছিটকে দিয়ে বলল, হ—হ, আমাগো একটা মতলব আছিল !

ক্যাবলা বললে, শুনি না—কেয়া মতলব সেটা । বাতলাও । —ক্যাবলা অনেকদিন পশ্চিমে ছিল, কথায় কথায় ওর রাষ্ট্রভাষা বেরিয়ে পড়ে দুএকটা ।

টেনিদা তখন সাহস পেয়ে জুত করে বিছানার ওপর উঠে বসেছে। বেশ ডাটের মাথায় বললে, বুঝলি না ? আমরা খাটের তলায় বসে ওয়াচ করছিলুম। যদি একটা ভূত-টুত ঘরের মধ্যে ঢোকে—

হাবুল টেনিদার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, তখন দুইজনে মিল্যা ভূতের পা ধইরা একটা হ্যাঁচকা টান মারুম—আর ভূতে—

টেনিদা বললে, একদম ফ্ল্যাট !

ক্যাবলা খিক-খিক করে হাসতে লাগল।

টেনিদা চটে গিয়ে বললে, অমন করে হাসছিস যে ক্যাবলা ? জানিস ওতে আমার ইনসাল্ট হচ্ছে ? টেক কেয়ার! গুরুজনকে যদি অমন করে তুরুশ্চু করবি, তা হলে চটে গিয়ে এমন একখানা মুগ্ধবোধ বসিয়ে দেব—

টেনিদা বোধহয় ক্যাবলার নাকে একটা মুগ্ধবোধ বসাবার কথাই ভাবছিল, সেই সময় আবার একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটল ।

পাশের জানালাটার কাচে ঝনঝন করে শব্দ হল একটা । কতকগুলো ভাঙা কাচ ছিটকে পড়ল চারিদিকে আর সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে শাদা বলের মতো কী একটা ঠিকরে পড়ল এসে–একেবারে ক্যাবলার পায়ের কাছে গড়িয়ে এল ।

আর লণ্ঠনের আলোয় স্পষ্ট দেখলুম—ওটা আর কিছু নয়, স্রেফ মড়ার মাথার খুলি ।

-ওরে দাদা !

আমি মেঝেতে ফ্ল্যাট হলুম সঙ্গে সঙ্গেই। হাবুল আর টেনিদা বিদ্যুৎবেগে আবার খাটের তলায় অদৃশ্য হল । শুধু লণ্ঠন হাতে করে ক্যাবলা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল—শুয়ে পড়ল না, বসেও পড়ল না ।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই পৈশাচিক অট্টহাসি উঠল । সেই হাসির সঙ্গে থরথর করে কাঁপতে লাগল

ঝন্টিপাহাড়ির ডাক-বাংলো ।

সাত

কে তুমি হাস্যময়?

বাকি রাতটা যে আমাদের কী ভাবে কাটল, সে আর খুলে না বললেও চলে। টেনিদা আর হাবুল সেনের কী হল জানি না—আমি তো প্রায় অজ্ঞান । তার মধ্যেই মনে হচ্ছিল, দুটো তালগাছের মতো পেল্লায় ভূত আমাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছে। একজন যেন বলছে : এটাকে কালিয়া রান্না করে খাব, আর-একজন বলছে ; দূর—দুর । এটা একেবারে শুটকো চামচিকের মতো—গায়ে একরত্তি মাংস নেই ! বরং এটাকে তেজপাতার মতো ডাল সম্বরা দেওয়া যেতে পারে ।

আমি বোধহয় ভেউ-ভেউ করে কাঁদছিলুম, হঠাৎ তিড়িক করে লাফিয়ে উঠতে হল । মুখের ওপর কে যেন আঁজলা-আঁজলা করে জল দিচ্ছে। আর, কী ঠাণ্ডা সে জল ! বাঘের নাকে সে জল ছিটিয়ে দিলে বাঘ-সুদ্ধ অজ্ঞান হয়ে পড়বে।

বাঘ অজ্ঞান হোক—কিন্তু আমার জ্ঞান ফিরে এল, মানে, আসতেই হল তাকে।

আর কে ? ক্যাবলা । করেছে কী—বাগানে জল দেবার একটা ঝাঁঝরি নিয়ে এসেছে, তাই দিয়ে আমাকে স্রেফ চান করিয়ে দিচ্ছে ।

—ওরে থাম থাম—-

ক্যাবলা কি থামে ! আমার মুখের ওপর আবার একরাশ জল ছিটিয়ে দিয়ে বললে, কী রে, মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে তো ? -

—ঠাণ্ডা মানে ? সারা গা ঠাণ্ডা হবার জো হল—আমি তড়াক করে ঝাঁঝরির আক্রমণ থেকে পাশ কাটালুম।

কাচের জানালা দিয়ে বাইরের ভোরের আলো দেখা যাচ্ছে । ঝন্টিপাহাড়ির ডাক-বাংলোয় একটা দুঃস্বপ্নের রাত শেষ হয়ে গেছে। সামনে লেকের নীল জলটার ওপর ভোরের লালচে রং । পাখির মিষ্টি ডাক শুরু হয়েছে চারদিকে—শিশিরে ভেজা শাল-পলাশের বন যেন ছবির মতো দেখাচ্ছে ।

কোঁচার খুঁটে মুখটা মুছতে মুছতে আমার মনে হল, এমন সুন্দর জায়গায় এমন বিচ্ছিরি ভূতের ব্যাপার না থাকলে দুনিয়ায় কার কী ক্ষতি হত !

আমি তো এ-সব ভাবছি, ওদিকে ক্যাবলার ঝাঁঝরি সমানে কাজ করে চলেছে । খানিক পরে হাই-মই কাই-কাঁই আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি, ঝাঁঝরির আক্রমণে জর্জরিত হয়ে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে আসছে টেনিদা আর হাবুল ।

ক্যাবলা হেসে বললে, তোমাদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্যে কেমন দাওয়াইটি বের করেছি ! দেখলে তো !

টেনিদা গাঁক-গাঁক করে বললে, থাক, বকিসনি । আমরা অজ্ঞান হয়েছিলাম কে বললে তোকে ? দুজনে চুপি চুপি প্ল্যান আটছিলুম, আর তুই রাস্কেল ঠাণ্ডা জল দিয়ে—

বলেই টেনিদা ফ্যাঁচ করে হেঁচে ফেললে । বললে, ইঃ গেছি—গেছি ! এই শীতের সকালে যেভাবে নাইয়ে দিয়েছিস, তাতে এখন ডবল-নিউমোনিয়া না হলে বাঁচি !

ঝন্টুরামকে জিজ্ঞেস করে কোনও হদিশ পাওয়া গেল না । সে ডাক-বাংলোয় থাকে না। এখান থেকে মাইলখানেক দূরে তার বাড়ি। আমাদের খাইয়ে-দাইয়ে নিজের বাড়িতে চলে গিয়েছিল । সকালবেলায়

এসেছে।

টেনিদা বললে, ওটা কোনও কম্মের নয়—একেবারে গাঁড়ল ।

হাবুল সেন মাথা চুলকে বললে, ও নিজেই ভূত কি না সেই কথাটাই বা কেডা কইব ? চেহারাখানা দেখতে আছ না ? যান তালগাছের থন নাইম্যা আসছে ।

আমি আঁতকে উঠলাম ; সত্যিই কি ভূত নাকি ?

টেনিদা বললে, তোরা দুটোই হচ্ছিস্ গোভূত । জানিসনে, ভূত আগুন দেখলেই পালায় ? ও ব্যাটা নিজে উনুন ধরিয়ে চা করে দিলে, রাত্তিরে ওর রান্না মুরগির ঝোল আর ভাত দু-হাতে সাঁটলি, সে-কথা মনে নেই বুঝি ?

আমরা আর সাঁটতে পেরেছি কই—মুরগির দু-এক টুকরো হাড় কেবল চুষতে পেরেছি, বাকি সবটাই টেনিদার পেটে গেছে। কিন্তু এখন আর সে-কথা বলে কী হবে ।

আমি বললুম, ঝন্টুরাম ভূত হোক আর না-ই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। সোজা কথা হচ্ছে, পটল যদি তুলতেই হয়, তাহলে পটলডাঙাতে গিয়েই তুলব। এখানে ভূতের হাতে মরতে আমি রাজি নই। আমি আজকেই কলকাতায় ফিরে যাব।

হাবুল উৎসাহিত হয়ে বললে, হ—হ, আমিও সেই কথাই কইতে আছিলাম ।

টেনিদা খাঁড়ার মতো নাকটা চুলকোতে লাগল।

আমি বললুম, তোমাদের ইচ্ছে হয় থাক। ভূতেরা ধরে ধরে তোমাদের হাঁড়ি-কাবাব করে খাক—কাটলেট বানাক, রোস্ট করে ফেলুক—আমার কিছুই আপত্তি নেই।

আজই আমি পালাব ।

টেনিদা বললে, তাই তো ! কিন্তু জায়গাটা খাসা—বেশ প্রেমসে খাওয়া-দাওয়াও করা যাচ্ছিল, কিন্তু ভূতগুলোই সব মাটি করে দিলে !

হাবুল মাথা নেড়ে বললে, হ, সইত্য কথা। এখানে জঙ্গলের মধ্যে থাইকা ভূতগুলানে কী যে সুখ হয়—তাও তো বুঝি না। আমাগো কইলকাতায় গিয়া বাসা করত, থাকতও ভালো, আমরাও ছুটি পাইতাম । আর যদি বাইছা বাইছা হেড পণ্ডিতের ঘাড়ে উইঠা বসত, তাহলে আমাগো আর শব্দরূপ মুখস্থ করতে হইত না !

—সে তো বেশ ভালো কথা, কিন্তু ভূতগুলোকে সে-কথা বোঝায় কে!

টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : যেতে চাস তো চল । কিন্তু সত্যি, ভারি মায়া লাগছে রে । এমন আরাম, এমন খাওয়া-দাওয়া, ঝণ্টেটা আবার রুটির সঙ্গে কতটা করে মাখন দিয়েছিল—দেখেছিস তো ? এখানে দিনকয়েক থাকলে আমরা লাল হয়ে যেতুম ।

আমি বললাম, তার আগে ভূতেরাই লাল হয়ে যাবে। টেনিদা সামনে থেকে একটা প্লেট তুলে নিয়ে তার তলায় লেগে-থাকা একটুখানি মাখন চট করে চেটে নিলে । তারপরের আর একটা বুক-ভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

—তা হলে আজই ?

আমি আর হাবুল সমস্বরে বললাম, হ্যাঁ—হ্যাঁ, আজই।

ক্যাবলার কথা এতক্ষণ আমাদের মনেই ছিল না । সেই যে ভোরবেলা ঝাঁঝরি-দাওয়াই দিয়ে আমাদের জ্ঞান ফিরিয়েছে, তারপর আর তার পাত্তা নেই । কোথায় গেল ক্যাবলা ?

আমি বললাম, ক্যাবলা গেল কোথায় ?

টেনিদা চমকে বললে, তাই তো ! সকাল থেকে তো ক্যাবলাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না !

হাবুল সেন জানতে চাইল ; ভূতের সঙ্গে মস্করা করতে আছিল, ভূতে তারে লইয়া যায় নাই তো ?

টেনিদা মুখ-টুক কুঁচকে বললে, বয়ে গেছে ভূতের । ওটা যা অখাদ্য—ওকে ভূতেও হজম করতে পারবে না । কিন্তু গেল কোথায় ? আমাদের ফেলেই চম্পট দিলে না তো ?

ঠিক এই সময় হঠাৎ বাজখাঁই গলায় গান উঠল :

ছপ্পর পর কৌয়া নাচে, নাচে বগুলা—
আরে রামা হো—হে রামা—

গানটা এমন বেখাপ্পা যে আমি চেয়ারসুদ্ধ উলটে পড়তে পড়তে সামলে গেলুম। এ আবার কী রে বাবা! দিন-দুপুরে এসে হানা দিলে নাকি। কিন্তু ভূতে রাম নাম করতে যাবে কোন দুঃখে ?

ভূত নয়—ক্যাবলা । কোত্থেকে একগাল হাসি নিয়ে বারান্দায় উঠে পড়ল ।

—গিয়েছিলি কোথায় ? অমন ষাঁড়ের মতো চেচাচ্ছিসই বা কেন ?—টেনিদা জানতে চাইলে ।

—বলছি—ক্যাবলা করুণ চোখে সামনের পেয়ালা-পরিচগুলোর দিকে তাকাল : এর মধ্যেই ব্রেকফাস্ট শেষ ? আমার জন্যেই কিছু নেই বুঝি ?

—সে আমরা জানিনে, ঝন্টুরাম বলতে পারে --টেনিদা বললে, ব্রেকফাস্ট পরে করবি, কোথায় গিয়েছিলি তাই বল ।

ক্যাবলা মিটমিট করে হেসে বলল, ভূতের খোঁজে গিয়েছিলুম। ভূত পাওয়া গেল না—পাওয়া গেল একঠোঙা চীনেবাদাম ।

—চীনেবাদাম ।

ক্যাবলা বললে, তাতে অর্ধেক খোসা, অর্ধেক বাদাম । মানে অর্ধেকটা খাওয়ার পরে আর সময় পায়নি।

—কে সময় পায়নি ? —আমি বেকুবের মতো জিজ্ঞস করলুম।

—জানালার ও ধারে ঝোপের ভেতরে বসে যারা মড়ার মাথা ছুড়েছিল, তারাই। যদি ভূতও হয়—তাহলে কিন্তু বেশ মডার্ন ভূত, টেনিদা ! মানে—বাদাম খায়, মুড়ি খায়, তেলেভাজাও খায়। তেলেভাজার শালপাতা আর মুড়িও পাওয়া গেল কিনা !

টেনিদা বললে, তার মানে— ক্যাবলা বললে, তার মানে হল, এ সব কোনও বদমাস আদমি কা কারসাজি ! তারাই রাত্তিরে অমনি করে যাচ্ছেতাই রকম হেসেছে, ঘরের ভেতরে মড়ার মাথা ফেলেছে—অথাৎ আমাদের তাড়ানোর মতলব । তুমি পটলডাঙার টেনিদা—গড়ের মাঠে গোরা পিটিয়ে চ্যাম্পিয়ন—তুমি এ-সব বদমায়েসদের ভয়ে পালাবে এখান থেকে !

—ঠিক জানিস ? ভূত নয় ?

—ঠিক জানি । —ক্যাবলা বললে, ভূতে তেলেভাজা আর চীনেবাদাম খায়, এ-কথা কে কবে শুনেছে? তার ওপর তারা বিড়িও খেয়েছে। দু-চারটে পোড়া বিড়ির টুকরোও ছিল ।

—তা হলে বদমাস লোক –পটলডাঙার টেনিদা হঠাৎ বুক ঠুকে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল ; মানুষ যদি হয়, তবে বাবাজীদের এবার ঘুঘু আর ফাঁদ দুই-ই দেখিয়ে ছাড়ব । চলে আয় সব—কুইক মার্চ—

বলে এমনিভাবে আমাকে একটা হ্যাঁচকা টান মারল যে আমি ছিটকে সামনের মেঝেয় গিয়ে পড়লুম।

হাবুল সেন প্যাঁচার মতো ব্যাজার মুখে বললে, কোথায় যেতে হবে?

—লোকগুলোর সঙ্গে একবার মোলাকাত করতে । আমরা কলকাতার ছেলে—আমাদের বক দেখিয়ে কেটে পড়বে— ইয়ার্কি নাকি ! চল-চল, ভালো করে একবার চারদিকটা ঘুরে দেখি।

ক্যাবলা বললে, কিন্তু আমার ব্রেকফাস্ট—

—সেটা একেবারে লাঞ্চের সময়েই হবে । নে—চল—

হাবুল আর ক্যাবলা উঠে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল স্পষ্ট দিনের আলোয়—সেই বেলা আটটার সময়—ঠিক আমাদের মাথার ওপর কে যেন কর্কশ গলায় বলে উঠল । বাঃ—বেশ, বেশ !

তারপরেই হা-হা করে ঠাট্টার অট্টহাসি । .

কে বললে, কে হাসল ? কেউ না। মাথার ওপরে টালির চাল আর লাল ইটের ফাঁকা দেওয়াল—জন-মানুষের চিহ্নও নেই কোথাও । যেন হাওয়ার মধ্যে থেকে ভেসে এসেছে আশ্চর্য শব্দগুলো ।

ছপ্পর পর কৌয়া নাচে

রাত নয়—অন্ধকার নয়—একেবারে ফুটফুটে দিনের আলো। দেওয়ালের ওপরে টালির চাল—একটা চড়ুই পাখি পর্যন্ত বসে নেই সেখানে। অথচ ঠিক মনে হল ওই টালির চাল ফুড়েই হাসির আওয়াজটা বেরিয়ে এল।

কী করে হয় ? কী করে এমন সম্ভব ?

আমরা কি পাগল হয়ে গেছি ? না কি ঝন্টুরাম চায়ের সঙ্গে সিদ্ধি-ফিদ্ধি কিছু খাইয়ে দিলে ? তাই বা হবে কেমন করে ? ক্যাবলা তো চা খায়নি আমাদের সঙ্গে ! তবু সেও ওই অশরীরী হাসির আওয়াজটা ঠিক শুনতে পেয়েছে।

প্রায় চার মিনিট ধরে আমরা চারমূর্তি চারটে লাটুর মতো বসে রইলুম। আমরা অবশ্য লাটুর মতো ঘুরছিলুম না—কিন্তু মগজের সব ঘিলুগুলো ঝনর-ঝনর করে পাক খাচ্ছিল । খাসা ছিলুম পটলডাঙায়, পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খেয়ে দিব্যি দিন কাটছিল। কিন্তু টেনিদার প্যাঁচে পড়ে এই ঝণ্টিপাহাড়ে এসে দেখছি ভূতের কিল খেয়েই প্রাণটা যাবে ।

আরও তিন মিনিট পরে যখন আমার পিলের কাঁপুনি খানিক বন্ধ হল, আমি ক্যাবলাকে বললুম, এবার?

হাবুল সেন গোঁড়ালেবুর মতো চোখ দুটোকে একবার চালের দিকে বুলিয়ে এনে বললে, হ, অখন কও!

টেনিদা খাঁড়ার মতো নাকটা টিয়ার ঠোঁটের মতো সামনের দিকে ঝুলে পড়েছিল। জিভ দিয়ে একবার মুখ-টুখ চেটে টেনিদা বললে, মানে—ইয়ে হল, মানুষটানুষ সামনে পেলে চাঁটির চোটে তার নাক-টাক উড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু ইয়ে—মানে, ভূতের সঙ্গে তো ঠিক পারা যাবে না—

আমি বললুম, তা ছাড়া ভূতেরা ঠিক বক্সিংয়ের নিয়ম-টিয়মও মানে না—

টেনিদা ধমক দিয়ে বললে, তুই থাম না পুঁটিমাছ !

পুঁটিমাছ বললে আমার ভীষণ রাগ হয়। যদি ভূতের ভয় আমাকে বেজায় কাবু করে না ফেলত আর পালাজ্বরের পিলেটা টনটনিয়ে না উঠত, আমি ঠিক টেনিদাকে পোনামাছ নাম দিয়ে দিতুম |

ক্যাবলা কিন্তু ভাঙে তবু মচকায় না। চট করে সে একেবারে সামনের লনে গিয়ে নামল । তারপর মাথা উঁচু করে সে দেখতে লাগল। তারও পরে বেজায় খুশি হয়ে বললে, ঠিক ধরেছি। ওই যে বলছিলুম না ?

‘ছিল্পর পর কৌয়া নামে
নাচে বড়ুলা—’

টেনিদা বলল—মানে ?

ক্যাবলা বললে, মানে ? মানে হল, চালের ওপর কাক নাচে—আর নাচে বক।

—রাখ তোর বক নিয়ে বকবকানি । কী হয়েছে বল দিকি ?

—হবে আর কী । একেবারে ওয়াটারের মতো—মানে পানিকা মাফিক সোজা ব্যাপার । ওই চালের ওপরে লোক বসেছিল কেউ । সে-ই ওরকম বিটকেল হাসি হেসে আমাদের ভয় দেখিয়েছে।

—সে-লোক গেল কোথায় ?

—আঃ, নেমে এসো না—দেখাচ্ছি সব । আরে ভয় কী—না হয় রাম-রাম জপ করতে করতেই চলে এসো এখানে ।

—ভয়! ভয় আবার কে পেয়েছে? —টেনিদা শুকনো মুখে বললে, পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরেছে কিনা —

ক্যাবলা খিক-খিক করে হাসতে লাগল। —ভূতের ভয়ে বহুত আদমির অমন করে ঝিঁ-ঝি ধরে । ও আমি অনেক দেখেছি। এর পরে বসে থাকলে আর দলপতির মান থাকে না । টেনিদা ডিম-ভাজার মতো মুখ করে আস্তে-আস্তে লনে নেমে গেল। অগত্যা আমি আর হাবুলও গুটি-গুটি গেলাম টেনিদার পেছনে পেছনে ।

ক্যাবলা বললে, পেছনে ওই ঝাঁকড়া পিপুল গাছটা দেখছ? আর দেখছ—ওর একটা মোটা ডাল কেমনভাবে বাংলোর চালের ওপর নেমে এসেছে ? ওই ডাল ধরে একটা লোক চালের ওপর নেমে এসেছিল। টালিতে কান পেতে আমাদের কথাগুলো শুনেছে, আর হা-হা করে হেসে ভয় দেখিয়ে ডাল বেয়ে সটকে পড়েছে।

হাবুল আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল ; হ, এইটা নেহাত মন্দ কথা কয় নাই। দ্যাখতে আছ না, চালের ওপর কতকগুলি কাঁচা পাতা পইড়্যা রইছে? কেউ ওই ডাল বাইয়া আসছিল ঠিকোই।

—আসছিল তো ঠিকোই—হাবুলের গলা নকল করে টেনিদা বললে, কিন্তু এর মধ্যেই সে গেল কোথায় ?

ক্যাবলা বললে, কোথাও কাছাকাছি ওদের একটা আড্ডা আছে নিশ্চয় । মুড়ি আর চীনেবাদাম দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। সেই আড্ডাটাই খুঁজে বের করতে হবে । রাজি আছ ?

টেনিদা নাক চুলকে বললে, মানে কথা হল—

ক্যাবলা আবার খিকখিক করে হেসে উঠল : মানে কথা হল, তোমার সাহস নেই—এই তো ? বেশ, তোমরা না যাও আমি একাই যাচ্ছি।

দলপতির মান রাখতে প্রায় প্রাণ নিয়ে টান পড়বার জো ! টেনিদা শুকনো হাসি হেসে বললে, যাঃ—যাঃ —বাজে ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করিসনি। মানে, সঙ্গে দু-একটা বন্দুক-পিস্তল যদি থাকত—

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, বন্দুক-পিস্তল থাকলেই বা কী হত । কখনও ছুঁড়েছি নাকি ওসব ! আর টেনিদার হাতে বন্দুক থাকা মানেই আমরা স্রেফ খরচের খাতায়। ভূত-টুত মারবার আগে টেনিদা আমাদেরই শিকার করে বসত ।

ক্যাবলা বলল, বন্দুক দিয়ে কী হবে ? তুমি তো এক-এক চড়ে গড়ের মাঠের এক-একটা গোরাকে শুইয়ে দিয়েছে শুনতে পাই। বন্দুক তোমার মতো বীরপুরুষের কী দরকার ?

অন্য সময় হলে টেনিদা খুশি হত, কিন্তু এখন ওর ডিম-ভাজার মতো মুখটা প্রায় আলু-কাবলির মতো হয়ে গেল । টেনিদা হতাশ হয়ে বললে, আচ্ছা—চল দেখি একবার !

ক্যাবলা ভরসা দিয়ে বললে, তুমি কিছু ভেবো না টেনিদা। এ সব নিশ্চয় দুষ্ট লোকের কারসাজি । আমরা পটলডাঙার ছেলে হয়ে এত ঘেবড়ে যাব ? ওদের জারি-জুরি ভেঙে দিয়ে তবে কলকাতায় ফিরব, এই বলে দিলাম ।

হাবুল ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল , হ! কার জারিজুরি যে কেডা ভাঙব, সেইটাই ভালো বোঝা যাইতে আছে না !

কিন্তু ক্যাবল এর মধ্যেই বীরদর্পে পা বাড়িয়েছে। টেনিদা মানের দায়ে চলেছে পেছনে পেছনে । হাবুলও শেষ পর্যন্ত এগোল স্কড়স্কড় করে । আমি পালাজ্বরের রুগী প্যালারাম, আমার ওসব ধাষ্টামোর মধ্যে এগোনোর মোটেই ইচ্ছে ছিল না, তবু একা-একা এই বাংলোয় বসে থাকব—ওরেঃ বাবা ! আবার যদি সেই ঘর-ফাটানো হাসি শুনতে পাই—তা হলে আমাকে আর দেখতে হবে না ! বাংলোতে হতভাগা ঝন্টুরামটা থাকলেও কথা ছিল, কিন্তু আমাদের খাওয়ার বহর দেখে চ খাইয়ে সামনের গাঁয়ে মুরগি কিনতে ছুটেছে। এক-একা এখানে ভূতের খপ্পরে বসে থাকব, এমন বান্দাই আমি নই।

কোথায় আর খুঁজব—কীই বা পাওয়া যাবে।

তবু চারজনে চলেছি। বাংলোর পেছনেই একটা জঙ্গল অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। জঙ্গলটা যে খুব

উঁচু তা নয়—কোথাও মাথা-সমান, কোথাও আর একটু বেশি । বেঁটে বেঁটে শাল-পলাশের গাছ—কখনও কখনও ঘেঁটু আর আকন্দের ঝোপ । মাঝখান দিয়ে বেশ একটা পায়ে-চলা পথ একেবেঁকে চলে গেছে । এ-পথ দিয়ে কারা যে হাঁটে কে জানে । তাদের পায়ের পাতা সামনে না পেছন দিকে, তাই বা কে বলবে !

প্রথম-প্রথম বুক দুর-দুর করছিল । খালি মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি ঝোপের ভেতর থেকে হয় একটা স্কন্ধকাটা, নইলে শাকচুন্নি বেরিয়ে আসবে। কিন্তু কিছুই হল না। দুটো-চারটে বুনো ফল—পাখির ডাক আর সূর্যের মিষ্টি নরম আলোয় খানিক পরেই ভয়-ভয় ভাবটা মন থেকে কোথায় মুছে গেল ।

গোড়ার দিকে বেশ হুঁশিয়ার হয়েই হাঁটছিলুম—যাচ্ছিলুম ক্যাবলার পাশাপাশি । তারপর দেখি একটা বৈঁচি গাছ—ইয়া-ইয়া বৈঁচি পেকে কালো হয়ে রয়েছে। একটা ছিড়ে মুখে দিয়ে দেখি—অমৃত । তারপরে আরও একটা—তারপরে আরও একটা—

গোটা-পঞ্চাশেক খেয়ে খেয়াল হল, ওরা অনেকখানি এগিয়ে গেছে ! তাড়াতাড়ি ওদের সঙ্গ ধরতে হবে—হঠাৎ দেখি আমার পাশেই ঝোপের মধ্যে—

লম্বা শাদা মতো কী ওটা ? নির্ঘাত লাজ ! কাঠবেড়ালির ল্যাজ ।

কাঠবেড়ালি বড় ভালো জিনিস। ভন্টার মামা কোত্থেকে একবার একটা এনেছিল, সেটা তার কাঁধের ওপর চড়ে বেড়াত, জামার পকেটে শুয়ে থাকত। ভারি পোষ মানে। সেই থেকে আমারও কাঠবেড়ালি ধরবার বড় শখ। ধরি না খপ করে ওর ল্যাজটা চেপে !

যেন ওদিকে তাকাচ্ছিই না—এমনিভাবে গুটি-গুটি এগিয়ে টক করে কাঠবেড়ালির ল্যাজটা আমি ধরে ফেললুম। তারপরেই হেঁইয়ো টান !

কিন্তু কোথায় কাঠবেড়ালি ! যেই টান দিয়েছি, অমনি হাই-মই করে একটা বিকট দানবীয় চিৎকার। সে চিৎকারে আমার কানে তালা গেলে গেল । তারপরেই কোথা থেকে আমার গালে এক বিরাশি সিক্কার চড়। ভৌতিক চড় ।

সেই চড় খেয়ে আমি শুধু সর্ষের ফুলই দেখলুম না। সর্ষে কলাই, মটর, মুগ, পাট, আম, কাঁঠাল—সব-কিছুর ফুলই এক সঙ্গে দেখতে পেলুম । তারপরই—

সেই ঝোপের ভেতরে সোজা চিত । একেবারে পতন ও মুর্ছা। মরেই গেলুম কি না কে জানে!

কাঠবেড়ালির ল্যাজ নয় রে ওটা কাহার দাড়ি?

যখন জ্ঞান হল তখন দেখি, আমি ডাক-বাংলোর খাটে লম্বা হয়ে আছি। ঝাঁটু মাথার সামনে দাঁড়িয়ে আমায় হাওয়া করছে, ক্যাবলা পায়ের কাছে বসে মিটমিটে চোখে তাকিয়ে আছে আর পাশে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে টেনিদা ঘুঘুর মতো বসে রয়েছে।

ঝাঁটুর হাতের পাখাটা খটাস করে আমার নাকে এসে লাগতেই আমি বললুম, উঁফ। চেয়ার ছেড়ে টেনিদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল যাক, তা হলে এখনও তুই মারা যাসনি !

ক্যাবলা বললে, মারা যাবে কেন ? থোড়াসে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল । আমি তো বলেছিলুম টেনিদা,ওর নাকে একটুখানি লঙ্কা পুড়িয়ে ধোঁয়া দাও— এক্ষুণি চাঙা হয়ে উঠবে।

টেনিদা বললে, আর লঙ্কা-পোড়া ! যেমনভাবে দাঁত ছরকুটে পড়েছিল, দেখে তো মনে হচ্ছিল, পটলডাঙা থেকে এখানে এসেই বুঝি শেষ পর্যন্ত পটল তুলল ।

মাঝখান থেকে ঝাঁটু বিচ্ছিরি রকমের আওয়াজ করে হেসে বললে, দাদাবাবু ডর খিয়েছিলেন !

ক্যাবলা বললে, যাঃ-যাঃ, তোকে আর ওস্তাদি করতে হবে না ! এখন শিগগির এক পেয়ালা গরম দুধ নিয়ে আয় দেখি !

ঝাঁটু পাখা রেখে বেরিয়ে গেল ।

আমি তখনও চোখে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখছি । ডান চোয়ালে অসম্ভব ব্যথা । এমন চড় হাঁকড়েছে যে, গোটাদুয়েক দাঁত বোধহয় নড়িয়েই দিয়েছে একেবারে । চড়ের মতো চড় একখানা ! অঙ্কের মাস্টারের বিরাশি সিক্কার চাঁটি পর্যন্ত এর কাছে একেবারে সুগন্ধি তিন-নং পরিমল নস্যি। আমি পটলডাঙার রোগা ডিগডিগে প্যালারাম, পালাজ্বরে ভুগি, আর পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খাই, এমন একখানা ভৌতিক চপেটাঘাতের পরেও আমার আত্মারাম কেন যে খাঁচাছাড়া হয়নি, সেইটেই আমি বুঝতে পারছিলুম না ।

টেনিদা বললে, আচ্ছা পুঁটিমাছ তুই হঠাৎ ডাক ছেড়ে অমন করে অজ্ঞান হয়ে গেলি কেন ?

এ অবস্থাতেও পুঁটিমাছ শুনে আমার ভয়ানক রাগ হল, চোয়ালের ব্যথা-ট্যথা সব ভুলে গেলুম। বাজার হয়ে বললুম, আমি পুঁটিমাছ আছি বেশ আছি, কিন্তু ও-রকম একখানা বোম্বাই চড় খেলে তুমি ভেটকিমাছ হয়ে যেতে ! কিংবা ট্যাপামাছ !

ক্যাবলা আশ্চর্য হয়ে বললে, চাঁটি আবার তোকে কে মারলে ?

টেনিদা বললে, ভূত। ভূতের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। খামকা তোকে চাঁটি মারতে গেল ? তাও সকালবেলায় ? পাগল না পেট-খারাপ ?

ক্যাবলা বললে, পেট-খারাপ । এদিকে ওই তো রোগা ডিগডিগে চেহারা, ওদিকে পৌঁছে অবধি সমানে মুরগি আর আণ্ডা চালাচ্ছে । অত সইবে কেন ? পেট-গরম হয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। ভূত-টুত সব বোগাস।

টেনিদা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলে, ঠিক। আমিও ওই কথাই বলতে যাচ্ছিলুম।

ডান চোয়ালটা চেপে ধরে আমি এবার বিছানার ওপরে উঠে বসলুম।

—তোমরা বিশ্বাস করছ না ?

টেনিদা বললে, একদম না। ভূতে আর চাটি মারবার লোক পেলে না !

ক্যাবলা মাথা নাড়ল ; বটেই তো। আমাদের লিডার টেনিদার অ্যায়সা একখানা জুতসই গাল থাকতে তোর গালেই কিনা চাঁটি হাঁকড়াবে ? ওতে লিডারের অপমান হয়—তা জানিস ?

শুনে টেনিদা কটমট করে ক্যাবলার দিকে তাকাল ।

—ঠাট্টা করছিস ?

ক্যাবলা তিড়িং করে হাত-পাঁচেক দূরে সরে গেল। জিভ কেটে বললে, কী সর্বনাশ ! তোমাকে ঠাট্টা ! শেষে যে গাঁট্টা খেয়ে আমার গালপাট্টা উড়ে যাবে ! আমি বলছিলুম কি, ভূত এসে হ্যান্ডশেকই করুক আর বক্সিংই জুড়ে দিক, লেকিন ওটা দলপতির সঙ্গে হওয়াটাই দস্তুর ।

টেনিদার কথাটা ভালো লাগল না । মুখটাকে হালুয়ার মতো করে বললে, যা-যাঃ, বেশি ক্যাঁচোর-ম্যাচোর করিসনি। কিন্তু তোকেও বলে দিচ্ছি প্যালা, এ বেলা থেকে তোর ডিম খাওয়া একেবারে বন্ধ! স্রেফ কাঁচকলা দিয়ে গাঁদালের ঝোল, আর রাত্তিরে সাবু বার্লি । আজকে মুচ্ছে গিয়েছিলি, দু-চারদিন পরে একেবারেই যে মারা যাবি !

আমি রেগে বললু, ধ্যাত্তোর আমার সাবু-বার্লির নিকুচি করেছে! বলছি সত্যিই ভূতে চাঁটি মেরেছে, কিছুতেই বিশ্বাস করবে না !

ক্যাবলা বললে, বটে ?

টেনিদা বললে, থাম, আর চালিয়াতি করতে হবে না ।

আমি আরও রেগে বললুম, চালিয়াতি করছি নাকি ? তা হলে এখনও আমার ডান গালটা টনটন করবে কেন ?

টেনিদা বললে, অমন করে । খামকাই তো লোকের দাঁত কনকন করে, মাথা বনবন করে, কান ভোঁ-ভোঁ করতে থাকে—তাই বলে তাদের সকলকে ধরেই কি ভূতে ঠ্যাঙায় নাকি ?

আমি এবারে মনে ভীষণ ব্যথা পেলুম। এত কষ্টে-সৃষ্টে যদিই বা গালে একটা ভূতুড়ে চড় খেয়েছি, কিন্তু এই হতভাগারা কিছুতেই বিশ্বাস করছে না। ওরা নিজেরা খেতে পায়নি কিনা, তাই বোধহয় ওদের মনে হিংসে হয়েছে।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম, কেন বিশ্বাস করছ না বলো তো ? তোমরা তো গুটি-গুটি সামনে এগিয়ে গেলে । এর মধ্যে গোটাকয়েক বৈঁচি-টৈচি খেয়ে আমি দেখলুম, ঝোপের মধ্যে একটা কাঠবেড়ালির ল্যাজ নড়ছে। যেই সেটাকে খপ করে চেপে ধরেছি, অমনি—

—অমনি কাঠবেড়ালি তোকে চড় মেরেছে ?—বলেই টেনিদা হা-হা করে হাসতে লাগল। আবার ক্যাবলার নাক-মুখ দিয়ে শেয়ালের ঝগড়ার মতো খিকখিক করে কেমন একটা আওয়াজ বেরোতে শুরু করল।

এই দারুণ অপমানে আমার পেটের মধ্যে পালাজ্বরের পিলেটা নাচতে লাগল। আর সেই সঙ্গেই হঠাৎ নিজের ডানহাতের দিকে আমার চোখ পড়ল । আমার মুঠোর মধ্যে— একরাশ শাদা শাদা রোঁয়া । সেই ল্যাজটারই খানিক ছিড়ে এসেছে নিশ্চয় । সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বললাম, এই দ্যাখো, এখনও কী লেগে রয়েছে আমার হাতে !

ক্যাবলা এক লাফে এগিয়ে এল সামনে । টেনিদা থাবা দিয়ে রোঁয়াগুলো তুলে নিলে আমার হাত থেকে ।

তারপর টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল : এ যে—এ যে—

ক্যাবলা আরও জোরে চেঁচিয়ে বললে, দাড়ি ।

টেনিদা বললে, পাকা দাড়ি ।

ক্যাবলা বললে, তাতে আবার পাটকিলে রঙ । তামাক-খাওয়া দাড়ি ।

টেনিদা বললে, ভূতের দাড়ি ।

ক্যাবলা বললে, তামাকখেকো ভূতের দাড়ি !

ভূতের দাড়ি ! শুনে আর একবার আমার হাত-পা পেটের মধ্যে সেধিয়ে যাওয়ার জো হল। কী সর্বনাশ—করেছি কী ! শেষে কি কাঠবেড়ালির ল্যাজ টানতে গিয়ে ভূতের দাড়ি ছিড়ে এনেছি ? তাই অমন একখানা

মোক্ষম চড় বসিয়েছে আমার গালে । কিন্তু একখানা চড়ের ওপর দিয়েই কি আমি পার পাব ? হয়তো কত যত্নের দাড়ি, কত রাত-বিরেতে শ্যাওড়া গাছে বসে ওই দাড়ি চুমরে চুমরে ভূতটা খাম্বাজ-রাগিণী গাইত। অবশ্য খাম্বাজ রাগিণী কাকে বলে আমার জানা নেই, তবে নাম শুনলেই মনে হয়, ও-সব রাগ-রাগিণী ভূতের গলাতেই খোলতাই হয় ভালো । —আমি সেই সাধের দাড়ি ছিড়ে নিয়েছি, এখন মাঝরাতে এসে আমার মাথার চুলগুলো উপড়ে নিয়ে না যায় । ক্যাবলা আর টেনিদা দাড়ি নিয়ে গবেষণা করুক—আমি হাত-পা ছেড়ে আবার বিছানার ওপর ধপাস করে শুয়ে পড়লুম।

ক্যাবলা দাড়িগুলো বেশ মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে বললে, কিন্তু টেনিদা—ভূতে কি তামাক খায় ?

—কেন, খেতে দোষ কী ?

—মানে ইয়ে কথা হল—ক্যাবলা মাথা চুলকে বললে, লেকিন বাত এহি হ্যায়, ভূতে তো শুনেছি আগুন-টাগুন ছুতে পারে না—তাহলে তামাক খায় কী করে ? তা ছাড়া আমার মনে হচ্ছে—এমনি পাকা, এমনি পাটকিলে-রঙ-মাখানো দাড়ি যেন আমার চেনা, যেন এ-দাড়িটা কোথায় আমি দেখেছি—

ক্যাবলা আরও কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দু-পাটি জুতো হাতে করে ঘরের মধ্যে ঝাঁটু এসে ঢুকল। টেনিদার মুখের সামনে জুতোজোড়া তুলে ধরে বললে, এই দেখুন দাদাবাবু—

টেনিদা চেঁচিয়ে উঠে বললে, ব্যাটা কোথাকার গাঁড়ল রে । বলা হল প্যালার খাওয়ার জন্য দুধ আনতে, তুই আমার মুখের কাছে জুতোজোড়া এনে হাজির করল ? আমি কি ও-দুটো চিবোব নাকি বসে বসে ?

ঝাঁটু বললে, রাম-রাম । জুতো তো কুত্তা চিবোবে, আপনি কেন ? আমি বলছিলাম, হাবুলবাবু কুথা গেল ! জুতোটা বাহিরে পড়েছিল, হাবুলবাবুকে তো কোথাও দেখলম না। ফির জুতোর মধ্যে একটা চিঠি দেখলম, তাই নিয়ে এলম।

জুতোর মধ্যে চিঠি ? আরে, তাই তো বটে। আমি জ্ঞান হওয়ার পরে তো সত্যিই এ-ঘরে হাবুল সেনকে দেখতে পাইনি ।

ক্যাবলা বললে,তাই তো । জুতোর ভেতরে চিঠির মতো একটা কী রয়েছে যে । ব্যাপার কী, টেনিদা ? হাবুলটাই বা গেল কোথায় ?

টেনিদা ভাঁজ-করা কাগজটা টেনে বের করে বললে, দাঁড়া না কাঁচকলা, আগে দেখি চিঠিটা ।

কিন্তু চিঠির ওপর চোখ বুলোতেই—সে দুটো তড়াক করে একেবারে টেনিদার কপালে চড়ে গেল । বার-তিনেক খাবি খেয়ে টেনিদা বললে, ক্যাবলা রে, আমাদের বারোটা বেজে গেল ।

—বারোটা বেজে গেল ! মানে ?

—মানে—হাবুল 'গন । ,

—কোথায় 'গন ?—আমি আর ক্যাবলা একসঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠলাম : চিঠিতে কী আছে টেনিদা ? কী লেখা ওতে ?

ভাঙা গলায় টেনিদা বললে, তবে শোন, পড়ি ।

চিঠিতে খেলা ছিল :

'হাবুল সেনকে আমরা ভ্যানিশ করিলাম। যদি পত্রপাঠ চাঁটি-বাঁটি তুলিয়া আজই কলিকাতায় রওনা হও, তবে যাওয়ার আগে অক্ষত শরীরে হাবুলকে ফেরত পাইবে । নতুবা পরে তোমাদের চার মূর্তিকেই আমরা ভ্যানিশ করিব—এবং চিরতরেই তাহা করিব। আগে হইতেই সাবধান করিয়া দিলাম, পরে দোষ দিতে পারিবে না ।

ইতি—ঘচাং ফুঃ । দুর্ধর্ষ চৈনিক দস্যু।'

নিস্ক্য কচাং কুঃ

টেনিদা ধপাস করে মেঝের ওপর বসে পড়ল । ওর নাকের সামনে অনেকক্ষণ ধরে একটা পাহাড়ি মৌমাছি উড়ছিল, অত বড় নাকটা দেখে বোধহয় ভেবেছিল, ওখানে একটা জুতসই চাক বাঁধা যায়। হঠাৎ টেনিদার নাক থেকে ঘড়াৎ-ঘড় করে এমনি একটা আওয়াজ বেরুল যে—সেটা ঘাবড়ে গিয়ে হাত তিনেক দূরে ঠিকরে পড়ল ।

লিডারের অবস্থা তখন সঙিন । করুণ গলায় বললে, ওরে বাবা—গেলুম। শেষকালে কিনা চীনে দস্যুর পাল্লায় ! এর চেয়ে যে ভূতও অনেক ভালো ছিল ।

আমাক হাত-পা গুলো তখন আমার পিলের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। বললুম, তার নাম আবার ঘচাং ফুঃ অথাৎ ঘচাং করে গলা কেটে দেয়. তারপর ফুঃ করে উড়িয়ে দেয় ।

ঝাঁটু মিটমিট করে তাকাচ্ছিল। আমাদের অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে বললে, বেপার কী বটেক দাদাবাবু? ক্যাবলা বললে, বেপার? বেপার সাঙ্ঘাতিক। হাঁ রে ঝাঁটু, এখানে ডাকাত-ফাকাত আছে?

—ডাকাত ?—ঝাঁটু বললে, ডাকাত ফির ইখানে কেনে মরতে আসবেক ? ই তল্লাটে উসব নাই ।

—নাঃ, নেই —মুখখানাকে কচু-ঘণ্টর মতো করে টেনিদা খেঁকিয়ে উঠল ; তবে ঘচাং ফুঃ কোত্থেকে এল ? তাও আবার যে-সে নয়—একেবারে দুর্ধর্ষ চৈনিক দস্যু !

ক্যাবলা কী পাখোয়াজ ছেলে । কিছুতেই ঘাবড়ায় না । বললে, আরে দুৎেত্তার—রেখে দাও ওসব ? দেখলে তো, তা হলে কিছু নয়, সব ধাপ্পা! ঘচাং ফুর তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—এই হাজারিবাগের পাহাড়ি বাংলোয় এসে ভ্যারেন্ডা ভাজবে । আসলে ব্যাপার কী জানো ? স্রেফ বাংলা ডিটেকটিভ উপন্যাস ।

—বাংলা ডিটেকটিভ উপন্যাস !—টেনিদা চোয়াল চুলকোতে চুলকোতে বললে ; মানে ?

—মানে ? মানে আবার কী ? ওই এনতার সব গোয়েন্দা গল্প—যে-সব গল্পের পুকুরে সাবমেরিন ভাসায়, আর যাতে করে বাঙালী গোয়েন্দা দুনিয়ার সব অসাধ্য সাধন করে—সেই সমস্ত বই পড়ে এদের মাথায় এগুলো ঢুকেছে। আমার বড়মামা লালবাজারে চাকরি করে, তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম—এই গোয়েন্দারা কোথায় থাকে। বড়মামা রেগে গিয়ে যাচ্ছেতাই করে বললে, কী একটা কলকেতে থাকে।

—চুলোয় যাক গোয়েন্দা । টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, তার সঙ্গে ঘচাং ফুর সম্পর্ক কী?

—আছে—আছে ! ক্যাবলা সবজান্তার মতো বললে, যারা এই চিঠি লিখেছে, তারা গোয়েন্দা-গল্প পড়ে। পড়ে-পড়ে আমাদের ওপরে একখানা চালিয়াতি খেলেছে।

–কিন্তু এ-রকম চালিয়াতি করার মানে কী ? আমাদের এখান থেকে তাড়াতেই বা চায় কেন ? আর হাবুল সেনকেই বা কোথায় নিয়ে গেল ? :

ক্যাবলা বললে, সেইটেই তো রহস্য ! সেটা ভেদ করতে হবে । কতকগুলো পাজি লোক নিশ্চয়ই আছে —আর কাছাকাছিই কোথাও আছে। কিন্তু এই চিঠিটা দিয়ে এরা মস্ত উপকার করেছে টেনিদা !

—উপকার ?—টেনিদা বললে, কিসের উপকার ?

—একটা জিনিস তো পরিষ্কার বোঝা গেল, জিন-টিন এখানে কিছু নেই—ও-সব একদম ভোঁ-কাট্টা । কতকগুলো ছ্যাঁচড়া লোক কোথাও লুকিয়ে রয়েছে—এ-বাড়িটায় তাদের দরকার। আমরা এসে পড়ায় তাদের অসুবিধে হয়েছে—তাই আমাদের তাড়াতে চায় ।

—ক্যাবলা বুক টান করে বললে, কিন্তু আমরা পটলডাঙার ছেলে হয়ে একদল ছিচকে লোকের ভয়ে পালাব টেনিদা ? ওদের টাকের ওপরে টেক্কা মেরে জানিয়ে দিয়ে যাব, ওরা যদি ঘচাং ফুঃ হয়—তা হলে আমরা হচ্ছি কচাং কুঃ !

—কচাং কুঃ —আমি বললুম, সে আবার কী ?

ক্যাবলা বললে, বাঘা চৈনিক দস্যু ! দুধর্ষের ওপর আর-এক কাঠি।

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, আমরা আবার চীনে হলুম কবে ? দস্যুই বা হতে যাব কোন দুঃখে ?

ক্যাবলা বললে, ওরা যদি চৈনিক হয়—আমাদেরই বা হতে দোষ কী ? আমরাও ঘোরতর চৈনিক। ওরা যদি দস্যু হয়—আমরা নস্যু ! -

—নস্যু! —টেনিদার নাক-বরাবর আবার সেই মৌমাছিটা ফিরে আসছিল, সেটাকে তাড়াতে তাড়াতে টেনিদা বললে, নস্যু। কাকে বলে ?

—মানে, দস্যুদের যারা নস্যির মতো নাক দিয়ে টেনে ফেলে, তারাই হল নস্যু। টেনিদা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, দ্যাখ ক্যাবলা, সব জিনিস নিয়ে ইয়ার্কি নয় ! যদি সত্যিই ওরা ডাকাত-টাকাত হয়—

ডাকাত হলে অনেক আগেই ওদের মুরোদ বোঝা যেত। বসে-বসে ঝোপের মধ্যে চীনেবাদাম খেত না, কিংবা কাগজে জড়িয়ে মড়ার মাথা ছুড়ত না । ওরাও এক নম্বর কাওয়ার্ড !

—তা হলে হাবুল সেনকে নিয়ে গেল কী করে ?

—নিশ্চয়ই কোনও কায়দা করেছে । কিন্তু সে-কায়দাটা সমঝে ফেলতে বহুত সময় লাগবে না । টেনিদা —

—কী?

—আর দেরি নয় । রেডি ?

টেনিদা বললে, কিসের রেডি ?

—ঘচাং ফুঃ-দের কচাং কুঃ করতে হবে । আজই, এক্ষুনি ।

টেনিদা তখনও সাহস পাচ্ছিল না। কুঁকড়ে গিয়ে বললে, সে কী করে হবে ?

—হয়ে যাবে একরকম । এই বাংলোর কাছাকাছিই ওদের কোনও গোপন আস্তানা আছে । হানা দিতে হবে সেখানে গিয়ে ।

—ওরা যদি পিস্তল-টিস্তল ছোঁড়ে ?

—আমরা ইট ছুঁড়ব!

—ক্যাবলা ভেংচি কেটে বললে, রেখে দাও পিস্তল ! গোয়েন্দা-গল্পে ওসব কথায়-কথায় বেরিয়ে আসে, আসলে পিস্তল অত সস্তা নয়। হ্যাঁ—গোটাকয়েক লাঠি দরকার। এই ঝাঁটু—লাঠি আছে রে ?

ঝাঁটু চুপচাপ সব শুনছিল। কী বুঝছিল কে জানে, মাথা নেড়ে বললে, দুটো আছে। একটো বল্লমও আছে।

—তবে নিয়ে আয় চটপট ।

—লাঠি-বল্লমে কী হবেক দাদাবাবু?—ঝাঁটুর বিস্মিত জিজ্ঞাসা ।

—শেয়াল মারা হবেক ।

—শেয়াল মারা ? কেনে ? মাংস খাবেন ?

—অত খবরে তোর দরকার কী ? —ক্যাবলা রেগে বললে, যা বলছি তোকে তাই কর । শিগগির নিয়ে আয় ওগুলো । চটপট ।

ঝাঁটু লাঠি বল্লম আনতে গেল। টেনিদা শুকনো গলায় বললে, কিন্তু ক্যাবলা, এ বোধহয় ভালো হচ্ছে না। যদি সত্যিই বিপদ-আপদ হয়—

ক্যাবলা নাক কুঁচকে বললে, অঃ—তুমহারা ডর লাগ গিয়া ? বেশ, তুমি তা হলে বাংলোয় বসে থাকো। আমি তো যাবই—এমনকি পালাজ্বরে-ভোগা এই প্যালাটাও আমার সঙ্গে যাবে । দেখবে, তোমার চাইতে

ওরও বেশি সাহস আছে ।

শুনে আমার বুক ফুলে উঠল বটে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে পালাজ্বরের পিলেটাও নড়-নড় করে উঠল—আমাকেও যেতে হবে । বেশ, তাই যাব । একবার ছাড়া তো দুবার মরব না।

আর আমি মারা গেলে—হ্যাঁ, মা কাঁদবে, পিসিমা কাঁদবে, বোধহয় সেকেন্ডারি বোর্ডও কাঁদবে—কারণ, বছর-বছর স্কুল-ফাইনালের ফি দেবে কে ? আর বৈঠকখানা বাজারে দৈনিক আধপো পটোল আর চারটে শিঙিমাছ কম বিক্রি হবে—এক ছটাক বাসকপাতা বেঁচে যাবে রোজ । তা যাক ! এমন বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের জন্যে সংসারের একটু-আধটু ক্ষতি নয় হলই বা !

টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, চল,—তবে যাই । কিন্তু প্যালার সেই দাড়িটা—

বললুম, তামাকখেকো দাড়ি ।

ক্যাবলা বললে, ঠিক । মনেই ছিল না। ওই দাড়ি থেকেই আরও প্রমাণ হয়—ওরা চৈনিক নয়। কলকাতায় তো এত চীনা মানুষ আছে—কারও দাড়ি দেখেছ কখনও ?

তাই তো ! দাড়িওলা চীনা মানুষ ! না, আমরা কেউ তো দেখিনি। কখনও না ।

এর মধ্যে ঝাঁটু লাঠি আর বল্লম এনে ফেলেছে। বল্লমটা ঝাঁটুই নিলে, একটা লাঠি নিলে ক্যাবলা—আর-একটা টেনিদা। আমি আর কী নিই ? হাতের কাছে একটা চালাকাঠ পড়েছিল, সেইটেই কুড়িয়ে নিলুম। যদি মরতেই হয়, তবু তো এক ঘা বসাতে পারব ।

অতঃপর ঘচাং ফুঃ দস্যুর দলকে একহাত নেবার জন্যে দস্যু কচাং কুর দল আবার রওনা হল বীরদর্পে। আবার সেই বুনো রাস্তা। আমরা ঝোপ-ঝাপ ঠেঙিয়ে-ঠেঙিয়ে দেখছিলুম, কোথাও সেই তামাকখেকো লুকিয়ে আছে কি না ।

কিন্তু আবার আমি বিপদে পড়ে গেলুম। এবার বৈঁচি নয়—কামরাঙা । বাংলোর ঠিক পেছন দিয়ে আমরা চলেছি। আমি যথানিয়মে পিছিয়ে পড়েছি—আর ঠিক আমারই চোখে পড়েছে কামরাঙার গাছটা । আঃ, ফলে-ফলে একেবারে আলো হয়ে রয়েছে ।

নোলায় প্রায় সেরটাক জল এসে গেল। জ্বরে ভুগে-ভুগে টক খাবার জন্যে প্রাণ ছটফট করে। ঘচাং ফুঃ-টুঃ সব ভুলে গিয়ে গুটি-গুটি গেলুম কামরাঙা গাছের দিকে। কলকাতায় এ সব কিছুই খেতে পাই না—চোখের সামনে অমন খোলতাই কামরাঙার বাহার দেখলে কার আর মাথা ঠিক থাকে !

যেই গাছতলায় পা দিয়েছি— সঙ্গে-সঙ্গেই—ইঃ ! একতাল গোবরে পা পড়ল—আর তক্ষুনি এক আছাড় । কিন্তু এ কী ! আছাড় খেয়ে আমি তো মাটিতে পড়লুম না । আমি যে মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে পাতালে চলেছি। কিন্তু পাতালেও নয়। আমি একেবারে সোজা কার মস্ত একটা ঘাড়ের ওপর অবতীর্ণ হলুম। আঁই দাদা রে— বলে সে আমাকে নিয়ে একেবারে পপাত।

আমি আর-একবার অজ্ঞান ।

গজেশ্বরের পাল্লায়

অজ্ঞান হয়ে থাকাটা মন্দ নয়—যতক্ষণ কাঠপিঁপড়েতে না কামড়ায়। আর যদি একসঙ্গে একঝাঁক পিঁপড়ে কামড়াতে শুরু করে—তখন ? অজ্ঞান তো দূরের কথা, মরা মানুষ পর্যন্ত তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে । আমিও লাফ মেরে উঠে বসলুম।

কেমন আবছা-আবছা অন্ধকার—গোড়াতে কিছু ভালো বোঝা গেল না । চোখে ধোঁয়া-ধোঁয়া ঠেকছিল । খামকা বাঁ-কানের ওপর কটাৎ করে আর-একটা কাঠপিঁপড়ের কামড় ।

—বাপ রে—বলে আমি কান থেকে পিঁপড়েটা টেনে নামালুম !

আর ঠিক তক্ষণাৎ কটকটে ব্যাঙের মতো আওয়াজ করে কে যেন হেসে উঠল । তারপর, ঘোড়ার নাকের ভেতর থেকে যেমন শব্দ হয় তেমনি করে কে যেন বললে, কাঠপিঁপড়ের কামড় খেয়ে বাপ রে-বাপ রে বলছ, এর পরে যখন ভীমরুলে কামড়াবে, তখন যে মেসোমশাই-মেসোমশাই বলে ডাক ছাড়তে হবে ।

তাকিয়ে দেখি—

ঠিক হাত দুয়েক দূরে একটা মুশকো জোয়ান ভাম-বেড়ালের মতো থাবা পেতে বসে আছে । কথাটা বলে সে আবার কটকটে ব্যাঙের মতো শব্দ করে হাসল।

আমার তখন সব কি-রকম গোলমাল ঠেকছিল। বললুম, আমি কোথায় ?

—আমি কোথায় —লোকটা একরাশ বিচ্ছিরি বড়-বড় দাঁত বের করে আমায় ভেংচে দিলে । তারপর ঝগড়াটে পাঁচার মতো খ্যাঁচখেঁচিয়ে বললে, আহা-হা, ন্যাকা আর কি ! যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না । হঠাৎ ওপর থেকে দুড়ুম করে পাকা তালের মতো আমার পিঠের ওপর এসে নামলে, আর এখন সোনামুখ করে বলছ—আমি কোথায় ? ইয়ার্কির আর জায়গা পাওনি ?

আমার সব মনে পড়ে গেল । সেই পাকা কামরাঙা—গুটি গুটি পায়ে সেদিকে এগোনো, গোবরে পা পিছলে পড়া—তারপরে—

আমি হাউ-মাউ করে বললুম, তবে কি আমি দস্যু ঘচাং ফুং-র আড্ডায় এসে পড়েছি ?

—ঘচাঃ ফুঃ ? সে আবার কী ?—বলেই লোকটা সামলে নিল : হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঠিক বটে । বাবাজী অমনি একটা কী লিখেছিল বটে চিঠিতে ।

—বাবাজী ? কে বাবাজী ?

একটু পরেই টের পাবে। —লোকটা দাঁত খেচিয়ে বললে, চালাকি পেয়েছ ? এত করে চলে যেতে বললুম—ভূতের ভয় দেখানো হল—সারা রাত মশার কামড় খেয়ে ঝোপের মধ্যে বসে মড়ার মাথা-ফাতা ছুড়লুম—অট্টহাসি হেসে-হেসে গলা ব্যথা হয়ে গেল—তবু তোমাদের গেরাহ্যি হয় না? দাঁড়াও এবার। একটাকে ভোগা দিয়ে এনেছি—তুমিও এসে ফাঁদে পড়েছ ; এবার তোমায় শিককাবাব বানিয়ে খাব !

—অ্যাঁ—শিককাবাব !

—ইচ্ছে হলে আলু-কাবলিও বানাতে পারি। কিংবা ফাউল-কাটলেট । চপও করা যায় বোধহয় । কিন্তু লোকটা চিন্তিতভাবে একবার মাথা চুলকাল, কিন্তু তোমাদের কি খাওয়া যাবে? এ পর্যন্ত অনেক ছোকরা আমি দেখেছি, কিন্তু তোমাদের মতো অখাদ্য জীব কখনও দেখিনি।

শুনে আমার কেমন ভরসা হল। মরতেই তো বসেছি—তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।

বললুম, সে-কথা ভালো ! আমাদের খেয়ো না—অন্তত আমাকে তো নয়ই । খেলেও হজম করতে পারবে না। কলেরা হতে পারে, গায়ে চুলকুনি হতে পারে, ডিপথিরিয়া হতে পারে—এমনকি সর্দি-গর্মি হওয়াও আশ্চর্য নয় ।

লোকটা বললে, থামো ছোকরা—বেশি বকবক কোরো না । আপাতত তোমায় নিয়ে যাব ঠাণ্ডী গারদে—তোমার দোস্ত হাবুল সেনের কাছে ! সেইখানেই থাকো এখন । ইতিমধ্যে বাবাজী ফিরে আসুন, তোমার বাকি দুটো দোস্তকেও পাকড়াও করি—তারপর ঠিক করা যাবে তোমাদের দিয়ে মোগলাই পরোটা বানানো হবে—না ডিমের হালুয়া ।

আমি বললুম, দোহাই বাবা, আমাকে খেয়ো না ! খেয়ে কিছু সুখ পাবে না—তা বলে দিচ্ছি। আমি পালাজ্বরে ভুগি আর পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খাই—কিছু রস-কস নেই। আমাদের অঙ্কের মাস্টার গোপীবাবু বলেন, আমি যমের অরুচি। আমাকে খেয়ে বেঘোরে মারা যাবে বাবা ঘচাং ফুঃ—

লোকটা রেগে বললে, আরে দেখে দাও তোমার ঘচাং ফুঃ—ঘচাং ফুঃ-র নিকুচি করেছে । কেন বাপু, রাঁচির গাড়িতে বসে গুরুদেবের রসগোল্লা আর মিহিদানা খাওয়ার সময় মনে ছিল না ? তাঁর যোগসর্পের হাঁড়ি সাবাড় করার সময় বুঝি এ-কথা খেয়াল ছিল না যে আমাদেরও দিন আসতে পারে ? নেহাত মুরি স্টেশনে কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম—নইলে—

আমি ততক্ষণে হাঁ হয়ে গেছি। আমার চোখ দুটো ছানাবড়া নয়—একেবারে ছানার ডালনা !

—অ্যাঁ, তা হলে তুমি—

—চিনেছ এতক্ষণে ? আমি গুরুদেবের অধম শিষ্য গজেশ্বর গাড়ুই।

—অ্যাঁ!

গজেশ্বর মিটমিট করে হেসে বললে, ভেবেছিলে মুরি স্টেশন পার হয়ে গাড়ি চলে গেল, আর তোমরাও পার পেলে । আমরা যে তার পরের গাড়িতেই চলে এসেছি, সেটা তো আর টের পাওনি । এবারে বুঝবে কত ধানে কত চাল হয় ।

ভয়ে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারলুম, পটলডাঙার প্যালারামের এবার বারোটা বেজে গেছে—ওই গজেশ্বর ব্যাটা এবার আমায় নির্ঘাত ‘সামী কাবাব’ বানিয়ে খাবে। নেহাত যখন মরবই, তখন ভয় করে কী হবে ? বরং গজেশ্বরের সঙ্গে একটু ভালো করে আলাপ করি ।

—কিন্তু তোমরা এখানে কেন ? ক্যাবলার মেসোমশাইয়ের বাংলোতে তোমাদের কী দরকার ? এমন করে পাহাড়ের গর্তের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছই বা কী জন্যে ? আর যদি বসেই থাকো—গর্তের মধ্যে একতাল অত্যন্ত বাজে গোবর রেখে দিয়েছ কেন ?

গজেশ্বর বিরক্ত হয়ে বললে, গোবর কি আমরা রেখেছি নাকি ? রেখেছে গোরুতে । তোমাদের মত গোবর-গণেশ তাতে পা দিয়ে সুড়ৎ করে পিছলে পড়বে—সেইজনেই বোধহয় ।

—সে তো হল—কিন্তু আমাদের তাড়াতে চাও কেন ? এ-বাড়িতে তোমাদের কী দরকার ?

—অত কথা দিয়ে তোমার কাজ কী হে চিংড়িমাছ ? এখনও নাক টিপলে দুধ বেরোয়—ও-সব খবরে তোমার কী হবে ?—ব্যাজার মুখে গজেশ্বর একটা হাই তুলল ।

আমাকে চিংড়িমাছ বলায় আমার ভীষণ রাগ হল । ডান কানের ওপর আর একটা কাঠপিঁপড়ে পুটুস করে ইনজেকশন দিচ্ছিল, উঃ করে সেটাকে টেনে ফেলে দিয়ে বললুম, আমাকে চপ-কাপলেট করে খেতে চাও খাও, কিন্তু খবরদার বলছি, চিংড়িমাছ বোলো না !

—কেন বলব না ? চিংড়ির কাটলেট বলব ! গজেশ্বর মিটিমিটি হাসল।

—না, কক্ষনো বলবে না —আমি আরও রেগে গিয়ে বললুম, তা ছাড়া এখন আমার নাক টিপলে দুধ বেরোয় না। আমি দু-দুবার স্কুল-ফাইনাল দিয়েছি।

—ইঃ—স্কুল-ফাইনাল দিয়েছে —গজেশ্বর ট্যাক থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরাল : আচ্ছা বলো তো—ক্যাটাক্লিজম মানে কী ?

—ক্যাটাক্লিজম ? ক্যাটাক্লিজম ? আমি নাক-টাক চুলকে বললুম, বেড়ালের বাচ্চা হবে বোধহয় ?

বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে গজেশ্বর বললে, তোমার মুণ্ডু । আচ্ছা বলো তো—সেনিগেম্বিয়া'র রাজধানী কী ?

বললুম, নিশ্চয় হনোলুলু ? নাকি, ম্যাডাগাস্কার ?

—ভূগোলকে একেবারে গোলগল্পার মতো খেয়ে নিয়েছ দেখছি –গজেশ্বর নাক বেঁকিয়ে বললে, আচ্ছা বলো দেখি, জাড্যাপহ মানে কী ? 'অনিকেত' কাকে বলে ?

—কী বললে—অনিমেষ ? অনিমেষ আমার মামাতো ভাই ।

—হয়েছে, আর বিদ্যে ফলিয়ে কাজ নেই –গজেশ্বর আবার ঝগড়াটে প্যাঁচার মতো খ্যাঁচখেচিয়ে বললে, স্কুল-ফাইনাল কেন—তুমি ছাত্রবৃত্তিও ফেল করবে। নাঃ—সত্যিই দেখছি তুমি একদম অখাদ্য ! বোধহয় শুক্তো করে এক-আধটু খাওয়া যেতে পারে। এখন উঠে পড়ো ।

—কোথায় যেতে হবে ?

—বললুম তো, ঠাণ্ডী গারদে। সেখানে তোমার ফ্রেন্ড হাবলু সেন রয়েছে—তার সঙ্গেও মোলাকাত হবে। ওদিকে আবার গুরুদেব গেছেন দলবল নিয়ে একটুখানি বিষয়-কর্মে, তিনিও ফিরে আসুন—তারপর দেখা যাক—

ইতিমধ্যে আমি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলুম। বিপদে পড়ে পটলডাঙার প্যালারামের মগজও এক-আধটু সাফ হয়ে এসেছে। কোথায় এসে পড়েছি সেটাও একটু ভালো করে জানা দরকার ।

যতটা বোঝা গেল, হাত সাত-আষ্টেক নীচে পাহাড়ের গর্তের মধ্যে পড়েছি। যদি গজেশ্বরের পিঠের ওপর সোজা ধপাস করে না পড়তুম, তা হলে হাত-পা নিঘাত ভেঙে থেতলে যেত। যেখানে বসে আছি, সেটা একটা সুড়ঙ্গের মতো সামনের দিকে চলে গেছে।

কোথায় গেছে—কতটা গেছে বোঝা গেল না। তবে ওরই কোথাও ঠাণ্ডী গারদ আছে—সেইখানেই আপাতত বন্দি রয়েছে হাবুল সেন ।

হাবুলের ব্যবস্থা পরে হবে—কিন্তু আমি কি এখান থেকে পালাতে পারি না ? কোনওমতেই না ?

মাথার ওপর গোল কুয়ার মতো গর্তটা দেখা যাচ্ছে—যেখান দিয়ে আমি ভেতরে পড়েছি। লক্ষ্য করে আরও দেখলুম, গর্তের পাশ দিয়ে পাথরে পাথরে বেশ খাঁজকাটা মতো আছে । একটু চেষ্টা করলেই ঠকাৎ করে ওপরে—

এ-সব ভাবতে বোধহয় মিনিট দুই সময় লেগেছিল। এর মধ্যে বিড়িটা শেষ করেছে গজেশ্বর—মিটমিট করে তাকাচ্ছে আমার দিকে ।

—বলি, মতলবটা কী হে ? পালাবে ? সে-গুড়ে বালি চাঁদ—স্রেফ বালি ! বাঘের হাত থেকে ছাড়ান পেতে পারো, কিন্তু এই গজেশ্বর গাড়ইয়ের হাত থেকে তোমার আর নিস্তার নেই। তার ওপর তুমি আবার আমার গুরুদেবের দাড়ি ছিড়ে দিয়েছ—তোমার কপালে কী যে আছে—একটা যাচ্ছেতাই মুখ করে গজেশ্বর উঠে দাঁড়াল ।

অ্যাঁ ! তা হলে সেই তামাকখেকো ভূতুড়ে দাড়িটা স্বামী ঘুটঘুটানন্দের । স্বামীজীই তবে ঝোপের মধ্যে বসি আড়ি পাতছিলেন, আর আমি কাঠবেড়ালির ল্যাজ মনে করে সেই স্বর্গীয় দাড়ি—

আমি কাতর হয়ে বললুম, আমি কিন্তু ইচ্ছে করে দাড়ি ছিড়িনি । আমি ভেবেছিলুম—

—থাক-থাক ! তুমি কী ভেবেছ তা আমার জেনে আর দরকার নেই। গালের ব্যথায় গুরুদেব দুঘণ্টা ছটফট করেছেন। তিনি ফিরে এলে—যাক সে-কথা, ওঠে এখন—

গজেশ্বর হাতির শুড়ের মতো প্রকাণ্ড একটা হাত বাড়িয়ে আমায় পাকড়াও করতে যাচ্ছিল—হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল বাপ রে গেলুম—আরে বাপ রে গেছি—

ততক্ষণে আমিও দেখেছি, কালো কটকটে একটা কাঁকড়া-বিছে, গজেশ্বরের পায়ের কাছে তখনও দাঁড়া উঁচু করে যমদূতের মতো খাড়া হয়ে আছে। —গেলুম—গেলুম—ওরে বাবা—জ্বলে গেলুম— বলতে বলতে সেই ষাঁড়ের মতো জোয়ানটা মেঝের ওপর কুমড়োর মতো গড়াতে লাগল : গেছি—গেছি—একদম মেরে ফেলেছে—

আর আমি? এমন সুযোগ আর কি পাব? তক্ষুনি লাফিয়ে উঠে পাহাড়ের খাঁজে পা লাগালুম—এইবার এসপার কি ওসপার !

শেঠ চুণ্ডুরাম

ওঠ জোয়ান—হেঁইয়ো !

পাথরের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে দিয়ে যখন গর্তের মুখে উঠে পড়লুম, তখন আমার পালাজ্বরের পিলেটা পেটের মধ্যে কচ্ছপের মতো লাফাচ্ছে। অবশ্য কচ্ছপকে আমি কখনও লাফাতে দেখিনি—সুড়সুড় করে শুড় বের করতে দেখেছি কেবল । কিন্তু কচ্ছপ যদি কখনও লাফায়—আনন্দে হাত-পা তুলে নাচতে থাকে—তা হলে যেমন হয়, আমার পিলেটা তেমন করেই নাচতে লাগল। একেবারে পুরো পাঁচ মিনিট ।

পিলের নাচ-টাচ থামলে কামরাঙা গাছটার ডাল ধরে আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম। কোথাও কেউ নেই—ক্যাবলা আর টেনিদা কোথায় গেছে কে জানে ! ও-ধারে একটা আমড়া গাছে বসে একটা বানর আমাকে ভেংচি কাটছিল—আমিও দাঁত-টাত বের করে সেটাকে খুব খারাপ করে ভেংচে দিলুম। বানরটা রেগে গিয়ে বললে, কিচ–কিচ–কিছু—বোধহয় বললে, তুমি একটা বিচ্ছু !—তারপর টুক করে পাতার আড়ালে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল ।

পায়ের তলায় গর্তটার ভেতর থেকে গজেশ্বর গাড়ুইয়ের গোঙনি শোনা যাচ্ছে। আমার বেশ লাগছিল । আমাকে বলে কিনা কাটলেট করে খাবে ! যাচ্ছেতাই সব ইংরিজি শব্দের মানে করতে বলে আর জানতে চায় হনোলুলুর রাজধানীর নাম কী ! বেশ হয়েছে ! পাহাড়ি কাঁকড়া-বিছের কামড়—পুরো তিনটি দিন সমানে গান গাইতে হবে গজেশ্বরকে !

এইবার আমার চোখ পড়ল সেই কালান্তক গোবরটার দিকে । এখনও তার ভিতর দিয়ে পেছলানোর দাগ —ওই পাষণ্ড গোবরটাই তো আমায় পাতালে নিয়ে গিয়েছিল । ভারি রাগ হল, গোবরকে একটু শিক্ষা দেবার জন্যে ওটাকে আমি সজোরে পদাঘাত করলুম।

এহে-হে—এ কী হল । ভারি ছ্যাঁচড়া গোবর তো ! একেবারে নাকে-মুখে ছিটকে এল যে ! দুৎেত্তার !

কিন্তু এখানে আর থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। গজেশ্বরকে বিশ্বাস নেই—হঠাৎ যদি উঠে পড়ে গর্তের ভেতর থেকে ! সরে পড়া যাক এখান থেকে ! পত্রপাঠ !

যাই কোন দিকে ! ঝণ্টিপাহাড়ি বাংলোর ঠিক পেছন দিকে এসে পড়েছি সেটা বুঝতে পারছি—কিন্তু যাই কোন ধার দিয়ে । কীভাবে যে এসেছিলুম, ওই মোক্ষম আছাড়টা খাওয়ার পর মাথার ভেতর সে-সমস্ত হালুয়ার মতো তালগোল পাকিয়ে গেছে। ডাইনে যাব, না বাঁয়ে ? আমার আবার একটা বদ দোষ আছে। পটলডাঙার বাইরে এলেই আমি পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কিছুই আর চিনতে পারিনে। একবার দেওঘরে গিয়ে আমার পিসতুতো ভাই ফুচুদাকে বলেছিলুম ; দেখো ফুচুদা, কী আশ্চর্য ব্যাপার। উত্তরদিক থেকে কী চমৎকার সূর্য উঠছে —-শুনে ফুচুদা কটাং করে আমার লম্বা কানে একটা মোচড় দিয়ে বলেছিল, স্ট্রেট এখান থেকে রাঁচি চলে যা প্যালা—মানে, রাঁচির পাগলা গারদে !

কোন দিকে যাব ভাবতে ভাবতেই—আমার চোখ একেবারে ছানাবড়া! কিংবা একেবারে চমচম । ওদিকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গুটিমুটি মেরে ও কারা আসছে ? কাঠবেড়ালির ল্যাজের মতো ও কার দাড়ি উড়ছে হাওয়াতে ?

স্বামী ঘুটঘুটানন্দ–নির্ঘাত । তাঁর পেছনে পেছনে আরও দুটো ষণ্ডা জোয়ান—তাদের হাতে দুটো মুখ-বাঁধা সন্দেহজনক হাঁড়ি ! নিঘাত যোগসর্পের হাড়ি–মানে, দই আর রসগোল্লা-ফোল্লা থাকা সম্ভব ! একা একা নিশ্চয় খাবে না, খুব সম্ভব হাবুল সেনও ভাগ পাবে।

আমি পটলডাঙার প্যালারাম—রসগোল্লার ব্যাপারে একটুখানি দুর্বলতা আমার আছে। কিন্তু সেই লোভে আবার আমি গজেশ্বর গাড়ুইয়ের পাল্লায় পড়তে চাই না—উহু—কিছুতেই না ! বেঁচে কেটে পড়ি এখান থেকে!

সুট্ করে আমি বাঁ পাশের ঝোপে ঢুকে গেলুম। দৌড়নো যাবে না—পায়ের আওয়াজ শুনতে পাবে ওরা । ঝোপের মধ্যে আমি সুড়সুড়িয়ে চললুম।

চলেছি তো চলেইছি। কোন দিকে চলেছি জানি না। ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে, নালা-ফালা টপকে, একটা শেয়ালের ঘাড়ের ওপর উলটে পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে, চলেছি আর চলেইছি। আবার যদি দস্যু ঘচাং ফুর পাল্লায় পড়ি—তা হলেই গেছি। গজেশ্বর যে-রকম চটে রয়েছে—আমাকে আবার পেলে আর দেখতে হবে না। সোজা শুক্তোই বানিয়ে ফেলবে !

প্রায় ঘণ্টাখানেক এলোপাথাড়ি হাঁটবার পর দেখি, সামনে একটা ছোট্ট নদী । ঝুরঝুরে মিহি বালির ভেতর দিয়ে তিরতির করে তার নীলচে জল বয়ে চলেছে। চারদিকে ছোট-বড় পাথর । আমার পা প্রায় ভেঙে আসবার জো—তেষ্টায় গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ।

পাথরের ওপর বসে একটুখানি জিরিয়ে নিলুম ! আকাশটা মেঘলা—বেশ ছায়াছায়া জায়গাটা । শরীর যেন জুড়িয়ে গেল ! চারদিকে পলাশের বন—নদীর ওপারে আবার দুটো নীলকণ্ঠ পাখি ।

একটুখানি জলও খেলুম নদী থেকে । যেমন ঠাণ্ডা—তেমনি মিষ্টি জল । খেয়ে একেবারে মেজাজ শরিফ হয়ে গেল। দস্যু ঘচাং ফুঃ, গজেশ্বর, টেনিদা, ক্যাবলা, হাবুল—সব ভুলে গেলুম। মনে এত ফুর্তি হল যে আমার চা-রা-রা-রা-রা—রামা হো—রামা হো—বলে গান গাইতে ইচ্ছে করল ।

কেবল চা-রা-রা-রা-রা—বলে তান ধরেছি—হঠাৎ পেছনে ভোঁপ-ভোঁপ-ভোঁপ ! দুত্তোর—একেবারে রসভঙ্গ ! তার চাইতেও বড় কথা এখানে মোটর এল কোত্থেকে ? এই ঝণ্টিপাহাড়ির জঙ্গলে ?

তাকিয়ে দেখলুম, নদীর ধার দিয়ে একটা রাস্তা আছে বটে। আর-একটু দূরেই সেই রাস্তার ওপর পলাশ-বনের ছায়ায় একখানা নীল রঙের মোটর দাঁড়িয়ে ।

কী সর্বনাশ—এরাও ঘচাং ফুঃ-র দল নয় তো ? ডিটেকটিভ গল্পে এইরকমই তো পড়া যায় ! নিবিড় জঙ্গল —একখানা রহস্যজনক মোটর—তিনটে কালো-মুখোশ পরা লোক, তাদের হাতে পিস্তল—আর ডিটেকটিভ হিমাদ্রি রায়ের চোখ একেবারে মনুমেন্টের চূড়ায় । ভাবতেই আমার পালাজ্বরের পিলেটা ধপাস করে লাফিয়ে উঠল। ফিরে কচ্ছপ-নৃত্য শুরু করে আর-কি !

উঠে একটা রাম-দৌড় লাগাব ভাবছি—এমন সময় আবার ভোঁপ, ভোঁপ ! মোটরটার হর্ন বাজল । তারপরেই গাড়ি থেকে যে নেমে এল, তাকে দেখে আমি থমকে গেলুম। না—কোনও দস্যুর দলে এমন লোক থাকতেই পারে না। কোনও গোয়েন্দা-কাহিনীতে তা লেখেনি।

প্রকাণ্ড থলথলে ভুঁড়ি—দেখলে মনে হয়, ক্রেনে করে তুলতে গেলে ক্রেন ছিড়ে পড়বে। গায়ের সিল্কের পাঞ্জাবিটা তৈরি করতে বোধহয় একথান কাপড় খরচ হয়েছে। প্রকাণ্ড একটা বেলুনের মতো মুখ—নাক-টাকগুলো প্রায় ভেতরে ঢুকে বসে আছে। মাথায় একটা বিরাট হলদে রঙের পাগড়ি । গলা-টলার বালাই নেউ —পেটের ভেতর থেকে মাথাটা প্রায় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে মনে হয়। ঠিক থুতনির তলাতেই একছড়া সোনার হার চিকচিক করছে। দুহাতের দশ আঙুলে দশটা আংটি ।

একখানা মোক্ষম শেঠজী । নাঃ—এ কখনও দস্যু ঘচাং ফুঃ-র লোক নয়। বরং ঘচাং ফুদের নজর সচরাচর যাদের ওপর পড়ে—এ সেই দলের । কিন্তু এ রকম একটি নিটোল শেঠজী খামকা এই জঙ্গলে এসে ঢুকেছে কেন ?

শেঠজী ডাকলেন : খোঁকা—এ খোঁকা— আমাকেই ডাকছেন মনে হল । কারণ, আমি ছাড়া কাছাকাছি আর কোনও খোঁকাকে আমি দেখতে পেলুম না। সাত-পাঁচ ভেবে আমি গুটি-গুটি এগোলুম তাঁর দিকে । ,

—নমস্তে শেঠজী ।

—নমস্তে খোকা । —শেঠজী হাসলেন বলে মনে হল । বেলুনের ভেতর থেকে গোটাকতক দাঁত আর

দুটো মিটমিটে চোখের ঝলক দেখতে পেলুম এবার । শেঠজী বললেন, তুমি কার লেড়কা আছেন ? এখানে কী করতেছেন ?

একবার ভাবলুম, সত্যি কথাটাই বলি। তারপরেই মনে হল কার পেটে যে কী মতলব আছে কিছুই বলা যায় না। এই ঝণ্টিপাহাড়ি জায়গাটা মোটেই সুবিধের নয়। শেঠজীর অত বড় ভুঁড়ির আড়ালেও রহস্যের কোনও খাসমহল লুকিয়ে আছে কি না কে বলবে ।

তাই বোঁ করে বলে দিলুম, আমি হাজারিবাগের ইস্কুলে পড়তেছেন। এখানে পিকনিক করতে এসেছেন ।

—হাঁ ! পিকনিক করতে এসেছেন ?—শেঠজীর চোখ দুটো বেলুনের ভেতর থেকে আবার মিটমিট করে উঠল । এতো দূরে ? তা, দলের আউর সব লেড়কা কোথা আছেন ?

—আছেন ওদিকে কোথাও । —আঙুল দিয়ে আন্দাজি যে-কোনও একটা দিক দেখিয়ে দিলুম। তারপর পাল্টা জিজ্ঞেস করলুম, আপনি কে আছেন, এই জঙ্গলে আপনিই বা কী করতে এসেছেন ?

—হামি ? শেঠজী বললেন, হামি শেঠ ঢুণ্ডুরাম আছি। কলকাতায় হামার দোকান আছেন—রাঁচিমে ভি আছেন। এখানে হামি এসেছেন জঙ্গল ইজারা লিবার জন্যে।

—ও—জঙ্গল—ইজারা লিবার জন্যে ? আমার হঠাৎ কেমন রসিকতা করতে ইচ্ছে হল । কিন্তু জঙ্গলে বেশি ঘোরাফেরা করবেন না শেঠজী—এখানে আবার ভালুকের উৎপাত আছে ।

—অ্যাঁ—ভালুক ! শেঠ ঢুণ্ডুরামের বিরাট ভুঁড়িটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল ভালুক মানুষকে কামড়াচ্ছেন ?

—খুব কামড়েছেন! পেলেই কামড়াচ্ছেন!

—অ্যাঁ ।

আমি শেঠজীকে ভরসা দিয়ে বললুম ; ভুঁড়ি দেখলে আরও জোর কামড়াচ্ছেন । মানে ভালুকেরা ভুঁড়ি কামড়াতে ভালোবাসেন । আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

—অ্যাঁ ! রাম-রাম । শেঠজী হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন । অত বড় শরীর নিয়ে কেউ যে অমন জোরে লাফাতে পারে সেটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হত না ।

তারপর মন-চারেক ওজনের সিন্ধের সেই প্রকাণ্ড বস্তাটা এক দৌড়ে গিয়ে মোটরে উঠল। উঠেই চেঁচিয়ে উঠল : এ ছগনলাল—আরে মোটরিয়া তো হাঁকাও ! জলদি !

ভোঁপ—ভোঁপ ! চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতেই ঢুণ্ডুরামের নীল মোটর জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল ! আর পুরো পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমি পরমানন্দে হাসতে লাগলুম। বেড়ে রসিকতা হয়েছে একটা !

কিন্তু বেশিক্ষণ আমার মুখে হাসি রইল না। হঠাৎ ঠিক আমার পেছনে জঙ্গলের মধ্যে থেকে— -

—হালুম ! ভালুক নয়—ভালুকের বড়দা । অর্থাৎ বাঘ রসিকতার ফল এমন যে হাতে-হাতে ফলে আগে কে জানত ।

—বাপরে, গেছি !—বলে আমিও এক পেল্লায় লাফ ! শেঠজীর চাইতেও জোরে ।

আর লাফ দিয়ে ঝপাং করে একেবারে নদীর কনকনে ঠাণ্ডা জলের মধ্যে । পেছন থেকে সঙ্গে-সঙ্গে আবার জোর আওয়াজ : হাল্লুম !

বাঘা কাণ্ড

বাপস্—কী ঠাণ্ডা জল ! হাড়ে পর্যন্ত কাঁপুনি লেগে গেল! আর স্রোতও তেমনি | পড়েছি হাঁটু জলে—কিন্তু দেখতে দেখতে প্রায় তিরিশ হাত দূরে টেনে নিয়ে গেল ।

কিন্তু জলসই না হলে যে বাঘসই—মানে, বাঘের জলযোগ হতে হবে এক্ষুনি ! আঁকুপাঁকু করে নদী পার হতে গিয়ে একটা পাথরে হোচট খেয়ে জলের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলুম—খানিকটা জল ঢুকল নাক-মুখের মধ্যে । আর তক্ষুনি মনে হল, বাঘটা বুঝি এক্ষুনি পেছন থেকে আমার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে।

আর সেই মুহূর্তেই—

পেছন থেকে বাঘের গর্জন নয়—অট্টহাসি শোনা গেল ।

বাঘ হাসছে ! বাঘ কি কখনও হাসতে পারে ? চিড়িয়াখানায় আমি অনেক বাঘ দেখেছি। তারা হাম-হাম করে খায়, হুম-হুম করে ডাকে—নয় তো, ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোয় । আমি অনেকদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবেছি বাঘের কখনও নাক ডাকে কি না। আর যদি ডাকেই, সেটা কেমন শোনায় । একদিন বাঘের হাঁচি শোনবার জন্যে এক ডিবে নস্যি বাঘের নাকে ছুঁড়ে দেব ভেবেছিলুম—কিন্তু আমার পিসতুতো ভাই ফুচুদা ডিবেটা কেড়ে নিয়ে আমার চাঁদির ওপর কটাৎ করে একটা গাট্টা মারল । কিন্তু বাঘের হাসি যে কোনও-দিন শুনতে পাওয়া যাবে—সে-কথা স্বপ্নেও ভাবিনি ।

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখব ভাবছি, সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা নুড়িতে হোঁচট খেয়ে জলের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়লুম। আবার সেই অট্টহাসি—আর কে যেন বললে —উঠে আয় প্যালা, খুব হয়েছে ! এর পরে নিঘাত ডবল-নিউমোনিয়া হয়ে মারা যাবি ।

এ তো বাঘের গলা নয় ! আর কে ? নিঘাত ক্যাবলা ! পাশে টেনিদাও দাঁড়িয়ে । দুজনে মিলে দন্তবিকাশ করে পরমানন্দে হাসছে—যেন পাশাপাশি একজোড়া শাঁকালুর দোকান খুলে বসেছে।

টেনিদা তার লম্বা নাকটাকে কুঁচকে বললে, পেছন থেকে একটা বাঘের ডাক ডাকলুম আর তাতেই অমন লাফিয়ে জলে পড়ে গেলি ! ছোঃ-ছোঃ—তুই একটা কাপুরুষ !

অ ! দুজনে মিলে বাঘের আওয়াজ করে আমার সঙ্গে বিটকেল রসিকতা হচ্ছিল । কী ছোটলোক দেখছ! মিছিমিছি ভিজিয়ে আমার ভূত করে দিলে—কাঁপুনি ধরিয়ে দিলে সারা গায়ে !

রেগে আগুন হয়ে আমি নদী থেকে উঠে এলুম। বললুম, খামকা এরকম ইয়ার্কির মানে কী?

ক্যাবলা বললে, তোরই বা এ-সব ইয়ার্কির মানে কী ? দিব্যি আমাদের পেছনে শামুকের মতো গুড়ি মেরে আসছিলি—তারপরই একেবারে নো-পাত্তা ! যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলি ! ওদিকে আমরা সারাদিন খুঁজে-খুঁজে হয়রান । শেষে দেখি—এখানে বসে মনের আনন্দে পাগলের মতো হাসা হচ্ছে । তাই তোর খরচায় আমরাও একটু হেসে নিলুম।

আমি বললুম, ইচ্ছে করে আমি হাওয়ায় মিলিয়েছিলুম নাকি ? আমি তো পড়ে গিয়েছিলুম দস্যু ঘচাং ফুঃর গর্তে ।

—দস্যু ঘচাং ফুঃ-র গর্তে ! সে আবার কী ?—ওরা দুজনেই হাঁ করে চেয়ে রইল ।

—কিংবা ঘুটঘুটানন্দেরগর্তেও বলতে পার ।

—স্বামী ঘুটঘুটানন্দ ! ক্যাবলা বারতিনেক খাবি খেল । টেনিদা তেমনি হাঁ করেই রইল—ঠিক একটা দাঁড়কাকের মতো ।

—সেই সঙ্গে আছে গজেশ্বর গাড়ুই। সেই হাতির মতো লোকটা ।

—আর আছে শেঠ ঢুণ্ডুরামের নীল মোটরগাড়ি ।

—অ্যাঁ !

ওরা একদম বোকা হয়ে গেছে দেখে আমার ভারি মজা লাগছিল! ভাবলুম চ্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা করে গানটা আবার আরম্ভ করে দিই—কিন্তু পেটের মধ্যে থেকে গুরগুরিয়ে ঠাণ্ডা উঠছে—এখন গাইতে গেলে গলা দিয়ে কেবল গিটকিরি বেরুবে । বললুম, বাংলোয় আগে ফিরে চল—তারপরে সব বলছি ।

সব শুনে ওরা তো বিশ্বাসই করতে চায় না। স্বামী ঘুটঘুটানন্দই হচ্ছে ঘচাং ফুঃ ! সঙ্গে সেই গজেশ্বর গাড়ই । তারা আবার পাহাড়ের গর্তের মধ্যে থাকে যা-যাঃ ! বাজে গল্প করবার আর জায়গা t

টেনিদা বললে, নিশ্চয় জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে প্যালার পালাজ্বর এসেছিল। আর জ্বরের ঘোরে ওই সমস্ত উটুম-ধুষ্টম খেয়াল দেখেছিল ।

আমি বললুম, বেশ, খেয়ালই সই! কাঁকড়াবিছের কামড়ের জেরটা মিটে যাক না আগে, তারপরে আসবে ওই গজেশ্বর গড়ই। তুমি আমাদের লিডার—তোমাকে ধরে ফাউল কাটলেট বানাবে !

ক্যাবলা বললে, ফাউল মনে হল মুরগি । টেনিদা মুরগি নয়—কারণ টেনিদার পাখা নেই ; তবে পাঁঠা বলা যায় কি না জানিনে। মুশকিল হল, পাঁঠার আবার চারটে পা । আচ্ছা টেনিদা, তোমার হাত দুটোকে কি পা বলা যেতে পারে ?

টেনিদা ক্যাবলাকে চাঁটি মারতে গেল । চাঁটিটা ক্যাবলার মাথায় লাগল না—লাগল চেয়ারের পিঠে । বাপ রে গেছি—বলে টেনিদা নাচতে লাগল খানিকক্ষণ ।

নাচ-টাচ থামলে বললে, তোদের মতো গোটাকয়েক গাড়লকে সঙ্গে আনাই ভুল হয়েছে ! ওদিকে হতচ্ছাড়া হবলাটা যে কোথায় বসে আছে তার পাত্তা নেই। আমি এক কতদূর আর সামলাব !

—আহা-হা—কত সামলাচ্ছ ! ক্যাবলা বললে, তুম কেইসা লিডার—উ মালুম হো গিয়া ! তোমাকে যে কে সামলায় তার ঠিক নেই !

টেনিদা আবার চাটি তুলছিল—চেয়ার থেকে চট করে সটকে গেল ক্যাবলা । আমি রেগে বললুম, তোমরা এই করো বসে-বসে । ওদিকে গজেশ্বর ততক্ষণে হাবলাকে চপ করে ফেলুক !

ক্যাবলা বললে, মাটন চপ । হাবলাটা এক-নম্বরের ভেড়া । কিন্তু আপাতত ওঠা যাক টেনিদা। প্যালা সত্যি বলছে কি না একবার যাচাই করে দেখা যাক । চল প্যালা—কোথায় তোর ঘুটঘুটানন্দের গর্ত একবার দেখি । ওঠো টেনিদা—কুইক ।

টেনিদা নাক চুলকে বললে, দাঁড়া, একবার ভেবে দিকি ।

ক্যাবলা বললে, ভাববার আর কী আছে ? রেডি—কুইক মার্চ। ওয়ান—টু—থ্রি—

টেনিদা কুইনিন-চিবানোর মতো মুখ করে বললে, মানে, আমি ভাবছিলুম—ঠিক এ-ভাবে পাহাড়ের গুহায় ঢোকাটা কি ঠিক হবে ? আমাদের তো দু-এক গাছ লাঠি ছাড়া আর কিছু নেই—ওদের সঙ্গে হয়তো পিস্তল-বন্দুক আছে। তা ছাড়া ওদের দলে হয়তো অনেকগুলো গুণ্ডা—আমরা মোটে তিনজন—ঝাঁটুটাও বাজার করতে গেছে—

ক্যাবলা বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল । —কী আর হবে টেনিদা ? বড়জোর মেরে ফেলবে—এই তো ? কিন্তু কাপুরুষের মতো বেঁচে থাকার চাইতে বীরের মতো মরে যাওয়া অনেক ভালো ! নিজের বন্ধুকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে কতকগুলো গুণ্ডার ভয়ে আমরা পালিয়ে যাব টেনিদা ? পটলডাঙার ছেলে হয়ে ?

বললে বিশ্বাস করবে না-ক্যাবলার জ্বলজ্বলে চোখের দিকে তাকিয়ে আমারও যেন কেমন তেজ এসে গেল ! ঠিক কথা—করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা ! পালাজ্বরে ভুগে-ভুগে এমনভাবে নেংটি ইঁদুরের মতো বেঁচে থাকার কোনও মানেই হয় না । ছ্যা-ছ্যা ! আরে—একবার বই তো দুবার মরব না !

তাকিয়ে দেখি, আমাদের সদর টেনিদাও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই ভিতু মানুষটা নয়—গড়ের মাঠের

গোরা পিটিয়ে যে চ্যাম্পিয়ন—এ সেই লোক ! বাঘের মতো গলায় বললে, ঠিক বলেছিস ক্যাবলা—তুই আজকে আমার আক্কেল-দাঁত গজিয়ে দিয়েছিস । একটা নয়—একজোড়া ! হয় হাবুল সেনকে উদ্ধার করে কলকাতায় ফিরে যাব, নইলে এ পোড়া প্রাণ রাখব না ।

—হ্যাঁ, একেই বলে লিডার । এই তো চাই । তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লুম তিনজনে । ওদের দুটো লাঠি তো ছিলই। আমার সেই ভাঙা ডালটা কোথায় পড়ে গিয়েছিল, অগত্যা একটা কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে সঙ্গে চললুম !

এবার আর জায়গাটা চিনতে ভুল হল না । এই তো সেই কামরাঙা গাছ। এই তো সেই পাষণ্ড গোবরটা, যেটা আমাকে পিছলে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু গর্তটা ? গর্তটা গেল কোথায় ?

গর্তের কোনও চিহ্নই নেই । খালি একরাশ ঝোপঝাড় । ক্যাবলা বললে, কই রে—তোর সে গহ্বর গেল কোথায় ?

–তাই তো !— টেনিদা বললে, আমি তক্ষুনি বলেছিলুম—প্যালা, জ্বরের ঘোরে তুই খোয়াব দেখেছিস । স্বামী ঘুটঘুটানন্দ হল কিনা দস্যু ঘচাং ফুঃ ! পাগল না পাঁজফুলুর ।

আমার মাথা ঘুরতে লাগল। সত্যিই কি জ্বরের ঘোরে আমি খোয়াব দেখেছি। তাহলে এখনও গায়ে টনটনে ব্যথা কেন ? ওই তো গোবরে আমার পা পেছলানোর দাগ । তাহলে ?

ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি ? পাখি ওড়ে,—রসগোল্লা উড়ে যায়, চপ-কাটলেট হাওয়া হয়—মানে পেটের মধ্যে;কিন্তু অত বড় গর্তটা যে কখনও উড়ে যেতে পারে—সে তো কখনও শুনিনি!

টেনিদা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে, তোর গর্ত আমাদের দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে—বুঝলি ? এই বলেই বীরদর্পে ঝোপের ওপর এক পদাঘাত।

আর সঙ্গে সঙ্গেই ঝোপটায় যেন ভূমিকম্প জাগল। তার চাইতেও বেশি ভূমিকম্প জাগল টেনিদার গায়ে । —আরে আরে বলে চেঁচিয়ে উঠেই ঝোপঝাড়-স্বদ্ধ টেনিদা মাটির তলায় অদৃশ্য হল । একেবারে সীতার পাতাল প্রবেশের মতো । তলা থেকে শব্দ উঠল—খচ্ খচ্, ধপাস !

ওগুলো তবে ঝোপ নয় ? গাছের ডাল কেটে গর্তের মুখটা ঢেকে রেখেছিল ? আমি আর ক্যাবলা কিছুক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কী বলব—কী যে করব—কিছুই ভেবে পাচ্ছি না ।

সেই মুহূর্তেই গর্তের ভেতর থেকে টেনিদার চিৎকার শোনা গেল—ক্যাবলা—প্যালা—

আমরা চেঁচিয়ে জবাব দিলুম, খবর কী টেনিদা ? —একটু লেগেছে, কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হয়নি। তোরা শিগগির গর্তের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে ভেতরে নেমে আয় ! ভীষণ ব্যাপার এখানে—লোমহর্ষণ কাণ্ড ।

শুনে আমাদের লোম খাড়া হয়ে গেল । আমার মনে পড়ল করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা ! আমি তক্ষণাৎ গর্তের মুখে পা দিয়ে নামতে আরম্ভ করলুম—ক্যাবলাও আমার পেছনে ।

হাবুল সেনের মৃতদেহ

আমি আর ক্যাবলা টপটপ নীচে নেমে পড়লুম। নেমেই দেখি, কোথাও কিছু নেই। টেনিদা নয়—গজেশ্বর নয়—স্বামী ঘুটঘুটানন্দর ছেড়া দাড়ির টুকরোটুকুও নয়। ব্যাপার কী ! ঘচাং ফুর দল টেনিদাকেও ভ্যানিশ করে দিয়েছে নাকি ? ক্যাবলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, টেনিদা তো এখানেই এক্ষুনি পড়ল রে । গেল কোথায় ?

আমি এতক্ষণে কিন্তু আবছা আবছা আলোয় সাবধানে তাকিয়ে তাকিয়ে সেই কাঁকড়াবিছেটাকে খুঁজছিলুম। সেটা আশেপাশে কোথাও ল্যাজ উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কি না কে জানে ! তার মোক্ষম ছোবল খেয়ে ওই গুণ্ডা গজেশ্বর কোনওমতে সামলেছে—কিন্তু আমাকে কামড়ালে আর দেখতে হচ্ছে না—পটলডাঙার পালাজ্বর-মাক প্যালারামের সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি।

ক্যাবলা আমার মাথায় একষটা থাবড়া মেরে বললে, এই টেনিদা গেল কোথায় ?

—আমি কেমন করে জানব ! ক্যাবলা নাক চুলকে বললে, বড়ী তাজব কী বাত ! হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নাকি ? কিন্তু পটলডাঙার টেনিদা—আমাদের জাঁদরেল লিডার—এত সহজেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার পাত্র ? তৎক্ষণাৎ কোত্থেকে আবার টেনিদার অশরীরী চিৎকার : ক্যাবলা—প্যালা—চলে আয় শিগগির ভীষণ ব্যাপার ।

যাব কোথায় ! কোনখান থেকে ডাকছ ? এ যে সত্যিই ভূতুড়ে ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি। আমার মাথার চুলগুলো সঙ্গে সঙ্গে কড়াং করে দাঁড়িয়ে উঠল।

ক্যাবলা চেঁচিয়ে বললে, টেনিদা, তুমি কোথায় ? তোমার টিকির ডগাও যে দেখা যাচ্ছে না !

আবার কোথা থেকে টেনিদার অশরীরী স্বর : আমি একতলায় ।

—একতলায় মানে ? টেনিদা এবার দাঁত খিচিয়ে বললে, কানা নাকি? সামনের দেওয়ালে গর্ত দেখতে পাচ্ছিসনে ?

আরে—তাই তো ! এদিকের পাথরের দেওয়ালে একটা গর্তই তো বটে ! কাছে এগিয়ে দেখি, তার সঙ্গে একটা মই লাগানো ভেতর থেকে । যাকে বলে, রহস্যের খাসমহল !

টেনিদা বললে, বেয়ে নেমে আয় । এখানে ভয়াবহ কাণ্ড—লোমহর্ষণ ব্যাপার ।

অ্যাঁ ।

ক্যাবলাই আগে মই বেয়ে নেমে গেল—পেছনে আমি । সত্যিই তো—একতলাই বটে। যেখানে নামলুম, সেটা একটা লম্বা হলঘরের মতো—কোত্থেকে আলো আসছে জানি না—কিন্তু বেশ পরিষ্কার । তার একদিকে একটা ইটের উনুন—গোটা-দু'তিন ভাঙা হাঁড়িকুঁড়ি—এক কোনায় একটা ছাইগাদা আর তার মাঝখানে—

টেনিদা হাঁ করে দাঁড়িয়ে । ওধারে হাবুল সেন পড়ে আছে—একেবারে ফ্ল্যাট ।

টেনিদা হাবুলের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, ওই দ্যাখ ।

ক্যাবলা বললে, হাবুল !

আমি বললাম, আমন করে আছে কেন ?

টেনিদার গলা কাঁপতে লাগল ; নিশ্চয় ওকে খুন করে রেখে গেছে!

আমার যে কী হল জানি না। খালি মনে হতে লাগল, ভয়ে একটা কচ্ছপ হয়ে যাচ্ছি ! আমার হাত-পা একটু-একটু করে পেটের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করছে । আমার পিঠের ওপরে যেন শক্ত খোলা তৈরি হচ্ছে একটা । আর একটু পরে গুড়গুড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি একেবারে জলের মধ্যে গিয়ে নামব !

আমি কোনওমতে বলতে পারলাম : ওটা হাবুল সেনের মৃতদেহ !

কথা নেই—বার্তা নেই—টেনিদা হঠাৎ ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেললে ; ওরে হাবলা রে । এ কী হল রে । তুই হঠাৎ খামকা এমন করে বেঘোরে মারা গেলি কেন রে ; ওরে কলকাতায় গিয়ে তোর দিদিমাকে আমি কী বলে বোঝাব রে ; ওরে—কে আর আমাদের এমন করে আলুকাবলি আর ভীমনাগের সন্দেশ খাওয়াবে রে !

ক্যাবলা বললে, আরে জী, রোও মৎ। আগে দাখো—জিন্দা আছে কি মুদা হয়ে গেছে ।

আমারও খুব কান্না পাচ্ছিল । হাবুল প্রায়ই ওর দিদিমার ভাঁড়ার লুঠ করে আমের আচার আর কুলচুর এনে আমায় খাওয়াত ! সেই আমের আচারের কৃতজ্ঞতায় আমার বুকের ভেতরটা হায়-হায় করতে লাগল। আমি কোঁচা দিয়ে নাক-টাক মুছে ফেললুম। আমার আবার কী যে বিচ্ছিরি স্বভাব—কান্না পেলেই কেমন যেন সর্দি-উর্দি হয়ে যায়।

বারতিনেক নাক টেনে আমি বললুম, আলবাত মরে গেছে ! নইলে অমন করে পড়ে থাকবে কেন ?

ক্যাবলাটার সাহস আছে—সে গুটি-গুটি এগিয়ে গিয়ে হাবুলের মৃতদেহের পেটে একটা খোঁচা মারল । আর, কী আশ্চর্য ব্যাপার—অমনি মৃতদেহ উঠে বসল ধড়মড়িয়ে ।

—বাপ রে—ভূত হয়েছে ! বলেই আমি একটা লাফ মারলুম। আর লাফিয়ে উঠতেই টেনিদার খাঁড়ার মতো খাড়া নাকটার একটা ধাক্কা আমার মাথায় । কী শক্ত নাক—মনে হল যেন চাঁদিটা স্রেফ ফুটো হয়ে গেছে—নাক গেল—নাক গেল—বলে টেনিদা একটা পেল্লায় হাঁক ছাড়ল, আর ধপাস করে মেঝেতে বসে পড়লুম আমি ।

খাসা ঘুমাইতে আছিলাম, দিলি ঘুমটার দফা সাইরা !

তখন আমার খটকা লাগল। ভূতেরা তো চন্দ্রবিন্দু দিয়ে কথা বলে—এ তো বেশ ঝরঝরে বাংলা বলে যাচ্ছে । আর, পরিষ্কার ঢাকাই বাংলা !

টেনিদা খ্যাঁচ-খ্যাঁচ করে উঠল : —আহা-হা—কী আমার রাজশয্যে পেয়েছেন রে—যে নবাবি চালে ঘুমোচ্ছেন । ইদিকে তখন থেকে আমরা খুঁজে মরছি—হতচ্ছাড়ার আক্কেলটা দ্যাখো একবার !

হাবুল আয়েশ করে হাই তুলে বলল, একহাঁড়ি রসগোল্লা সাঁইঠ্যা জব্বর ঘুমখানা আসছিল । তা, গজাদা কই ? স্বামীজী কই গেলেন ?

টেনিদা বললে, ইস, বেজায় যে খাতির দেখছি। স্বামীজী—গজাদা ।

হাবুল বললে, খাতির হইব না ক্যান ? কাইল বিকালে আইছি—সেই থিকা সমানে খইত্যাছি । কী আদর-যত্ন করছে—মনে হইল যান ঠিক মামাবাড়ির আইছি । তা, তারা গেল কই ?

ক্যাবলা বললে, তারা গেল কই—সে আমরা কী করে জানব ? তা, তুই কী করে ওদের পাল্লায় পড়লি ? এখানে এলিই বা কী করে ?

—ক্যান আস্তম না ? একটা লোক আইস্যা আমারে কইল, খোকা—এইখানে পাহাড়ের তলায় গুপ্তধন আছে। নিবা তো আইস। বড়লোক হওনের অ্যামন সুযোগটা ছাড়ম ক্যান ? এইখানে চইল্যা আইছি । স্বামীজী—গজাদা—আমারে যে যত্ন করছে—কী কমু !

টেনিদা ভেংচি কেটে বললে, হ, কী আর কবা । এখানে বসে উনি রাজভোগ খাচ্ছেন, আর আমরা চোখে অন্ধকার দেখছি ।

ক্যাবলা বললে, এ-সব কথা এখন থাক । এই গর্তের মধ্যে ওরা ক'জন থাকত রে ?

—জনচারেক হইব ।

—কী করত ?

—কেমনে জানুম ? একটা কলের মতো আছিল—সেইটা দিয়া খুটুর-খুঁটুর কইরা কী যান ছাপাইত । সেই কলড়াও তো দ্যাখতে আছি না। চইয্যা গেল নাকি ? আহা হা, বড় ভালো খাইতে আছিলাম রে —হাবুলের

বুক ভেঙে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরুল একটা ।

—থাক তোর খাওয়া !

—টেনিদা বললে, চল এবার বেরুনো যাক এখান থেকে । আমরা সময়মতো এসে পড়েছিলুম—নইলে খাইয়ে খাইয়েই তোকে মেরে ফেলত !

আমি বললুম, উহু, মোটা করে শেষে কাটলেট ভেজে খেত ।

ক্যাবলা বললে, বাজে কথা বন্ধ কর। হ্যাঁ রে হাবুল—ওরা কী ছাপত রে ?

—ক্যামন কইরা কই ? ছবির মতো কী সব ছাপাইত ।

—ছবির মতো কী সব ! ক্যাবলা নাক চুলকোতে লাগল : পাহাড়ের গর্তের মধ্যে চুপি চুপি । বাংলোতে লোক এলেই তাড়াতে চাইত জঙ্গলের মধ্যে একটা নীল মোটর ! শেঠ ঢুণ্ডুরাম ।

টেনিদা বললে, চুলোয় যাক শেঠ ঢুণ্ডুরাম । হাবুলকে পাওয়া গেছে—আপদ মিটে গেছে। ওটা নয় হাঁড়িভর্তি রসগোল্লা সাবড়েছে—কিন্তু আমাদের পেটে যে ছুঁচোর দল সংকীর্তন গাইছে রে ; চল বেরোই এখান থেকে—

আমি বললুম, আবার ওই মই বেয়ে ?

হাবুল বললে, মই ক্যান ? এইখান দিয়েই তো যাওনের রাস্তা আছে।

—কোন দিকে রাস্তা ?

—ওই তো সামনেই । হাবুলই দেখিয়ে দিলে। হলঘরের মতো সুড়ঙ্গটা পেরুতেই দেখি, বাঃ । একেবারে যে সামনেই পাহাড়ের একটা খোলা মুখ । আর কাছেই সেই নদীটী—সেই শালবন । ক্যাবলা বললে, কী আশ্চর্য, তুই তো ইচ্ছে করলেই পালাতে পারতিস হবলা ।

হাবুল বললে, পালাইতে যামু ক্যান ? অমন আরামের খাওন-দাওন! ভাবছিলাম—দুই-চাইরটা দিন থ্যাইকা স্বাস্থ্যটারে এইটু ভালো কইরা লই।

টেনিদা চেঁচিয়ে বললে, ভালো কইরা ! হতচ্ছাড়া—পেটুকদাস । তোকে যদি গজেশ্বর কাটলেট বানিয়ে খেত, তাহলেই উচিত শিক্ষা হত তোর !

কিন্তু বলতে বলতেই—হঠাৎ মোটরের গর্জন ।

মোটর ! মোটর আবার কোত্থেকে ? আবার কি শেঠ ঢুণ্ডুরাম ?

হাঁ—ঢুণ্ডুরামই বটে। সেই নীল মোটরটা । কিন্তু এদিকে আসছে না। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে ক্রমশ—তারপর পাতার আড়ালে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। যেন আমাদের ভয়েই উৰধৰ্শ্বাসে পালাল ওটা ।

আর আমি স্পষ্ট দেখলুম—সেই মোটরে কার যেন একমুঠো দাড়ি উড়ছে হাওয়ায়। তামাক-খাওয়া লালচে পাকা দাড়ি ।

স্বামী ঘুটঘুটানন্দের দাড়ি ?

চিড়িয়া ভাগল বা

দূরে শেঠ ঢুণ্ডুরামের নীল মোটরটাকে চলে যেতে দেখেই ক্যাবলা বললে, চুকচুক-চ্চু !

টেনিদা জিজ্ঞেস করলে, কী হল রে ক্যাবলা ?

—কী আর হবে ? চিড়িয়া ভাগল বা ।

—চিড়িয়া ভাগল বা মানে ? আমি বললুম, বোধহয় চিড়ে-টিড়ের ভাগ হবে । চিড়ে কোথায় পেলি রে ক্যাবলা ? দে না চাটি খাই ! বড্ড খিদে পেয়েছে।

ক্যাবলা নাক কুঁচকে বললে, বহুৎ হুয়া, আর ওস্তাদি করতে হবে না । চিড়ে নয় রে বেকুব—চিড়ে নয় —চিড়িয়া ভাগল বা মানে হল, পাখি পালিয়েছে।

আমি বললুম, পাখি ? নাঃ—পালায়নি তো ! ওই তো দুটো কাক ওই গাছের ডালে বসে আছে ।

ক্যাবলা বললে, দুৎেত্তার । এই প্যালাটার মগজে খালি বাসক পাতার রস আর শিঙিমাছ ছাড়া আর কিছু নেই। শেঠ ঢুণ্ডুরামের মোটরে করে সব পালাল দেখছিস না ? স্বামী ঘুটঘুটানন্দের দাড়ি দেখতে পাসনি ?

—পালিয়েছে তো হয়েছে কী ? টেনিদা বলল, আপদ গেছে !

হাবুল তখন দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছিল। একহাঁড়ি রসগোল্লার নেশা ওর কাটেনি। হঠাৎ আলোর-খোঁচা-খাওয়া প্যাঁচার মতো চোখ মেলে বললে, আহা-হা, গজাদা চইল্যা গেল ? বড় ভালো লোক আছিল গজাদা !

ক্যাবলা বললে, তুই থাম হাবুল, বেশি বকিসনি। গজাদা ভালো লোক ? ভালো লোকই তো বটে। তাই তো বাংলো থেকে আমাদের তাড়াতে চায়—তাই পাহাড়ের গর্তের মধ্যে বসে কুটুর-কুটুর করে কী সব ছাপে । আর শেঠ ঢুণ্ডুরাম কী মনে করে একটা নীল মোটর নিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঘুরে বেড়ায় ?

—ক্যাবলা পণ্ডিতের মতো মাথা নাড়তে লাগল, হুঁ-হুঁ-হুঁ । আমি বুঝতে পেরেছি।

টেনিদা বললে, খুব যে ডাঁটের মাথায় হুঁ-হুঁ করছিস । কী বুঝেছিস বল তো ?

ক্যাবলা সে কথার জবাব না দিয়ে হঠাৎ চোখ পাকিয়ে আমাদের সকলের দিকে তাকাল । তারপর গলাটা ভীষণ গম্ভীর করে বললে, আমাদের দলে কাপুরুষ কে কে ?

এমন করে বললে যে, আমার পালাজ্বরের পিলেটা একেবারে গুরগুর করে উঠল ।

একবার অঙ্কের পরীক্ষার দিনে পেট-ব্যথা হয়েছে বলে মটকা মেরে পড়েছিলুম। মেজদা তখন ডাক্তারি পড়ে—আমার পেট-ব্যথা শুনে সে একটা আট হাত লম্বা সিরিঞ্জ নিয়ে আমার পেটে ইনজেকশন দিতে এসেছিল, আর তক্ষুনি পেটের ব্যথা উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে পথ পায়নি। ক্যাবলার দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল সেও যেন এইরকম একটা সিরিঞ্জ নিয়ে আমায় তাড়া করছে।

আমি প্রায় বলেই ফেলেছিলুম—একমাত্র আমিই কাপুরুষ, কিন্তু সামলে গেলুম।

টেনিদা বললে, কাপুরুষ কে ? আমরা সবাই বীরপুরুষ ।

—তাহলে চলো—যাওয়া যাক ।

—কোথায় ?

—ওই নীল মোটরটাকে পাকড়াও করতে হবে।

বলে কী, পাগল না পাঁপড়-ভাজা ! মাথা-খারাপ না পেট-খারাপ ! মোটরটা কি ঘুটঘুটানন্দের লম্বা দাড়ি যে হাত বাড়িয়ে পাকড়াও করলেই হল ।

হাবুল সেন বললে, পাকড়াও করবা কেমন কইর‍্যা ? উইর‍্যা যাবা নাকি ?

ক্যাবলা বললে, চল—বড় রাস্তায় যাই । ওখান দিয়ে অনেক লরি যাওয়া-আসা করে, তাদের কিছু পয়সা দিলেই আমাদের তুলে নেবে। -

—আর ততক্ষণ নীল মোটরটা বুঝি দাঁড়িয়ে থাকবে ?

—নীল মোটর আর যাবে কোথায় বড়-জোর রামগড় । আমরা রামগড়ে গেলেই ওদের ধরতে পারব।

—যদি না পাই ? আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

—আবার ফিরে আসব ।

—কিন্তু মিথ্যে এ-সব দৌড়ঝাঁপের মানে কী ?

টেনিদা বললে, খামকা ওদের পিছু-পিছু ধাওয়া করেই বা লাভ কী হবে ? পালিয়েছে, আপদ গেছে। এবার বাংলোয় ফিরে প্রেমসে মুরগির ঠ্যাং চর্বণ করা যাবে। ও-সব বিচ্ছিরি হাসিটাসিও আর শুনতে হবে না রাত্তিরে ।

ক্যাবলা বুক থাবড়ে বললে, কভি নেহি । আমাদের বোকা বানিয়ে ওর চলে যাবে—সারা পটলডাঙার যে বদনাম হবে তাতে । তারপর আর পটলডাঙায় থাকা যাবে না—সোজা গিয়ে আলু-পোস্তায় আস্তানা নিতে হবে । ও-সব চলবে না, দোস্ত । তোমরা সঙ্গে যেতে না চাও, না গেলে । কিন্তু আমি যাবই।

টেনিদা বললে, একা ?

—একা ।

টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, চল—আমরাও তা হলে বেরিয়ে পড়ি ।

আমি শেষবারের মতো চাঁদির ওপরটা চুলকে নিলুম।

—কিন্তু ওদের সঙ্গে যে গজেশ্বর আছে। কাঁকড়াবিছের কামড়ে সেবার একটু জব্দ হয়েছিল বটে, কিন্তু আবার যদি হাতের মুঠোয় পায় তাহলে সকলকে কাটলেট বানিয়ে খাবে। পেয়াজ-চচ্চড়িও করতে পারে। কিংবা পোস্তর বড়া ।

—কিংবা পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল

—ক্যাবলা তিনটে দাঁত বের করে দিয়ে আমাকে যাচ্ছেতাই রকম ভেংচে দিলে : তাহলে তুই একাই থাক এখানে—আমরা চললুম।

পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোলকে অপমান করলে আমার ভীষণ রাগ হয় । পটোল নিয়ে ইয়ার্কি নয়, হুঁ-হুঁ। আমাদের পাড়া হচ্ছে কলকাতার সেরা পাড়া—তার নাম পটলডাঙা । মানুষ মরে গেলে তাকে পটল তোলা বলে । আমার এক মাসতুতো ভাই আছে—তার নাম পটল ; সে একসঙ্গে দেড়শো আলুর চপ আর দুশো বেগুনি খেতে পারে । ছোড়দির একটা পাঁঠা ছিল—সেটার নাম পটল—সে মেজদার একটা শখের শাদা নাগরাকে সাত মিনিট তেরো সেকেন্ডের মধ্যে খেয়ে ফেলেছিল—ঘড়ি ধরে মিলিয়ে দেখেছিলুম আমি । আর, শিঙিমাছের কথা কে না জানে । আর কোন মাছের শিং আছে ? মতান্তরে ওকে সিংহমাছও বলা যায়—মাছেদের রাজ্যে ও হল সিংহ। আর তোরা কী খাস বল । আলু, পোনামাছ। আলু শুনলেই মনে পড়ে আলু প্রত্যয়। সেইসঙ্গে পণ্ডিতমশায়ের বিচ্ছিরি গাঁট্টা। আর পোনা! ছেঃ! লোকে কথায় বলে—ছানাপোনা—পুঁচকে এত্তোটুকু। কোথায় সিংহ, আর কোথায় পোনা ! কোনও তুলনা হয়। রামচন্দ্র ।

আমি যখন এইসব তত্ত্বকথা ভাবছি, আর ভাবতে ভাবতে উত্তেজনায় আমার কান কটকট করছে, তখন হঠাৎ দেখি ওরা দল বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছে আমাকে ফেলেই ।

অগত্যা পটোল আর শিঙিমাছের ভাবনা থামিয়ে আমাকে ওদেরই পিছু-পিছু ছুটতে হল। বড় রাস্তাটা আমাদের বাংলো থেকে মাইল-দেড়েক দূরে। যেতে-যেতে কাঁচা রাস্তায় আমরা মোটরের চাকার দাগ দেখতে পাচ্ছিলুম। এক জায়গায় দেখলুম একটা শালপাতার ঠোঙা পড়ে রয়েছে। নতুন—টাটকা শালপাতার ঠোঙা । কেমন কৌতুহল হল—ওরা দেখতে না পায় এমনিভাবে চট করে তুলে নিয়ে শুকে ফেললুম। ইঃ—নির্ঘাত সিঙাড়া ! এখনও তার খোশবু বেরুচ্ছে ।

কী ছোটলোক ! সবগুলো খেয়ে গেছে ! এক-আধটা রেখে গেলে কী এমন ক্ষেতিটা ছিল!

—এই প্যালা—মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লি ক্যান র‍্যা ?

—টেনিদার হাঁক শোনা গেল ।

এমনিতেই খিদে পেয়েছে—ঘ্রাণে অর্ধভোজন হচ্ছিল, সেটা ওদের সইল না। চটপট ঠোঙাটা ফেলে দিয়ে আবার আমি ওদের পিছু পিছু হাঁটতে লাগলুম। ভারি মন খারাপ হয়ে গেল । ঠোঙাটা আরও একটু শোকবার একটা গভীর বাসনা আমার ছিল । বড় রাস্তায় যখন এসে পড়েছি—তখন, ভোঁক-ভোঁক । একটা লরি । আমি হাত তুলে বলতে যাচ্ছিলুম—রোখকে—রোখকে—কিন্তু ক্যাবলা আমার হাত চেপে ধরলে । বললে, কী যে করিস গাঁড়লের মতো তার ঠিক নেই । ওটা তো রামগড় থেকে আসছে !

—ওরা তো উল্টোদিকেও যেতে পারে ।

—তুই একটা ছাগল ! দেখছিস না কাঁচা রাস্তার ওপর ওদের মোটরের চাকা কীভাবে বাঁক নিয়েছে! অর্থাৎ এরা নির্ঘাত রামগড়ের দিকেই গেছে। উল্টোদিকে হাজারিবাগ—সেদিকে যায়নি।

ইস—ক্যাবলার কী বুদ্ধি ! এই বুদ্ধির জন্যেই ও ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পায়—আর আমার কপালে জোটে লাড্ডু ! তাও অঙ্কের খাতায় । আমার মনে হল, লাড্ডু কিংবা গোল্লা দেবার ব্যবস্থাটা আরও নগদ করা ভালো। খাতায় পেনসিল দিয়ে গোল্লা বসিয়ে কী লাভ হয় ? যে গোল্লা খায় তাকে একভাঁড় রসগোল্লা দিলেই হয় ! কিংবা গোটা-আষ্টেক বড়বাজারের লাড্ডু । কিন্তু তিলের নাড়ু নয়—একবার একটা খেয়ে সাতদিন আমার দাঁত ব্যথা করেছিল ।

পাশে একটা লরি এসে থামল। কাঠ-বোঝাই। ক্যাবলা হাত তুলে সেটাকে থামিয়েছে। লরি-ড্রাইভার গলা বের করে বললে, কী হয়েছে খোকাবাবু ! তুমরা ইখানে কী করছেন ?

—আমাদের একটু রামগড়ে পৌঁছে দিতে হবে ড্রাইভার সাহেব !

—পয়সা দিতে হবে যে ! চার আনা ।

—তাই দেব ।

—তবে উঠে পড়ো। লেকিন কাঠকে উপর বসতে হোবে ।

—ঠিক আছে। কাঠে আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না।

ক্যাবলা আমাদের তাড়া দিয়ে বললে, টেনিদা—ওঠে । হাবলা—আর দেরি করিসনি । তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন প্যালা ? উঠে পড় শিগগির—

ওরা তো উঠল। কিন্তু আমার ওঠা কি অত সহজ ? টেনে-হিঁচড়ে কোনমতে যখন লরির ওপরে উঠে কাঠের আসনে গদিয়ান হলুম—তখন আমার পেটের খানিক নুন-ছাল উঠে গেছে। সারা গা চিড়-চিড় করে জ্বলছে।

আর তক্ষুনি—

ভোঁক-ভোঁক করে আরও গোটা-দুই হাঁক ছেড়ে গাড়ি ছুটল রামগড়ের রাস্তায়। এঃ—কী যাচ্ছেতাই ভাবে নড়ছে যে কাঠগুলো । কখন ধপাস করে উলটে পড়ে যাই—তার ঠিক নেই । আমি সোজা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে দুহাতে মোটা কাঠের গুড়িটা জাপটে ধরলুম।

লরিটা পাই-পই করে ছুটতে লাগল। আমার মনে হতে লাগল, পেল্লায় ঝাঁকুনির চোটে আমার পেটের নাড়িতুড়িগুলো সব একসঙ্গে ক্যাঁ-ক্যাঁ করছে।

মোক্ষম লাড্ডু

কাঠের লরির সে কী দৌড় ! একে তো হইহই করে ছুটছে, তায় ভেতরের কাঠগুলো যেন হাত-পা তুলে নাচতে শুরু করেছে। যদিও মোটা দড়ি দিয়ে কাঠগুলো বেশ শক্ত করে বাঁধা, তবু মনে হচ্ছিল কখন যেন আমাদের নিয়ে ওরা চারদিকে ছিটকে পড়ে যাবে।

জাম-ঝাঁকানো দেখেছ কখনও ? সেই যে দুটো বাটির মধ্যে পুরে ঝকর-ঝকর করে ঝাঁকায়—আর জামের আট-টাটিগুলো সব আলাদা হয়ে যায় ? ঠিক তেমনি করে আমার জ্বরের পিলে-টিলে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছিল । আমার সন্দেহ হতে লাগল, আর কিছুক্ষণ পরে আমি আর পটলডাঙার প্যালারাম থাকব না—একেবারে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকচ্ছপ হয়ে যাব। মানে, সব মিলিয়ে একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে যাব ।

এর মধ্যে—ঝড়াৎ—ঝড়াৎ । নাকের ওপর দিয়ে কে যেন চাবুক হাঁকড়ে দিলে ! একটা গাছের ডাল।

টেনিদা বললে, ইঃ—হতভাগা ক্যাবলার বুদ্ধিতে পড়েই আজ মাঠে মারা যাব !

ক্যাবলা ইস্টুপিডটা এর মধ্যেও রসিকতার চেষ্টা করলে ; মাঠে নয়—রাস্তায় । রামগড়ের রাস্তায় ।

—রাস্তায় । টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, দাঁড়া না একবার, রামগড় পৌঁছে যাই । তারপর—

তারপর বললে—কোঁৎ ।

মানে, ক্যাবলাকে কোৎ করে গিলে খাবে তা বললে না। একটা মোক্ষম ঝাঁকুনি খেয়ে ওটা বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

হাবুল সেন ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল : ইস, কর্ম তো সারছে। প্যাটের মধ্যে গজাদার রসগোল্লা যে ছানা হইয়া গেল ।

আমি বললুম, শুধু ছানা ? এর পরে দুধ হয়ে যাবে।

টেনিদা শুরু করলে ; দুধ ? দুধেও কুলোবে না। একটু পরে পেট ফুড়ে শিং টিং স্বদ্ধ একটা গোরুও বেরিয়ে আসছে—দেখে নিস ।

হাবুল আবার ঘ্যানঘ্যান করে বললে, হঃ—সত্য কইছ। প্যাট ফুইড়া গোরুই বাহির হইব অখনে ।

ক্যাবলা চেঁচিয়ে গান ধরলে, প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে হে নটরাজ !

টেনিদা রেগেমেগে কী একটা বলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় আবার সেই পেল্লায় ঝাঁকুনি । টেনিদা সংক্ষেপে বললে, ঘোঁ-ঘোঁ ঘোৎ!

কিন্তু সব দুঃখেরই শেষ আছে। শেষ পর্যন্ত লরি রামগড়ের বাজারে এসে পৌঁছুল ।

গাড়িটা এখন একটু আস্তে আস্তে যাচ্ছে—আমরা চারজন কোনওমতে কাঠের ওপর উঠে বসেছি । হঠাৎ —

—আরে ভগলু, দেখ ভাইয়া । লরিকা উপর চার লেড়কী বান্দরকা মাফিক বৈঠল বা ।

তিনটে কালো-কালো ছোকরা । আমাদের দেখে দাঁত বের করে হাসছে।

আমি ভীষণ রেগে বললুম, তুমলোগ বান্দর হো ! তুমলোগ বুদ্ধ হো । শুনে একজন অমনি বোঁ করে একটা টিল চালিয়ে দিলে—একটুর জন্যে আমার কানে লাগল না। আমাদের লরির ড্রাইভার চেঁচিয়ে বলল, মারকে টিক্কি উখাড় দেব—হুঁ ।

ছোকরাগুলোর অবশ্য টিকি ছিল না, তবু দাঁত বের করে ভেংচি কাটতে কাটতে কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেল ।

লরিটা আর-একটু এগোতেই ক্যাবলা বললে,—টেনিদা কুইক । ওই যে নীল মোটর ।

তাকিয়ে দেখি, সত্যিই তো ! আমাদের থেকে বেশ খানিকটা আগে একটা মিঠাইয়ের দোকানের সামনে

শেঠ ঢুণ্ডুরামের নীল রঙের মোটরটা দাঁড়িয়ে আছে।

আমার বুকের ভেতর ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল। আবার সেই গজেশ্বর ! সেই ষণ্ডা জোয়ান ভয়ঙ্কর লোকটা ! এর চাইতে লরির ওপরে কচ্ছপরাম হয়ে থাকলেই ভালো হত—অনেক বেশি আরাম পাওয়া যেত ।

কিন্তু ক্যাবলা ছাড়বার পাত্র নয় । টেনে নামাল শেষ পর্যন্ত ।

—শোন প্যালা ! তুই আর হাবলা এই পিপুল গাছটার তলায় বসে থাক। বসে-বসে ওই নীল মোটরটাকে ওয়াচ কর । আমরা ততক্ষণে একটা কাজ সেরে আসি ।

লরিটা ভাড়া বুঝে নিয়ে চলে গিয়েছিল। কাছে থাকলে আমি আবার তড়াক করে ওটার ওপরে উঠে বসতুম—তারপর যেদিকে হোক সরে পড়তুম। কিন্তু এ কী গেরো রে বাপু ! এই পিপুল গাছতলায় বসে ওয়াচ করতে থাকি, আর এর মধ্যে গজেশ্বর এসে ক্যাঁক করে আমার ঘাড় চেপে ধরুক ।

আমি নাক-টাক চুলকে বললুম, আমি তোমাদের সঙ্গেই যাই না । হাবুল এখানে একাই সব ম্যানেজ করতে পারবে ।

ক্যাবলা বললে, বেশি ওস্তাদি করিসনি। যা বললুম তাই কর—বসে থাক ওখানে । গাড়িটার ওপরে বেশ করে লক্ষ রাখিস । আমরা দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরব । এসো টেনিদা—

এই বলে, পাশের একটা রাস্তা দিয়ে ওরা টুক করে যেন কোন দিকে চলে গেল ।

আমি বললুম, হাবলা !

—উঁ?

—দেখলি কাণ্ডটা ? হাবল তখন পিপুল গাছের গোড়ায় বসে পড়েছে। মস্ত একটা হাই তুলে বললে : হঃ সইত্য কইছ ।

—এ-ভাবে বোকার মতো এখানে বসে থাকবার কোনও মানে হয়?

হাবুল আর-একটা হাই তুলে বললে, নাঃ । তার চাইতে ঘুমানো ভালো । আমার কাঁচা ঘুমটা তোরা মাটি কইর‍্যা দিছস—তার উপর লরির ঝাঁকানি –ইস—শরীরটা ম্যাজমাজ করতে আছে।

এই বলেই হাবুল পিপুল গাছটায় ঠেসান দিলে। আর তখুনি চোখ বুজল। বললে বিশ্বাস করবে না—আরও একটু পরে ফরর ফোঁ-ফোঁ করে হাবুলের নাক ডাকতে লাগল ।

কাণ্ডটা দ্যাখো একবার !

আমি ডাকলুম, হাবলা—হবলা—

নাকের ডাক নামিয়ে হাবুল বললে, উঁ ?

–এই দিন-দুপুরে গাছতলায় বসে ঘুমুচ্ছিস কী বলে ?

হাবুল ব্যাজার হয়ে বললে, বেশি চিল্লাচিল্লি করবি না প্যালা—কইয়া দিলাম। শান্তিতে একটু ঘুমাইতে দে। সঙ্গে-সঙ্গেই পরম শান্তিতে সে ঘুমিয়ে পড়ল । আর নাকের ভেতর ঘেথকে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে শব্দ হতে লাগল—যেন ঝাঁক বেঁধে চড়ুই উড়ে যাচ্ছে। -

কী ছোটলোক—কী ভীষণ ছোটলোক। এখন আমি একা বসে ঠায় পাহারা দিই। কী যে রাগ হল বলবার নয় । ইচ্ছে করতে লাগল ওর কানে কটাৎ করে একটা চিমটি দিই। কিন্তু তক্ষুনি দেখলুম, তার চাইতেও ভালো জিনিস আছে। বেশ মোটা-মোটা একদল লাল পিঁপড়ে যাচ্ছে মার্চ করে । ওদের গোটাকয়েক ধরে ক্যাবলার নাকের ওপর ছেড়ে দিলে কেমন হয় ?

একটা শুকনো পাতা কুড়িয়ে লাল পিঁপড়ে ধরতে যাচ্ছি, হঠাৎ—

—আরে খোঁকা—তুমি এহিখানে ?

তাকিয়ে দেখি, শেঠ ঢুণ্ডুরাম ।

ভয়ে আমার পেটের মধ্যে এক ডজন পটোল আর দুডজন শিঙিমাছ একসঙ্গে লাফিয়ে উঠল। আমি একটা মস্ত হাঁ করলুম, শুধু বললুম—আ—আ—আ—

শেঠ ঢুণ্ডুরাম হাসলেন : রামগড়ে বেড়াইতে এসেছ ? তা বেশ, বেশ। কিন্তু এহিখানে গাছের তলায় বসিয়ে কেনো ? লেকিন মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তোমার বহুৎ খিদে পেয়েছে।

খিদে ? বলে কী ? সেই শালপাতার ঠোঙাটা শোকার পর থেকে আমার সমস্ত মেজাজ বিগড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে—আকাশ খাই, পাতাল খাই। এমন অবস্থা হয়েছে যে শেঠ ঢুখুরামের ভুড়িটাতেই হয়ত কড়াৎ করে কামড় বসিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সে কথা কি আর বলা যায় ?

শেঠ ঢুণ্ডুরাম বললেন, আরে খিদে পেয়েছে—তাতে লজ্জা কী ? আইসো হামার সঙ্গে । ওই দোকানে বহুৎ আচ্ছা লাড্ডু মিলে—গরমাগরম সিঙাড়া ভি আছে। খাবে ? হামি খিলাবো—তোমাকে পয়সা দিতে হোবে না।

এই পটলডাঙার প্যালারামকে বাঘ-ভালুক কায়দা করতে পারে না—টেনিদার গাঁট্টা দেখেও সে বুক টান করে দাঁড়িয়ে থাকে, অঙ্কে গোল্লা খেলেও তার মন-মেজাজ বিগড়ে যায় না । কিন্তু খাবারের নাম করেছ কি, এমন দুর্ধর্ষ প্যালারাম একেবারে বিধ্বস্ত ।

আমি আমতা আমতা করে বললুম— লেকিন শেঠজী, গজেশ্বর—

ঢুণ্ডুরাম চোখ কপালে তুলে বললেন, গজেশ্বর ? কোন গজেশ্বর ?

আমি বললুম, সেই যে একটা প্রকাণ্ড জোয়ান—হাতির মতো চেহারা—আপনার গাড়িতে এসেছে—

ঢুণ্ডুরাম বললেন, রাম—রাম—সীতারাম ! আমি কোনও গজেশ্বরকে জানে না । হামার গাড়িতে হামি ছাড়া আর কেউ আসেনি।

—তবে যে স্বামী ঘুটঘুটানন্দের দাড়ি—

ঘুটঘুটানন্দ ? ঢুণ্ডুরাম ভেবে-চিন্তে বললেন, হাঁ—হাঁ একঠো বুড়টা রাস্তায় হামার গাড়িতে উঠেছিল বটে । হামাকে বললে, শেঠজী, রামগড় বাজারে আমি নামবে । হামি তাকে নামাইয়ে দিলম । সে ইস্টেশনের দিকে চলিয়ে গেল ।

এর পরে আর অবিশ্বাসের কী থাকতে পারে ?

ঢুণ্ডুরাম বললে, আইসো খোকা—আইসো। ভালো লাড্ডু আছে—গরম সিঙাড়া ভি আছে—

আর থাকা গেল না । পটলডাঙার প্যালারাম কাত হয়ে গেল । হাবলা তখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে আর ওর নাকের ভেতর থেকে সমানে চড়ুই পাখি উড়ছে। একবার মনে হল ওকে জাগাই—তারপরেই ভাবলুম : না—থাক পড়ে। আমি একাই গুটি-গুটি ঢুণ্ডুরামের সঙ্গে গেলাম ।

মস্ত খাবারের দোকান। থরে-থরে লাড্ডু আর মোতিচুর সাজানো । প্রকাণ্ড কড়াইয়ে গরম সিঙাড়া ভাজা হচ্ছে । গন্ধেই প্রাণ বেরিয়ে যেতে চায় ! শেঠজী বললেন, আইসো খোকা—ভিতরে আইসো । এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি, গজেশ্বর কিংবা ঘুটঘুটানদের টিকির ডগাটিও কোথাও নেই।

ঢুকে তো পড়ি ।

দোকানের ভেতরে একটা ছোট্ট খাবারের ঘর । বসেই শেঠজী ফরমাস করলেন, স্পেশাল এক ডজন লাড্ডু আর ছ-ঠো সিঙাড়া—

আমি বিনয় করে বললুম, আবার অত কেন শেঠজী ?

ঢুণ্ডুরাম বললেন, আরে বাচ্চা খাও না ! বহুৎ বড়িয়া চিজ আছে ।

শালপাতায় করে বড়িয়া চিজ এল। একটা লাড্ডু খেয়ে দেখি—যেন অমৃত । সিঙাড়া তো নয়—যেন কচি

পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল। আর বলতে হল না, আমি কাজে লেগে গেলুম।

গোটা চারেক লাড্ডু আর গোটা দুই সিঙাড়া খেয়েছি—এমন সময় হঠাৎ মাথাটা কেমন ঝিম-ঝিম করে উঠল। তারপর চোখে অন্ধকার দেখলুম। তারপর—

স্পষ্ট শুনলুম—গজেশ্বরের অট্টহাসি !

—পেয়েছি এটাকে । এক নম্বরের বিচ্ছু। আজই এটাকে আমি আলুকাবলি বানিয়ে খাব।

ব্যস—দুনিয়া একেবারে অর্থই অন্ধকার । আমি চেয়ার-টেয়ারসুদ্ধ হুড়মুড় করে মাটিতে উলটে পড়ে গেলুম।

খেল খতম!

চটকা ভাঙতেই মনে হল, এ কোথায় এলুম ?

কোথায় ঝণ্টিপাহাড়ের বাংলো—কোথায় রামগড়—কোথায় কী ? চারিদিকে তাকিয়ে নিজের চোখকেই ভালো করে বিশ্বাস হল না ।

দেখলুম মস্ত একটা পাহাড়ের চূড়ায় বসে আছি। ঠিক চূড়ায় নয়, তা থেকে একটু নীচে । আর চুড়ার মুখে একটা উনুনের মতো–তা থেকে লক-লক করে আগুন বেরুচ্ছে।

ভূগোলের বইয়ে পড়েছি.সিনেমার ছবিতেও দেখেছি। ঠিক চিনতে পারলুম আমি । বলে ফেললুম, এটা নিশ্চয় আগ্নেয়গিরি !

যেই বলা, সঙ্গে সঙ্গে কারা যেন হা-হা করে হেসে উঠল। সে কী হাসি । তার শব্দে পাহাড়টা থর-থর করে কেঁপে উঠল—আর আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে একটা প্রকাণ্ড আগুনের শিখা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল আকাশের দিকে ।

চেয়ে দেখি—একটু দূরে বসে তিনটে লোক হেসে লুটোপুটি । একজন শেঠ ঢুণ্ডুরাম—হাসির তালে-তালে শেঠজীর ভূড়িটা ঢেউয়ের মতো দুলে-দুলে উঠছে। তাঁর পাশেই বসে আছেন স্বামী ঘুটঘুটানন্দ—হাসতে হাসতে নিজের দাড়ি ধরেই টানাটানি করছেন । আর পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দৈত্যের মতো গজেশ্বর আকাশ-জোড়া হাঁ মেলে অট্টহাসি হাসছে।

ওদের তিনজনকে দেখেই আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া ! পেটের পিলেতে একেবারে ভূমিকম্প জেগে উঠল।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, এত হাসছ কেন তোমরা ? হাসির কী হয়েছে ?

শুনে আবার একপ্রস্থ হাসি। আর গজেশ্বর পেটে হাত দিয়ে ধপাস করে বসে পড়ল । শেঠ ঢুণ্ডুরাম বললেন, হোঃ—হোঃ ! আগ্নেয়গিরিই হচ্ছেন বটে । এইটা কোন আগ্নেয়গিরি জানো খোঁকা ?

—কী করে জানব ? এর আগে তো কখনও দেখিনি ! —এইটা হচ্ছেন ভিসুভিয়াস ।

—ভিসুভিয়াস ? —শুনে আমার চোখ কপালে উঠল। ছিলুম রামগড়ে, সেখান থেকে ভিসুভিয়াস যে এত কাছে এ খবর তো আমার জানা ছিল না!

আমি বললুম, ভিসুভিয়াস তো জার্মানিতে ।

না কি, আফ্রিকায় ? শুনে গজেশ্বর চোখ পাকিয়ে এক বিকট ভেংচি কাটল ।

—ফুঁঃ, বিদ্যের নমুনাটা দাখো একবার। এই বুদ্ধি নিয়েই উনি স্কুল-ফাইনাল পাশ করবেন। ভিসুভিয়াস জার্মানিতে—ভিসুভিয়াস আফ্রিকায়। ছোঃ ছোঃ !

আমি নাক চুলকে বললুম তা হলে বোধহয় আমেরিকায় ?

শুনে গজেশ্বর বললে, এঃ, এর মগজে গোবরও নেই—একদম খটখটে খুঁটে । সাধে কি পরীক্ষায় গোল্লা খায়। ভিসুভিয়াস তো ইটালিতে।

—ওহে!—তাও হতে পারে। তা, ইটালি আর আমেরিকা একই কথা।

—একই কথা ? গজেশ্বর বললে, তোমার মুখ আর ঠ্যাং একই কথা? পাঁঠার কালিয়া আর পলতার বড়া একই কথা ?

স্বামী ঘুটঘুটানন্দ বললেন, ওর কথা ছেড়ে দাও । ওর পা-ও যা মুণ্ডুও তাই। সে মুণ্ডুতে কিছু নেই—স্রেফ কচি পটোল আর শিঙিমাছের ঝোল।

শিঙিমাছ আর পটোলের বদনাম করলে আমার ভীষণ রাগ হয়। আমি চটে বললুম, থাকুক যে, তাতে

তোমাদের কী ? কিন্তু কথা হচ্ছে—রামগড় থেকে আমি ইটালিতে চলে এলুম কী করে ? কখনই বা এলুম ? টেনিদা, হাবুল সেন, ক্যাবলা এরাই বা সব গেল কোথায় ? কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না ।

—পাবেও না—গজেশ্বর মিটিমিটি হাসল : তারা সব হজম ।

—হজম ! তার মানে ?

—মানে ? পেটের মধ্যে, খেয়ে ফেলেছি ।

—খেয়ে ফেলেছ! আমার পেটের পিলেটা একেবারে গলা বরাবার হাইজাম্প মারল: সে কী কথা !

আবার তিনজনে মিলে বিকট অট্টহাসি। সে হাসির শব্দে ভিস্থভিয়াসের চূড়ার ওপর লকলকে আগুন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল। আমি দুহাতে কান চেপে ধরলুম।

হাসি থামলে স্বামী ঘুটঘুটানন্দ বললেন, বাপু হে, আমাদের সঙ্গে চালাকি ! পুঁটিমাছ হয়ে লড়াই করতে এসেছ হুলো বেড়ালের সঙ্গে ! পাঁঠা হয়ে ল্যাং মারতে গেছ রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে ! যোগবলে চারটেকে এখানে উড়িয়ে নিয়ে এসেছি । আর তারপরে—

শেঠজী বললেন, হাবুলকে রোস্ট পাকিয়েছি—

স্বামীজী বললেন, ওই ফরফরে ছোকরা ক্যাবলাকে ফ্রাই করেছি—

শেঠজী বললেন, তারপর খেয়ে লিয়েছি।

আমার ঝাঁটার মতো চুল ৰৰক্ষতালুর ওপরে কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠল । বারকয়েক খাবি খেয়ে বললুম, অ্যাঁ ।

স্বামীজী বললেন, এবার তোমার পালা ।

—অ্যাঁ !

—আর অ্যাঁ অ্যা করতে হবে না, টের পাবে এখুনি ।

—স্বামীজী ডাকলেন, গজেশ্বর !

গজেশ্বর হাতজোড় করে বললে, জী মহারাজ !

—কড়াই চাপাও ।

বলতে বলতে দেখি কোত্থেকে একটা কড়াই তুলে ধরেছে গজেশ্বর। সে কী কড়াই ! একটা নৌকোর মত দেখতে । তার ভেতরে শুধু আমি কেন, আমাদের চার মূর্তিকেই একসঙ্গে ঘণ্টবানিয়ে ফেলা যায় ।

—উনুনে কড়াই বসাও, ঘুটঘুটানন্দ আবার হুকুম করলেন। গজেশ্বর তক্ষুনি সোজা গিয়ে উঠল ভিস্থভিয়াসের চূড়ায়। তারপর ঠিক উনুনে যেমনি করে বসায়, তেমনি করেই কড়াইটা আগ্নেয়গিরির মুখের ওপর চাপিয়ে দিলে ।

স্বামীজী বললেন, তেল আছে তো ?

গজেশ্বর বললে, জী মহারাজ ।

—খাঁটি তেল ?

শেঠ ঢুণ্ডুরাম বললেন, হামার নিজের ঘানির তেল আছে মহারাজ। একদম খাঁটি। থোরাসে ভি ভেজাল নেহি ।

স্বামী ঘুটঘুটানন্দ দাড়ি চুমরে বললেন, তবে ঠিক আছে। ভেজাল তেল খেয়ে ঠিক জুত হয় না—কেমন যেন অম্বল হয়ে যায় ।

আমি আর থাকতে পারলুম না । হাউমাউ করে বললুম, খাঁটি তেল দিয়ে কী হবে ?

—তোমাকে ভাজব। গজেশ্বর গাড়ুইয়ের জবাব এল ।

স্বামীজী বললেন, তারপর গরম গরম মুড়ি দিয়ে—

পটলডাঙার প্যালারাম তাহলে গেল। চিরকালের মতোই বারোটা বেজে গেল তার ! শেয়ালদার বাজারে আর কেউ তার জন্যে কচি পটোল কিনবে না—শিঙিমাছও না । এই তিন-তিনটে রাক্ষসের পেটে গিয়ে সে বিলকুল বেমালুম হজম হয়ে যাবে।

তখন হঠাৎ আমার মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল । কেমন স্বর্গীয় স্বর্গীয় মনের ভাব এসে দেখা দিলে। ব্যাপারটা কী রকম জানো ? মনে করো, তুমি অঙ্কের পরীক্ষা দিতে বসেছ । দেখলে, একটা অঙ্কও তোমার দ্বারা হবে না—মানে তোমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। তখন প্রথমটায় খানিক দরদরিয়ে ঘাম বেরুল, মাথাটা গরম হয়ে গেল, কানের ভেতর ঝিঁঝি পোকা ডাকতে লাগল আর নাকের ওপরে যেন ফড়িং এসে ফড়াৎ ফড়াৎ করে উড়তে লাগল ! তারপর আস্তে আস্তে প্রাণে একটা গভীর শান্তির ভাব এসে গেল। বেশ মন দিয়ে তুমি খাতায় একটা নারকোল গাছ আঁকতে শুরু করে দিলে । তার পেছনে পাহাড়—তার ওপর চাঁদ—অনেকগুলো পাখি উড়ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি । মানে সব আশা ছেড়ে দিয়ে তুমি তখন আর্টিস্ট হয়ে উঠলে।

এখানেও যখন দেখছি প্রাণের আশা আর নেই—তখন আমার ভারি গান পেল । মনে হল, আঁশ মিটিয়ে একবার গান গেয়ে নিই। বাড়িতে কখনও গাইতে পাইনে—মেজদা তার মোটা-মোটা ডাক্তারি বই নিয়ে তাড়া করে আসে। চাটুজ্যেদের রোয়াকে বসে দু'চারদিন গাইতে চেয়েছি—টেনিদা আমার চাঁদিতে চাটি বসিয়ে তক্ষুনি থামিয়ে দিয়েছে। এখানে একবার শেষ গান গেয়ে নেব । এর আগে কখনও গাইতে পাইনি—এর পরেও তো আর কখনও সুযোগ পাব না।

বললুম, প্রভু, স্বামীজী !

স্বামীজী বললেন, কী চাই বলো ? কী হলে তুমি খুশি হও ; তোমায় বেসম দিয়ে ভাজব—না এমনি নুন-হলুদ মাখিয়ে ?

আমি বললুম, যেভাবে খুশি ভাজুন—আমার কোনও আপত্তি নেই। কেবল একটা নিবেদন আছে। একটুখানি গান গাইতে চাই। মরবার আগে শেষ গান ।

গজেশ্বর গাঁ-গাঁ করে বললে, সেটা মন্দ হবে না প্রভু। খাওয়া-দাওয়ার আগে এক-আধটু গান-বাজনা হলে মন্দ হয় না। আফ্রিকার লোকেও মানুষ পুড়িয়ে খাওয়ার আগে বেশ নেচে নেয়। লাগাও হে ছোকরা—

শেঠ ঢুণ্ডুরাম বললেন, হাঁ হাঁ—প্রেমসে একঠো আচ্ছা গানা লগা দেও—

আমি চোখ বুজে গান ধরে দিলুম :

'একদা এক নেকড়ে বাঘের গলায়
মস্ত একটি হাড় ফুটিল—
বাঘ বিস্তর চেষ্টা করিল—
হাড়টি বাহির না হইল।"

শেঠজী বিরক্ত হয়ে বললেন, ই কী হচ্ছেন ? ই তো কথামালার গল্প আছেন। স্বামীজী বললেন, না হে—এতেও বেশ ভাব আছে । আহা-হা—কী সুর, কী প্যাঁচামাক গলার আওয়াজ । গেয়ে যাও ছোকরা, গেয়ে যাও ! আমি তেমনি চোখ বুজেই গেয়ে চললুম :

'তখন গলার ব্যথায় নেকড়ে বাঘের
চোখ ফাটিয়ে জল আসিল,
ভ্যাঁও-ভ্যাঁও রবে কাঁদিতে-কাঁদিতে
সে এক সারসের কাছে গেল—"

এই পর্যন্ত গেয়েছি—হঠাৎ ঝুমুর-ঝুমুর করে ঘুঙুরের শব্দ কানে এল । মনে হল কেউ যেন নাচছে। চোখ মেলে যেই তাকিয়েছি—দেখি–

গজেশ্বর নাচছে ।

হাঁ—গজেশ্বর ছাড়া আর কে ? এর মধ্যে কখন একটা ঘাগরা পরেছে—নাকে একটা নথ লাগিয়েছে, পায়ে ঘুঙুর বেঁধেছে আর ঘুরে ঘুরে ময়ূরের মতো নাচছে। সে কী নাচ । রামায়ণের তাড়কা রাক্ষসী কখনও ঘাগরা পরে নেচেছিল কি না জানি না, কিন্তু যদি নাচত তাহলেও যে সে গজেশ্বরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না, এ আমি হলফ করে বলতে পারি! আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে গজেশ্বর মিটমিট করে হাসল।

—বলি, কী দেখছ ? অ্যাঁ--অমন করে দেখছ কী ? এ-সব নাচ নাচতে পারে তোমাদের উদয়শঙ্কর ? ছোঃ-ছোঃ ! এই যে নাচছি—এর নাম হচ্ছে আদত কথাকলি ।

স্বামীজী বললেন, মণিপুরীও বলা যায়।

শেঠজী বললেন, হাঁ—হাঁ কত্থক ভি বলা যেতে পারে।

আমি বললুম, তাড়কা-নৃত্যও বলা যায়।

গজেশ্বর বললেন, কী বললে ?

আমি তক্ষুনি সামলে নিয়ে বললুম, না না, বিশেষ কিছু বলিনি।

—তোমাকে বলতেও হবে না । —ঘাগরা ঘুরিয়ে আর-এক পাক নেচে গজেশ্বর বললে, কই, গান বন্ধ হল যে ? ধরো—গান ধরো। প্রাণ খুলে একবার নেচে নিই।

কিন্তু গান গাইব কী ! গজেশ্বরের নাচ দেখে আমার গান-টান তখন গলার ভেতরে হালুয়ার মতো তাল পাকিয়ে গেছে।

গজেশ্বর বললে, ছোঃ-ছোঃ—এই তোমার মুরোদ । তুমি ঘোড়ার ডিমের গান জানো । শোনো—আমি নেচে নেচে একখানা ক্ল্যাসিক্যাল গান শোনাচ্ছি তোমায় ।

এই বলে গজেশ্বর গান জুড়ে দিলে :

‘এবার কালী তোমায় খাব—
হুঁ-হুঁ—তোমায় খাব তোমায় খাব—
তোমার মুণ্ডুমালা কেড়ে নিয়ে—ই—হুঁ—
মুড়িঘণ্টরেঁধে খাব—

আর সেই সঙ্গে আবার সেই নাচ। সে কী নাচ । মনে হল, গোটা ভিসুভিয়াস পাহাড়টাই গজেশ্বরের সঙ্গে ধেই-ধেই করে নাচছে ! স্বামীজী তালে-তালে চোখ বুজে মাথা নাড়তে লাগলেন, শেঠজী বললেন, উ-হু-হু ! কেইসা বঢ়িয়া নাচ । দিল একেবারে তর হোয়ে গেলো । ওদের তো দিল তর হচ্ছে—নাচে গানে একেবারে মশগুল । ঠিক সেই সময় আমার পালাজ্বরের পিলের ভেতর থেকে কে যেন বললে, পটলডাঙার প্যালারাম, এই তোমার সুযোগ। লাস্ট চান্স! যদি পালাতে চাও, তা হলে —

ঠিক।

এসপার কি ওসপার । শেষ চেষ্টাই করি একবার । আমি উঠে পড়লুম। তারপরেই ছুট লাগালুম প্রাণপণে । কিন্তু ভিসুভিয়াস পাহাড়ের ওপর থেকে দৌড়ে পালানো কি এতই সোজা কাজ । তিন পা এগিয়ে যেতে-না-যেতেই পাথরের নুড়িতে হোঁচট খেয়ে উলটে পড়লুম ধপাস করে।

আর তক্ষুনি—

তক্ষুনি নাচ থেমে গেল গজেশ্বরের। আর পাহাড়ের মাথা থেকে হাত-কুড়ির মতো লম্বা হয়ে এগিয়ে এল গজেশ্বরের হাতটা । বললে, চালাকি ! আমি নাচছি আর সেই ফাঁকে সরে পড়বার বুদ্ধি। বোঝ এইবার—বলেই, মস্ত একটা হাতির শুড়ের মতো হাত আমার গলাটাকে পাকড়ে ধরল, আর শূন্যে ঝুলোতে ঝুলোতে—

জয় গুরু ঘুটঘুটানন্দ । বলে আকাশ-ফাটানো একটা হুঙ্কার ছাড়ল । তারপরেই ছ্যাঁক—ঝপাস্ —সেই প্রকাণ্ড কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলের মধ্যে—

ফুটন্ত তেলের মধ্যে নয়—একরাশ ঠাণ্ডা জলের ভেতর । আমি আকুপাঁকু করে উঠে বসলাম । তখনও ভালো করে কিছু বুঝতে পারছি না। চোখের সামনে ধোঁয়া-ধোঁয়া হয়ে ভাসছে ভিসুভিয়াস, গজেশ্বরের ঘাগরা পরে সেই উদ্দাম নৃত্য, সেই বিরাট কড়াই—সেই ফুটন্ত তেলের রাশ ।

—সিদ্ধি-ফিদ্ধি কিছু খাইয়েছিল—ভরাট গম্ভীর গলায় কে বলল ।

তাকিয়ে দেখি, একজন পুলিশের দারোগা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিচ্ছে। সঙ্গে পাঁচ-সাতজন পুলিশ, আর কোমরে দড়ি বাঁধা—স্বামী ঘুটঘুটানন্দ, শেঠ ঢুণ্ডুরাম আর মহাপ্রভু গজেশ্বর!

টেনিদা আমার মাথায় জল ঢালছে, হাবুল হাওয়া করছে। আর ক্যাবলা বলছে, উঠে পড় প্যালা, উঠে পড়। থানায় গিয়ে খবর দিয়েছিলুম, পুলিশ এসে ওদের দলবলসুদ্ধু পাকড়াও করেছে। ঝণ্টিপাহাড়ির বাংলোর নীচে বসে এরা নোট জাল করত । স্বামীজী এদের লিডার। শেঠজী নোটগুলো পাচার করত। সব ধরা পড়েছে এদের । জাল নোট ছাপার কল সব। এদের মোটরের মধ্যেই সমস্ত কিছু পাওয়া গেছে। বুঝলি রে বোকারাম, ঝণ্টিপাহাড়ির বাংলোয় আর ভূতের ভয় রইল না এর পর থেকে।

দারোগা হেসে বললেন, শাবাশ ছোকরার দল, তোমরা বাহাদুর বটে। খুব ভালো কাজ করেছ। এই দলটাকে আমরা অনেকদিন ধরেই পাকড়াবার চেষ্টা করছিলুম, কিছুতেই হদিস মিলছিল না । তোমাদের জন্যেই আজ এরা ধরা পড়ল । সরকার থেকে এ-জন্যে মোটা টাকা পুরস্কার পাবে তোমরা।

এর পরে আর কি বসে থাকা চলে ? বসে থাকা চলে এক মুহূর্তও? আমি পটলডাঙার প্যালারাম তক্ষুনি লাফিয়ে উঠলুম। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বললুম ; পটলডাঙা—

টেনিদা, হাবুল সেন আর ক্যাবলা সমস্বরে সাড়া দিলে : জিন্দাবাদ।

সমাপ্ত

চার মূর্তির অভিযান

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

০১.বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘটনা

বললে বিশ্বাস করবে?

আমরা চার মূর্তি— পটলডাঙার সেই চারজন—টেনিদা, হাবুল সেন, ক্যাবলা আর আমি—স্বয়ং শ্রীপ্যালারাম, চারজনেই এবার স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে ফেলেছি। টেনিদা আর আমি থার্ড ডিভিশন, হাবুল সেকেণ্ড ডিভিশন—আর হতচ্ছাড়া ক্যাবলাটা শুধু যে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে তা-ই নয়, আবার একটা স্টার পেয়ে বসে আছে। শুনছি ক্যাবলা নাকি স্কলারশিপও পাবে। ওর কথা বাদ দাও-ওটা চিরকাল বিশ্বাসঘাতক।

কলেজে ভর্তি হয়ে খুব ডাঁটের মাথায় চলাফেরা করছি আজকাল। কথায় কথায় বলি, আমরা কলেজ স্টুডেন্ট! আমাদের সঙ্গে চালাকি চলবে না— হুঁ হুঁ!

সেদিন কেবল ছোট বোন আধুলিকে কায়দা করে বলেছি, কী যে ক্লাস নাইনে পড়িস—ছ্যা-ছ্যা! জানিস লজিক কাকে বলে?

অমনি আধুলি ফ্যাঁচ করে বললে, যাও যাও ছোড়া—বেশি ওস্তাদি কোরো না। ভারি তো তিনবারের বার থার্ড ডিভিশনে পাশ করে—

আস্পর্ধা দ্যাখো একবার। যেই আধুলির বিনুনি ধরে একটা টান দিয়েছি, অমনি চ্যাঁ-ভ্যাঁ বলে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একাকার। ঘরে বড়দা দাড়ি কামাচ্ছিল, ক্ষুর হাতে বেরিয়ে এসে বললে, ইস্টুপিড গাধা! যেমন ছাগলের মতো লম্বা লম্বা কান, তেমনি বুদ্ধি! ফের যদি বাঁদরামো করবি—দেব এই ক্ষুর দিয়ে কান দুটো কেটে!

দেখলে? ইস্টুপিড তো বললেই—সেই সঙ্গে গাধা-ছাগল বাঁদর তিনটে জন্তুর নাম একসঙ্গে করে দিলে। আমি যে কলেজে পড়ছি—এখন আমার রীতিমতো একটা প্রেসটিজ হয়েছে সেটা গ্রাহ্যিই করলে না। আমার ভীষণ রাগ হল। মা বারান্দায় আমসত্ত্ব রোদে দিয়েছিল, এদিক-ওদিক তাকিয়ে তা থেকে খানিকটা ছিড়ে নিয়ে মনের দুঃখ বাইরে চলে এলুম।

আমাদের বাড়ির সামনে একটুখানি পাঁচিল-ঘেরা জায়গা। সেখানে বড়দার সিল্কের পাঞ্জাবি শুকুচ্ছে—নিজের হাতে কেচেছে বড়দা। আর একপাশে বাঁধা রয়েছে ছোড়দির আদরের ছাগল গঙ্গারাম। বেশ দাড়ি হয়েছে গঙ্গারামের। একমনে আমসত্ত্ব খেতে খেতে ভাবছি, এবার সরস্বতী পুজোয় থিয়েটারের সময় গঙ্গারামের দাড়িটা কেটে নিয়ে মোগল সেনাপতি সাজব—এমন সময় দেখি গঙ্গারাম গলার দড়ি খুলে ফেলেছে।

ছাগলের খালি দাড়ি হয় অথচ কান পর্যন্ত গোঁফ হয় না কেন, এই কথাটা খুব দরদ দিয়ে ভাবছিলুম। ঠিক তক্ষুনি চোখে পড়ল—গঙ্গারাম এগিয়ে এসে বড়দার সিল্কের পাঞ্জাবিতে মুখ দিয়েছে। চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও সামলে নিলুম। একটু আগেই বড়দা আমাকে গাধা-ছাগল এইসব বলেছে। খেয়ে নিক সিল্কের পাঞ্জাবি—বেশ জব্দ হয়ে যাবে।

দেখলুম, কুর-কুর করে দিব্যি খিয়ে নিচ্ছে গঙ্গারাম। দাড়িটা অল্প অল্প নড়ছে—চোখ বুজে এসেছে আরামে, কান দুটো লটর-পটর করছে। সিল্কের পাঞ্জাবি খেতে রে বেশ ভালোই লাগে দেখা যাচ্ছে। আমসত্ত্ব চিবোনো ভুলে গিয়ে আমি নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ করতে লাগলুম।

ইঞ্চি-দুয়েক খেয়েছে—এমন সময় গেটটা খুলে গেল। গলায় স্টেথিসকোপ ঝুলিয়ে হাসপাতালে নাইট ডিউটি সেরে ফিরছে মেজদা। সবে ডাক্তারি পাশ করেছে মেজদা আর কী মেজাজ! আমাকে দেখলেই ইনজেকশন দিতে চায়।

ঢুকেই মেজদা চেঁচিয়ে উঠল, কী সর্বনাশ! ছাগল যে বড়দার জামাটা খেয়ে ফেললে! এই প্যালা—

ইডিয়ট-হতভাগা বসে বসে মজা দেখছিস নাকি?

বুঝলুম, গতিক সুবিধের নয়! এবার বড়দা এসে সত্যিই আমার কান কেটে নেবে। কান বাঁচাতে হলে আমারই কেটে পড়া দরকার। ঘাড়-টাড় চুলকে বললুম, লজিক পড়ছিলুম—মানে দেখতে পাইনি—মানে আমি ভেবেছিলুম—বলতে বলতে মেজদার পাশ কাটিয়ে এক লাফে সোজা সদর রাস্তায়।

আমাদের সিটি কলেজ খুব ভাল খালি ছুটি দেয়। আজও চড়কষষ্ঠী না কোদালে অমাবস্যা কিসের একটা বন্ধ ছিল। আমি সোজা চলে এলুম চাটুজ্যেদের রোয়াকে। দেখি, টেনিদা হাত-পা নেড়ে কী যেন সব বোঝাচ্ছে ক্যাবলা আর হাবুল সেনকে।

-সামনেই ক্রিসমাস! ব্যস—বাঁই বাঁই করে প্লেনে চেপে চলে যাব! কুট্টিমামা তোদেরও নিয়ে যেতে বলেছে। যাবি তো চল—দিনকতক বেশ খেয়ে-দেয়ে ফিরে আসা যাবে।

ক্যাবলা বললেন, কিন্তু প্লেনের ভাড়া দেবে কে?

-আরে মোটে কুড়ি টাকা। ড্যাম চিপ।

আমি বললুম, কোথায় যাবে প্লেনে চেপে? গোবরডাঙা?

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, খেলে কচুপোড়া! এটার মাথাভর্তি কেবল গোবর—তাই জানে গোবরডাঙা আর ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দুপুর! ডুয়ার্সে যাচ্ছি—ডুয়ার্সে। এন্তার হরিণ, দেদার বন-মুরগি, ঘুঘু, হরিয়াল বলতে বলতেই আমার হাতের দিকে চোখ পড়ল কী খাচ্ছিস র‍্যা?

লুকোতে যাচ্ছিলুম, তার আগেই খপ করে আমসত্ত্বটা কেড়ে নিলে। একেবারে সবটা মুখে পুরে দিয়ে বললে, বেড়ে মিষ্টি তো! আর আছে?

ব্যাজার হয়ে বললুম, না—আর নেই। কিন্তু ডুয়ার্সের জঙ্গলে যে যেতে চাইছ, শেষে বাঘের খপ্পরে নিয়ে ফেলবে না তো?

বাঘ মারতেই তো যাচ্ছি।—আমসত্ত্ব চিবুতে চিবুতে টেনিদা একটু উঁচুদরের হাসি হাসল—যাকে বাংলায় বলে 'হাইক্লাস'!

—অ্যাঁ! —আমি ধপাৎ করে বোয়াকের ওপর বসে পড়লুম। বাঘ! না—না—বাঘটাগের মধ্যে আমি নেই!

হাবুল বললে, হ, সত্য কইছস! এদিকে দন্তশূলে মরতে আছি—বাঘের হাতে পইড়া পরান যাইব গিয়া।

ক্যাবলা বললে, ভালোই তো! দাঁতের ব্যাথার কষ্ট পাচ্ছিস যদি মারা যাস দেখবি একটুও আর দাঁতের ব্যথা নেই।

টেনিদা আমসত্ত্ব শেষ করে বললে, থাম—ইয়ার্কি করিসনি। আরে ডুয়ার্সের বাঘ-ভাল্লুক সবাই আমার কুট্টিমামাকে খাতির করে চলে। কুট্টিমামা ভাল্লুকের নাক পুড়িয়ে দিয়েছেবাঘের বত্রিশটা দাঁত কালীসিঙির মহাভারতের এক ঘায়ে উড়িয়ে দিয়েছে। শেষে সেই বাঘ কুট্টিমামার বাঁধানো দাঁত নিয়ে খেয়ে বাঁচে। সে বাঘটা আজকাল আর মাংস-টাংস খায় না—স্রেফ নিরিমিষি। লোকের বাগান থেকে লাউ-কুমড়ো চুরি করে খায়—সেদিন আবার টুক করে কুট্টিমামার একডিশ আলুর দম খেয়ে গেছে।

ক্যাবলা বললে, গুল!

টেনিদা চোখ পাকিয়ে বললে, কী বললি?

ক্যাবলা বললে, না—মানে, বলছিলুম—গুল বাঘ আর ডোরাদার বাঘ—দু'রকমের বাঘ হয়।

হাবুল বললে, আর-এক রকমের বাঘও হয়। বিছানায় থাকে আর কুটুস কইর‍্যা কামড়ে দেয়। তারে বাগ কয়।

আমিও ভেবে-চিন্তে বললুম, আর তাকে কিছুতেই বাগানো যায় না। কামড়েই সে হাওয়া হয়ে যায়।

টেনিদা রেগেমেগে বললে, দুত্তের—খালি বাজে কথা! এদের কাছে কিছু বলতে যাওয়াই ঝকমারি! এই তিনটের নাকে তিনখানা মুগ্ধবোধ বসিয়ে নাকভাঙা বুদ্ধদেব বানিয়ে দিলে তবে ঠিক হয়। ফাজলামি নয়—সোজা জবাব দে—যাবি কি যাবি না? না যাস একাই যাচ্ছি প্লেনে চেপে তোরা এখানে ভ্যারেণ্ডা ভাজ বসে বসে।

আমি বললুম, বাঘে কামড়াবে না?

—বললুম তো সে আজকাল ভেজিটেবিল খায়। আলুর দম আর মুলো হেঁচকি খেতে দারুণ ভালবাসে।

ক্যাবলা জিজ্ঞেস করলে, তার আত্মীয়স্বজন?

—তারা কুট্টিমামাকে দেখলেই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়বে। তখন আর শিকার করবারও দরকার নেই—স্রেফ গলায় দড়ি বেঁধে বাড়িতে নিয়ে এলেই হল।

আমি ভারি খুশি হয়ে বললুম, তা হলে তো যেতেই হয়! আমরা সবাই একটা করে বাঘ সঙ্গে করে বেঁধে আনব।

হাবুল বললে, সেই বাঘে দুধ দিব।

ক্যাবলা বললে, আর সেই বাঘের দুধ বিক্রি করে আমরা বড়লোক হব।

টেনিদা চেঁচিয়ে উঠে বললে—ডি-লা-এ্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস—

আমরা সবাই আরও জোরে চিৎকার করে বললুম ইয়াক-ইয়াক!

বাবা অফিস যাওয়ার সময় বলে গেলেন, সাতদিনের মধ্যে ফিরে আসবি—একদিনও যেন কলেজ কামাই না হয়।

কোর্টে বেরুতে বেরুতে বড়দা মনে করিয়ে দিলে, দু-একখানা পড়ার বইও সঙ্গে নিয়ে যাস—খালি ইয়ার্কি দিয়ে বেড়াসনি।

ছুটির ভিতরে পড়ার বই নিয়ে বসতে বয়ে গেছে আমার। আমি স্যুটকেসের ভেতর হেমেন রায় আর শিবরামের নতুন বই ভরে নিয়েছি খানকয়েক।

মা এসে বললে, যা-তা খাসনি। তুই যেরকম পেটরোগা—বুঝেসুঝে খাবি।

কোত্থেকে আধুলি এসে জুড়ে দিলে, দুটো কাঁচকলা নিয়ে যা ছোড়দা—আর হাঁড়ির ভেতরে গোটাকয়েক শিঙিমাছ।

আমি আধুলির বিনুনিটা চেপে ধরতে যাচ্ছি সেই সময় মেজদা এসে হাজির। এসেই বলতে লাগল, প্লেনে চেপে যদি কানে ধাপা লাগে তা হলে হাই তুলতে থাকবি। যদি বমি আসে তা হলে অ্যাঁভোমিন ট্যাবলেট দিচ্ছি—গোটা কয়েক খাবি। যদি—

উঃ, উপদেশের চোটে প্রাণ বেরিয়ে গেল! এর মধ্যে আবার ছোড়দি এসে বলতে আরম্ভ করল; দার্জিলিঙের কাছাকাছি তো যাচ্ছিস। যদি সস্তায় পাস কয়েক ছড়া পাথরের মালা কিনে আনিস তো!

—দুত্তোর বলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময়েই বাইরে মোটরের হর্ন বেজে উঠল। আর টেনিদার হাঁক শোনা গেল; কি রে প্যালা—রেডি?

—রেডি। আসছি—

তক্ষুনি স্যুটকেস নিয়ে লাফিয়ে উঠলুম। হাবুলদের মোটরে চেপে ওরা সবাই এসে পড়েছে। মোটরে করে সোজা দমদমে গিয়ে আমরা প্লেনে উঠব। তারপর দুঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব ডুয়ার্সের জঙ্গলে। তখন আর পায় কে! কুট্টিমামার ওখানে মজাসে খাওয়া-দাওয়া চা বাগান আর বনের মধ্যে বেড়ানো—দু-একদিন শিকারে বেরিয়ে গলায় দড়ি বেঁধে বাঘ-টাঘ নিয়ে আসা। ডি-লা-এ্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস!

সকলকে চটপট প্রণাম-ট্রনাম সেরে নিয়ে গেট খুলে বেরুতে যাচ্ছি, হঠাৎ—

পেছনে বিটকেল ব-ব-ব আওয়াজ আর শার্টের কোনা ধরে এক হ্যাঁচকা টান। চমকে লাফিয়ে উঠলুম। তাকিয়ে দেখি, হতচ্ছাড়া গঙ্গারাম। দাড়ি নেড়ে নেড়ে আমার জামাটা খাওয়ার চেষ্টা করছে।

—তবে রে অযাত্রা! পেছু টান।

ধাঁই করে একটা চাঁটি বসিয়ে দিলুম গঙ্গারামের গালে। গঙ্গারাম ম্যা-আ-আ করে উঠল। আর আমার হাতে যা লাগল সে আর কী বলব! গঙ্গারামটার গাল যে এমন ভয়ানক শক্ত, সেকথা সে জানত!

মোটর থেকে টেনিদা আবার হাঁক ছাড়ল;কী রে প্যালা, দেরি করছিস কেন?

—আসছি বলে এক ছুটে বেরিয়ে আমি গাড়িতে উঠে পড়লুম। তখনও গঙ্গারাম সমানে ডাকছে; ম্যা-অ্যাঁ-অ্যাঁ-ভ্যা-অ্যাঁ-অ্যাঁ! ভাবটা এই: খামকা আমায় একটা রামচাঁটি লাগালে? আচ্ছা যাও ডুয়ার্সের জঙ্গলে। এর ফল যদি হাতে-হাতে না পাও—তা হলে আমি ছাগলই নই।

হায় রে, তখন কি আর জানতুম—গঙ্গারামের ভাগনে যা দশগণ্ডা করে মারে, তারই পাল্লায় পড়ে আমার অদৃষ্টে অশেষ দুঃখ আছে এরপর!

গাড়ি দমদম এয়ারপোর্টের দিকে ছুটল।

০২. বিমানে চৈনিক রহস্য

ভজহরি মুখার্জি—স্বর্ণেন্দু সেন-কুশল মিত্র—কমলেশ ব্যানার্জি—

নামগুলো শুনে চমকে চমকে উঠছ তো? ভাবছ—এ আবার কারা? হুঁ হুঁ ভাববার কথাই বটে। এ হল আমাদের চারমূর্তির ভালো নাম—আগে স্কুলের খাতায় ছিল। এখন কলেজের খাতায়। ভজহরি হচ্ছে আমাদের দুর্দান্ত টেনিদা, স্বর্ণেন্দু হল ঢাকাই হাবুল, কুশল হচ্ছে হতচ্ছাড়া ক্যাবলা আর কমলেশ? আন্দাজ করে নাও।

এসব নাম কি ছাই আমাদের মনে থাকে? প্লেনে উঠতে যেতেই একটা লোক কাগজ নিয়ে এইসব নাম ডাকতে লাগল। আমরাও—এই যে—এই যে বলে টকটক উঠে পড়লুম। হাবলা তো অভ্যাসে বলেই ফেলল, প্রেজেন্ট স্যার।

আরে রামো—এ কী প্লেন!

এর আগে আমি কখনও প্লেনে চাপিনি—কিন্তু বড়দা ও মেজদার কাছে কত গল্পই যে শুনেছি! চমৎকার সব সোফার মতো চেয়ার—থেকে-থেকে চা-কফি-লজেন্স-স্যাণ্ডউইচ-সন্দেশ খেতে দিচ্ছে, উঠে বসলেই সে কী খাতির। কিন্তু এ কী! প্লেনের বারো আনা বোঝাই কেবল বস্তা আর কাপড়ের গাঁট, কাঠের বাক্স, আবার এক জায়গায় দড়ি দিয়ে বাঁধা কয়েকটা হুঁকোও রয়েছে।

শুধু দুদিকে চারটে সিট কোনওমতে রাখা আছে আমাদের জন্যে। তাতে গদিটদি কিছু ছিল, কিন্তু এখন সব ছিড়েখুঁড়ে একাকার।

হাবুল সেন বললে, অ টেনিদা! মালগাড়িতে চাপাইলা নাকি?

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, যা—যা-মেলা বকিসনি! কুড়ি টাকা দিয়ে প্লেন চাপবি—কত আরাম পেতে চাস—শুনি? তবু তো ভাগ্যি যে প্লেনের চাকার সঙ্গে তোদের বেঁধে দেয়নি!

বলতে বলতে জন-তিনেক কোট-প্যান্ট-পরা লোক তড়াক করে প্লেনে উঠে পড়ল। তারপর সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো অদ্ভুত কায়দায় টকটক করে সেই বাক্স-বস্তার স্তূপ পেরিয়ে—একজন আবার হুঁকোগুলোতে একটা হোঁচট খেয়ে ওপাশের প্রবেশ নিষেধ লেখা একটা কাচের দরজার ওপারে চলে গেল।

টেনিদা বললে, ওরা পাইলট। এখুনি ছাড়বে।

ক্যাবলা বললে, ইস, পাইলট হওয়া কী কষ্ট! বাক্স আর বস্তার উপর দিয়ে লাফাতে হয় কেবল।

যাত্রী আমরা মাত্র চারজন। দুদিকের সিটগুলোতে চেপে বসতে-বসতে হঠাৎ ঘুরুর ঘুরুর করে আওয়াজ আরম্ভ হল। তারপরেই গুড়গুড়িয়ে চলতে আরম্ভ করল প্লেনটা।

আমরা তাহলে সত্যিই এবার আকাশে উড়ছি! কী মজা! এবার মেঘের উপর দিয়ে—নদী গিরি কান্তার মানে আরও কী সব যেন বলে—অটবী-টটবী পার হয়ে দূর-দূরান্তে চলে যাব। আমার পিসতুতো ভাই ফুচুদা এখন থাকলে নিশ্চয় কবিতা লিখত :

পাখি হয়ে যাই গগনে উড়িয়া,
ফড়িং টড়িং খাই ধরিয়া—

কিন্তু ফড়িং খাওয়ার কথা কি লিখত? আমার একটু খটকা লাগল। কবিরা কি ফড়িং খায়? বলা যায় না—যারা কবি হয় তাদের অসাধ্য আর অখাদ্য কিছুই নেই।

এইসব দারুণ চিন্তা করছি, আর প্লেনটা সমানে গুড়গুড় করে চলেছে। আমি ভাবছিলুম এতক্ষণে বুঝি মেঘের উপর দিয়ে কান্তার মরু দুস্তর পারাবার এইসব পাড়ি দিচ্ছি। দুৎ—কোথায় কী! খালি ডাঙা দিয়ে চলছে তো চলছেই!

টেনিদার পাশ থেকে হাবুল বললে, কই টেনিদা—উড়তে আছে না তো?

ক্যাবলা একটা এলাচ বের করে চিবুচ্ছিল। আমি খপ করে নিতে গেলুম—পেলুম খোসাটা। রাগ করে বললুম, উড়বে না ছাই! মালগাড়ি কোনওদিন ওড়ে নাকি?

ক্যাবলা বললে, যাচ্ছে তো গড়গড়িয়ে। কাল হোক, পরশু হোক,—ঠিক পৌঁছে যাবে।

হাবুল করুণ গলায় বললে, কয় কী—অ টেনিদা! এইটা উড়ব না? সঙ্গে সঙ্গে প্লেন দাঁড়িয়ে পড়ল। আর বেজায় জোরে ঘর ঘর করে আওয়াজ হতে লাগল।

আমি বললুম, যাঃ, থেমে গেল!

ক্যাবলা মাথা নেড়ে বললে, হুঁ—স্টেশনে থামল বোধহয়। ইঞ্জিনে জল-টল নেবে।

টেনিদা ভীষণ রেগে গেল এবার।

-টেক কেয়ার ক্যাবলা—আমার কুট্টিমামার দেশের প্লেন! খবরদার—অপমান করবিনি বলে দিচ্ছি!

—তবে ওড়ে না কেন! খালি আওয়াজ করে—মাথা ধরিয়ে দিচ্ছে!

বলতে বলতেই আবার ঘর ঘর করে ছুটতে আরম্ভ করল প্লেন। তারপরেই—ব্যাস, টুক করে যেন ছোট্ট একটু লাফ দিলে, আর সব আমাদের পায়ের তলায় নেমে যাচ্ছে।

আমরা উড়েছি! সত্যিই উড়েছি।

টেনিদা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বললে, তবে যে বলছিলি উড়বে না? কেমন—দেখলি তো এখন? ডি-লা-এ্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস—

আমরা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বললুম, ইয়াক-ইয়াক!

প্লেন উড়েছে। দেখতে দেখতে বাড়িঘরগুলো খেলনার মতো ছোট্ট-ছোট্ট হয়ে গেল, গাছগুলোকে দেখাতে লাগল ঝোপের মতো, রাস্তাগুলো চুলের সিঁথির মতো সরু হয়ে গেল আর রুপোর সাপের মতো আঁকাবাঁকা নদীগুলো আমাদের অনেক নীচে লুকিয়ে রইল।

মেজদার কাছে আগেই শুনেছিলুম, প্লেনে চেপে সিনারি দেখতে হলে জানলার পাশে যেতে হয়। আমিও কায়দা করে আগেই বসে পড়েছি। ক্যাবলা মিনতি করে বললে, তুই আমার জায়গায় আয় না প্যালা—আমিও ভাল করে একটুখানি দেখে নিই!

আমি বললুম, এখন কেন? এলাচের খোসা দেবার সময় মনে ছিল না?

—তোকে চকলেট দেব।

—দে।

ঘাড় চুলকে ক্যাবলা বললে, এখন তো সঙ্গে নেই, কলকাতায় ফিরে গিয়ে দেব।

—তবে কলকাতায় ফিরেই সিনারি দেখিস। —আমি তক্ষুনি জবাব দিলুম।

ক্যাবলা ব্যাজার হয়ে বললে, না দিলি দেখতে—বয়ে গেল! কীই বা আছে দেখবার! ভারি তো বাঁশবন আর পচা ডোবা—ও তো পাড়াগাঁয়ে গিয়ে তালগাছের উপরে চাপলেই দেখা যায়।

—দ্রাক্ষাফল অতিশয় টক—শেয়াল বলেছিল। আমি ক্যাবলাকে উপদেশ দিলুম; তবে যা-তালগাছের মাথাতেই চাপ গে।

ওদিকে টেনিদা আর হাবুলের মধ্যে দারুণ তর্ক চলছে।

হাবুল বললে, আমার মনে হয়, আমরা বিশ হাজার ফুট উপর দিয়া যাইত্যাছি।

টেনিদা নাকটাকে কুঁচকে বললে, ফুঃ! আমার কুট্টিমামার দেশের প্লেন অত তলা দিয়ে যায় না। আমরা কম-সে কম পঞ্চাশ হাজার ফুট উপর দিয়ে যাচ্ছি।

ক্যাবলা মিটমিট করে হাসল। তারপর বললে, কেইসা বাত বোলতা তুমলোক। এসব ডাকোটা প্লেন,

যেগুলো মাল টানে, কখনও ছ-সাত হাজার ফুটের উপর দিয়ে যায় না।

—এই ক্যাবলাটার সব সময় পণ্ডিতি করা চাই। টেনিদা মুখখানা হালুয়ার মতো করে বললে, থাম, ওস্তাদি করিসনি! এসব কুট্টিমামার দেশের প্লেন—পঞ্চাশষাট হাজারের নীচে কথাই কয় না।

ক্যাবলা বললে, আমি জানি।

টেনিদার হালুয়ার মতো মুখটা এবার আলু-চচ্চড়ির মতো হয়ে গেল: তুই জানিস? তবে আমিও জানি। এক্ষুনি তোর নাকে এমন একটা মুগ্ধবোধ বসিয়ে দেব যে—

ক্যাবলা তাড়াতাড়ি বললে, না-না, আমারই ভুল হয়ে গিয়েছিল। এই প্লেনটা বোধহয় এখন একলাখ ফুট উপর দিয়ে যাচ্ছে।

—এক লাখ ফুট! —আমি হাঁ করে রইলুম। সেই ফাঁকে ক্যাবলা আমার মুখের ভেতরে আবার একটা এলাচের খোসা ফেলে দিলে।

হাবুল বললে, খাইছে! এক লাখ ফুট! অ টেনিদা—!

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, কী বলবি বল না! একেবারে শিবনেত্তর হয়ে বসে রইলি কেন?

-আমরা তো অনেক উপরে উইঠ্যা পড়ছি!

টেনিদা ভেংচে বললে, তা পড়ছি। তাতে হয়েছে কী?

—চাঁদের কাছাকাছি আসি নাই?

টেনিদা উঁচুদরের হাসি হাসল।

—হ্যাঁ, তা আর-একটু উঠলেই চাঁদে যাওয়া যেতে পারে।

-তা হইলে একটু কও না পাইলটেরে। চাঁদের থিক্যা একটু ঘুইর‍্যাই যাই। বেশ ব্যাড়ানোও হইব, রাশিয়ান স্পুটনিক আইস্যা পড়ছে কি না সেই খবরটাও নিতে পারুম।

ক্যাবলা বললে, হুঁ, চাঁদে সুধাও আছে শুনেছি। এক-এক ভাঁড় করে খেয়ে যাওয়া যাবে।

আমার শুনে কেমন খটকা লাগল। এত সহজেই কি চাঁদে যাওয়া যায়? কাগজে কী সব যেন পড়েছিলুম। চাঁদ, কী বলে—সেই যেন কত লক্ষ মাইল দূরে মানে, যেতে-টেতে অনেক দেরি হয় বলেই শুনেছিলুম। এমন চট করে কি সেখানে যাওয়া যাবে? আরও বিশেষ করে এই মালগাড়িতে চেপে?

কিন্তু টেনিদাকে সে কথা বলতে আমার ভরসা হল না। কুট্টিমামার দেশের প্লেন। সে-প্লেন সব পারে। আর পারুক বা নাই পারুক, মিথ্যে টেনিদাকে চটিয়ে আমার লাভ কী? এসে হয়তো টকাটক চাঁদির উপরে গোটাকয়েক গাঁট্টাই মেরে দেবে। আমি দুনিয়ার সব খেতে ভালবাসি—কলা, মুলো, পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল, চপ-কাটলেট-কালিয়া কিছুতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ওই চাঁটি-গাঁট্টাগুলো খেতে আমার ভালো লাগে—একদম না।

হাবুল আবার মিনতি করে বললে, অ টেনিদা, একবার পাইলটেরে রিকোয়েস্ট কইর‍্যা—চল না চাঁদের থিক্যা একটুখানি ব্যাড়াইয়া আসি।

হাবুল সেন ইয়ার্কি করছে নির্ঘাত! আমার দিকে তাকিয়ে একবার চোখ পিটপিট করলে। কিন্তু টেনিদা কিছু বুঝতে পারল না। বুঝলে হাবলার কপালে দুঃখ ছিল।

টেনিদা আবার উঁচুদরের হাসি হাসল—যাকে বাংলায় বলে, হাইক্লাস।

তারপর বললে, আচ্ছা, নেক্স্ট টাইম। এখন একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে কিনা—মানে কুট্টিমামা আমাদের জন্যে এতক্ষণ হরিণের মাংসের ঝোল রেডি করে ফেলেছে। তা ছাড়া রাশিয়ান আর আমেরিকানরা যাওয়ার এত চেষ্টা করছে, ওদের মনে ব্যথা দিয়ে আগে চাঁদে যাওয়াটা উচিত হবে না। ভারি কষ্ট পাবে। আমার মনটা বড় কোমল রে—কাউকে দুঃখ দিতে ইচ্ছে করে না।

আমরা সবাই বললুম, সে তো বটেই!

টেনিদা বললে, যাক চাঁদে পরে গেলেই হবে এখন। ও আর কী—গেলেই হয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, কুট্টিমামার হরিণের ঝোল মনে পড়তে ভারি খিদে পেয়ে গেল রে। কী খাওয়া যায় বল দিকি?

-এই তো খেয়ে এলে—আমি বললুম, এক্ষুনি খিদে পেল?

টেনিদা বললে, পেল। যাই বল বাপু, আমার খিদে একটু বেশি। বামুনের পেট তো প্রত্যেক দশ মিনিটেই একেবারে ব্রহ্মতেজে দাউদাউ করে ওঠে। কিন্তু কী খাই বল তো?

হাবুল বললে, ওই তো একটা বস্তা ফুটা হইয়া কী জ্যান পড়তে আছে! লবণ মনে হইত্যাছে। খাইবা?

আমরা একসঙ্গে তাকিয়ে দেখলুম। তাই বটে। একটা ছোট বস্তায় ছোট একটা ফুটো হয়েছে। সেখান থেকে শাদা গুঁড়ো-গুঁড়ো কী সব পড়ছে। লবণ? কিন্তু কিন্তু কেমন সন্দেহজনক!

একলাফে দাঁড়িয়ে পড়ল টেনিদা। বললে, দেখি কী রকম লবণ!

বলেই বস্তা থেকে খানিকটা আঙুলের ডগায় তুলে নিলে। তারপর চেঁচিয়ে বললে, ডি-ল্যা-এ্যাণ্ডি! ইউরেকা!

আমরা বললুম, মানে?

—বস্তার রহস্যভেদ। মানে বস্তার চৈনিক রহস্য।

—চৈনিক রহস্য! সে আবার কী?—আমি জানতে চাইলুম।

টেনিদা বললে, চিনি—চিনি—পিয়োর চিনি। যে-চিনি দিয়ে সন্দেশ তৈরি হয়, যে-চিনির রহস্যভরা রসের ভিতরে রসগোল্লা সাঁতার কাটে! যে-চিনি—

আর বলতে হল না। চিনিকে আমরা সবাই চিনি–কে না চেনে?

পড়ে রইল চাঁদ, নদী-গিরি কান্তারের শোভা। আমরা সবাই চিনির বস্তার ফুটোটাকে বাড়িয়ে ফেললুম।

তারপর—

তারপর বলাই বাহুল্য।

০৩. অতঃপর কুট্টিমামা

প্লেন এসে মাটিতে নামল।

ভালোই হল। চৈনিক রহস্য ভেদ করে এখন গলা একেবারে আঠা-আঠা হয়ে আছে—জিভটা যেন কাঁচাগোল্লা হয়ে আছে। জিভে কাঁচাগোল্লা চেপে বসলে ভালোই লাগে কিন্তু জিভটাই কাঁচাগোল্লা হয়ে গেলে কেমন বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি মনে হতে থাকে। এর মধ্যে আবার থেকে-থেকে কেমন গা গুলিয়ে উঠছিল। শেষকালে ক্যাবলার গায়েই খানিকটা বমি করে ফেলব কি না ভাবতে ভাবতেই দেখি, প্লেনটা সোজা থেমে গেল, আর বাইরে থেকে কারা টেনে দরজাটা খুলে দিলে।

দেখি, দুজন কুলি একটা ছোট লোহার সিঁড়ি লাগিয়ে দিয়েছে। নীচে পাঁচ-সাত জন লোক দাঁড়িয়ে।

চিনির বস্তার রাহাজানি ধরা পড়বার আগেই সরে পড়া দরকার। টুপ টুপ করে নেমে পড়লুম আমরা।

বা–রে—কোথায় এলুম? সামনে একটা টিনের ঘর, একটুখানি মাঠ–তার ভেতরে প্লেনখানা এসে নেমেছে। মাঠের তিন দিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ঘন জঙ্গল–আর একদিকে মেঘের মতো মাথা তুলে আছে নীল পাহাড়। হাওয়ায় বড় বড় ঘাস দুলছে আশেপাশে।

হাবুল বললে, তাইলে আইস্যা পড়লাম।

কিন্তু কুট্টিমামা? কোথায় কুট্টিমামা! যেকজন তোক দাঁড়িয়ে আছে—তার মধ্যে তো কুট্টিমামা নেই? সেই লম্বা তালগাছের মতো চেহারা, মিশমিশে কালো রং—মাথায় খেজুরপাতার মতো ঝাঁকড়া চুল—মানে টেনিদা আমাদের কাছে যেরকম বর্ণনা দিয়েছে আগে— সেরকম কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না?

বললুম, ও টেনিদা, কুট্টিমামা কোথায়?

টেনিদা বললে, ঘাবড়াসনি–ওই তো আসছে মামা।

চালাঘরটার পাশে একখানা জিপ গাড়ি এসে থেমেছে এক্ষুনি। তা থেকে নেমেছে বেঁটে-খাটো গোলগাল একটি ভালোমানুষ লোক। গায়ে নীল শার্ট, পরনে পেটুলুন। টেনিদা দেখিয়ে বললে, ওই তো কুট্টিমামা।

আমরা তিনজনে একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠলুম, ওই কুট্টিমামা! হতেই পারে না! ঝাঁকড়া চুল তালগাছের মতো লম্বা কালিগোলা রং–সে কী করে অমন ছোটখাটো টাকমাথা গোলগাল মানুষ হয়ে যাবে। আর গায়ের রংও তো বেশ ফর্সা।

ক্যাবলা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই টেনিদা এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোককে একটা প্রণাম ঠুকে দিলে।

–মামা, আমরা সবাই এসে গেছি।

কী আর করা! কুট্টিমামার রহস্য পরে ভেদ করে যাবে আপাতত আমরাও একটা করে প্রণাম করলুম।

ভদ্রলোক খুশি হয়ে হেসে বললেন, বেশ বেশ, ভারি আনন্দ হল তোমাদের দেখে। তা পথে কোনও কষ্ট হয়নি তো?

ফস করে বলে ফেললুম, না মামা–বেশি কষ্ট হয়নি। মানে, চিনির বস্তাটা ছিল—

টেনিদার চোখের দিকে তাকিয়েই সামলে গেছি সঙ্গে সঙ্গে। মামা বললেন, চিনির বস্তা। সে আবার কী?

টেনিদা বললে, না মামা, ওসব কিছু না। চিনির বস্তাটা আমরা চিনি না। মানে, প্যালা খুব চিনি খেতে ভালোবাসে কিনা–তাই সারা রাস্তা স্বপ্ন দেখছিল।

কুট্টিমামা হেসে বললেন, তাই নাকি?

—হ্যাঁ মামা।—টেনিদা উৎসাহ পেয়ে বলতে আরম্ভ করলে, আমারও ওরকম হয়। তবে আমি আবার চপ-কাটলেটের স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি। এই হাবুল সেন খালি রাবড়ি আর চমচমের স্বপ্ন দেখে। আর এই

ক্যাবলা মানে এই বাচ্চা ছেলেটা পরীক্ষায় স্কলারশিপ পায় আর চুয়িং গামের স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করে।

ক্যাবলা ভীষণভাবে প্রতিবাদ করে উঠল, কক্ষনো না। চুয়িং গামের স্বপ্ন দেখতে আমি মোটেই ভালোবাসি না। আমিও চপ-কাটলেট রাবড়ি চমচম—এইসবের স্বপ্ন দেখি।

কুট্টিমামা আবার অল্প একটু হেসে বললেন, দেখা যাক, স্বপ্নকে সফল করা যায় কি না। এখন চলো। মালপত্র প্লেনে কিছু নেই তো? সব হাতে? ঠিক আছে।

—তোমাদের বাগান কতদূরে মামা?

—এই মাইল-ছয়েক। দশবারো মিনিটের মধ্যেই চলে যাব। এসো—

একটু পরেই আমরা জিপে উঠে পড়লুম। ড্রাইভারের পাশে বসে মামা বললেন, একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে দেওয়ান বাহাদুর। অনেক দূরে থেকে আসছে এরা—এদের খিদে পেয়েছে।

টেনিদা বললে, তা যা বলেছ মামা। সকালে বলতে গেলে কিছুই খাইনি—পেট চুঁই-চুঁই করছে।

টেনিদা কিছু খায়নি! বাড়ি থেকে গলা পর্যন্ত ঠেসে বেরিয়েছে প্লেনে এসে কমসে কম একসের চিনি মেরে দিয়েছে। টেনিদা যদি কিছু না খেয়ে থাকে, আমি তো তিনদিন উপোস করে আছি!

জিপ ছুটল।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কালো পিচের পথ পড়ে আছে মস্ত একটা ফিতের মতো। আমাদের জিপ চলেছে। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ছায়া ছড়িয়ে আছে পথের উপর—কেমন মিষ্টি গলায় নানারকমের পাখি ডাকছে।

টেনিদা বসেছে আমাদের পাশেই। ফাঁক পেয়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমি যেরকম বলেছিলে, তোমার কুট্টিমামার চেহারা তো একদম সেরকম নয়! গুল দিয়েছিলে বুঝি?

টেনিদা বললে, চুপ-চুপ! কুট্টিমামা শুনলে এখুনি একটা ভীষণ কাণ্ড হয়ে যাবে!

—ভীষণ কাণ্ড! কেন?

টেনিদা আমার কানে কানে বললে, সে এক লোমহর্ষক ব্যাপার—বুঝলি! বললে পেত্যয় যাবি না—নেপালী বাবার একটা ছু-মন্তরেই কুট্টিমামার চেহারা বিলকুল পালটে গেছে।

—ছু-মন্তর! সে আবার কী?

—পরে বলব, এখন ক্যাঁচম্যাচ করিসনি। কুট্টিমামা শুনলে দারুণ রাগ করবে। বলতে বারণ আছে কিনা!

আমি চুপ করে গেলুম। একটা যা-তা গল্প বানিয়ে দেবে এর পরে। কিন্তু টেনিদার কথায় আর বিশ্বাস করি আমি? আমি কি পাগল না পেন্টুলুন?

এর মধ্যে হাবুল সেন কুট্টিমামার পাশে বসে বকবকানি জুড়ে দিয়েছে : আইচ্ছা মামা, এই জঙ্গলটার নাম কী?

মামা বললেন, এর নাম দইপুর ফরেস্ট।

—এই জঙ্গলে বুঝি খুব দই পাওয়া যায়?

মামা বললে, দই তো জানি না—তবে বাঘ পাওয়া যায় বিস্তর।

এতক্ষণ পরে ক্যাবলা বললে, সেই বাঘের দুধেই দই হয়।

কুট্টিমামা হেসে বললেন, তা হতে পারে। কখনও খেয়ে দেখিনি।

শুনে দুচোখ কপালে তুলল হাবুল সেন : আরে মশয়, কন কী? আপনে বাঘের দই খান নাই? আপনার অসাধ্য কর্ম আছে নাকি? কালীসিঙ্গির মহাভারতের একখানা ঘাও দিয়া—বলেই হঠাৎ হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল হাবুল; গেছি—গেছি—খাইছে।

কুট্টিমামা অবাক হয়ে বললেন, কী হল তোমার? কিসে খেলে তোমাকে?

কিসে খেয়েছে সে আমি দেখেছি। টেনিদা কটাং করে একটা রাম-চিমটি বসিয়েছে। হাবুলের পিঠে।

—আমারে একখানা জব্বর চিমটি দিল। কুট্টিমামা পেছন ফিরে তাকালেন; কে চিমটি দিয়েছে?

টেনিদা চটপট বললে, না মামা, কেউ চিমটি দেয়নি। এই হাবুলটার মানে পিঠে বাত আছে কিনা, তাই যখন-তখন কড়াং করে চাগিয়ে ওঠে, আর অমনি ওর মনে হয় কেউ ওকে চিমটি কেটেছে।

হাবুল প্রতিবাদ করে বললে, কখনও না—কখনও না! আমার কোনও বাত নাই।

টেনিদা রেগে গিয়ে বললে, চুপ কর হাবলা, মুখে মুখে তক্কো করিসনি। বাত আছে মামা—ও জানে না। ওর পিঠে বাত আছে-কানে বাত আছে, নাকে বাত আছে—

কুট্টিমামা বললেন, কী সাঙ্ঘাতিক! এইটুকু বয়সেই এসব ব্যারাম!

—তাই তো বলছি মামা—টেনিদার মুখখানা করুণ হয়ে এল : এইজন্যেই তো ওকে নিয়ে আমাদের এত ভাবনা! কতবার ওকে বলেছি—হাবলা, অত বাতাবিনেবু খাসনি—খাসনি। বাতাবি খেলেই বাত হয়। এ তো জানা কথা। কিন্তু ভালো কথা কি ওর কানে যায়? তার ওপর বাতাসা দেখলে তো কথাই নেই—তক্ষুনি খেতে শুরু করে দেবে। এতেও যদি বাত না হয়—

হাবুল আবার হাউমাউ করে কী সব বলতে যাচ্ছিল, কুট্টিমামা তাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, বাতাবিলেবু আর বাতাসা খেলে বাত হয়? তা তো কখনও শুনিনি।

—হচ্ছে মামা, আজকাল আকছার হচ্ছে! কলকাতায় আজকাল কী যে সব বিচ্ছিরি কাণ্ডকারখানা ঘটছে সে আর তোমায় কী বলব! এমনকি একটু বেশি করে জল খেয়েছ তো সঙ্গে সঙ্গেই জলাতঙ্ক।

শুনে কুট্টিমামা চোখ কপালে তুলে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। বললেন, কী সর্বনাশ!

কথা বলে কিছু লাভ হবে না বুঝে হাবুল একদম চুপ। আমি গ্যাঁট হয়ে বসে টেনিদার চালিয়াতি শুনছি। কিন্তু ক্যাবলাটা আর থাকতে পারল না, ফস করে বলে ফেলল, গুল!

টেনিদা চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী বললি?

ক্যাবলা দারুণ হুঁশিয়ার—সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়েছে। নইলে জিপ থেকে নেমেই নির্ঘাত টেনিদা ওকে পটাপট কয়েকটা চাঁটি বসিয়ে দিত চাঁদির ওপর। বললে, না-না, চারদিকে কী সুন্দর ফুল ফুটেছে!

আমি অবশ্যি কোথাও কোনও ফুল-টুল দেখতে পেলুম না। কিন্তু ক্যাবলা বেশ ম্যানেজ করে নিয়েছে।

কুট্টিমামা খুশি হয়ে বললেন, হুঁ, ফুল এদিকে খুব ফোটে। কাল জঙ্গলে যখন বেড়াতে নিয়ে যাব, তখন দেখবে ফুলের বাহার!

হাবুলটা এক নম্বরের বোকা, এর মধ্যেই আবার বলে ফেলেছে, মামা আপনার পোষা বাঘটা—

মামা ভীষণ চমকে গেলেন।

কী বললে! পোষা বাঘ! সে আবার কী?

কিন্তু টেনিদা তক্ষুনি উল্টে দিয়েছে কথাটা। হাঁ হাঁ করে বললে, না-না মামা, বাঘ-টাঘ নয়। হাবুলের নাকেও বাত হয়েছে কিনা, তাই কথাগুলো ওইরকম শোনায়। ও বলছিল তোমার ধোসা রাগটা—মানে সেই ধুসো কম্বলটা যেটা তুমি দার্জিলিঙে কিনেছিলে সেটা আছে তো?

হাবুল একবার হাঁ করেই মুখ বন্ধ করে ফেললে। কুট্টিমামা আবার দারুণ অবাক হয়ে বললেন, তা সে কম্বলটার কথা এরা জানলে কী করে?

—হেঁ—হেঁ—টেনিদা খুব কায়দা করে বললে, তোমার সব গল্পই আমি এদের কাছে করি কিনা! এরা যে তোমাকে কী ভক্তি করে মামা, সে আর তোমায়—

কথাটা শেষ হল না। ঠিক তখুনি—

জিপের বাঁ দিকের জঙ্গলটা নড়ে উঠল। আর জিপের সামনে দিয়ে এক লাফে যে রাস্তার ওপারে গিয়ে

পড়ল, তাকে দেখামাত্র চিনতে ভুল হয় না। তার হলদে রঙের মস্ত শরীরটার উপর কালো কালো ডোরা—ঠিক যেন রোদের আলোয় একটা সোনালি তীর ছুটে গেল সামনে দিয়ে।

আমি বললুম, বা—বা—বা—

'ঘ'-টা বেরুবার আগেই টেনিদা জাপটে ধরেছে ক্যাবলাকে—আবার ক্যাবলা পড়েছে আমার ঘাড়ের ওপর। আর হাবুল আর্তনাদ করে উঠেছে : খাইছে—খাইছে!

০৪. বনের বিভীষিকা

বনের বাঘ অবিশ্যি বনেই গেল, হালুম করে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ল না। আর কুট্টিমামা হা হা করে হেসে উঠলেন।

-ওই একটুখানি বাঘ দেখেই ভিরমি খেলে, তোমরা যাবে জঙ্গলে শিকার করতে।

ততক্ষণে গাড়ি এক মাইল রাস্তা পার হয়ে এসেছে। জঙ্গল ফাঁকা হয়ে আসছে দুধারে। আমরাও নড়েচড়ে বসেছি ঠিক হয়ে।

টেনিদা বললে, না মামা, আমরা ভয় পাইনি। বাঘ দেখে ভারি ফুর্তি হয়েছিল কিনা, তাই বাঃ বাঃ বাঘ বলে আনন্দে চেঁচামেচি করছিলুম। শুধু প্যালাই যা ভয় পেয়েছিল। ও একটু ভিতু কিনা!

বাঃ—ভারি মজা তো। সবাই মিলে ভয় পেয়ে শেষে আমার ঘাড়ে চাপানো! আমি তাড়াতাড়ি বললুম, নানা, আমিও ভয় পাইনি। এই ক্যাবলাটাই একটুতে নার্ভাস হয়ে যায়, তাই ওকে ভরসা দিচ্ছিলুম!

ক্যাবলা নাক-মুখ কুঁচকে বললে, ব্যাস্—খামোশ!

শুনে আমার ভারি রাগ হয়ে গেল।

—খা মোষ। কেন—আমি মোষ খেতে যাব কী জন্যে? তোর ইচ্ছে হয় তুই মোষ খা—গণ্ডার খা—হাতি খা! পারিস তো হিপোপটেমাস ধরে ধরে খা!

কুট্টিমামা মিটমিট করে হাসলেন।

—ও তোমাকে মোষ খেতে বলেনি—বলেছে খামোশ—মানে,থামো। ওটা হচ্ছে রাষ্ট্রভাষা।

বললুম, না ওসব আমার ভালো লাগে না! চারদিকে বাঘ-টাঘ রয়েছে—এখন খামখা রাষ্ট্রভাষা বলবার দরকার কী?

হাবুল সেন বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল।

—বুঝছস নি প্যালা—বাঘেও রাষ্ট্রভাষা কয় : হাম—হাম। মানেডা কী? আমি—আমি—যে-সে পাত্তর না—সাইক্ষাৎ বাঘ। বিড়ালে ইন্দুররে ডাইক্যা কয় : মিঞা আও—আইসো ইন্দুর মিঞা, তোমারে ধইর‍্যা চাবাইয়া খামু। আর কুত্তায় কয় : ভাগ—ভাগ—ভাগ হো—পলা—পলা, নইলে ঘ্যাঁৎ কইর‍্যা তর ঠ্যাঙে একখানা জব্বর কামড় দিমু—হঃ!

টেনিদা বললে, বাপূরে, কী ভাষা। যেন বন্দুক ছুঁড়ছে।

হাবুল বুক চিতিয়ে বললে, বীর হইলেই বীরের মতো ভাষা কয়। বোঝলা!

জবাব দিলে কুট্টিমামা। বললেন, বোঝলাম। কে কেমন বীর, দু-একদিনের মধ্যেই পরীক্ষা হবে এখন। এসব আলোচনা এখন থাক। এই যে—এসে পড়েছি আমরা।

সত্যি, কী গ্র্যান্ড জায়গা!

তিনদিকে জঙ্গল—আর একদিকে চায়ের বাগান ঢেউ খেলে পাহাড়ের কোলে উঠে গেছে। তার উপরে কমলালেবুর বাগান—অসংখ্য নেবু ধরেছে, এখনও পাকেনি, হলদে-হলদে রঙের ছোপ লেগেছে কেবল। চা বাগানের পাশে ফ্যাক্টরি, তার পাশে সায়েবদের বাংলো। আর একদিকে বাঙালি কর্মচারীদের সব কোয়ার্টার কুট্টিমামার ছোট্ট সুন্দর বাড়িটি। অনেকটা দূরে কুলি লাইন। ভেঁপু বাজলেই দলে দলে কুলি মেয়ে ঝুড়ি নিয়ে চায়ের পাতা তুলতে আসে, কেউ-কেউ পিঠে আবার ছোট্ট বাচ্চাদেরও বেঁধে আনে—বেশ মজা লাগে দেখতে।

সায়েবরা কলকাতায় বেড়াতে গেছে—কুট্টিমামাই বাগানের ছোট ম্যানেজার। আমরা গিয়ে পৌঁছুবার পর কুট্টিমামাই বললেন, খেয়ে-দেয়ে একটু জিরিয়ে নাও, তারপর বাগান-টাগান দেখব'খন।

টেনিদা বললে, সেই কথাই ভালো মামা। খাওয়া-দাওয়াটা আগে দরকার। সে-চিনি যে কখন—বলতে

বলতেই সামলে নিলে : মানে সেই যে কখন থেকে পেট চিন-চিন করছে।

মামা হেসে বললেন, চান করে নাও—সব রেডি।

চান করবার তর আর সয় না—আমরা সব হুটোপুটি করে টেবিলে গিয়ে বসলুম।

একটা চাকর নিয়ে কুট্টিমামা এবাড়িতে থাকেন, কিন্তু বেশ পরিপাটি ব্যবস্থা চারদিকে। সব সাজানো গোছানো ফিটফাট। চাকরটার নাম ছোট্টুলাল। আমরা বসতে-বসতে গরম ভাতের থালা নিয়ে এল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, টেনিদা, তুমি যে রামভরসার কথা বলছিলে, সে কোথায়?

টেনিদা আমার কানে কানে বললে, চুপ—চুপ! রামভরসার নাম করিসনি। সে ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেছে!

—কী ভীষণ কাণ্ড?

—ভাত দিয়েছে—খা না বাপু! টেনিদা দাঁত খিচুনি দিলে : অত কথা বলিস কেন? বকবক করতে করতে একদিন তুই ঠিক বক হয়ে উড়ে যাবি, দেখে নিস।

—বকবক করলে বুঝি বক হয়?

—হয় বইকি! যারা হাঁস-ফাঁস করে তারা হাঁস হয়, যারা ফিসফিস করে তারা ফিশ—মানে মাছ হয়—

আরও কী সব বাজে কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু থেমে গেল। ফিশকে থামিয়ে দিয়ে ডিশ এসে পড়েছে। মানে, মাংসের ডিশ!

—ইউরেকা!—বলেই টেনিদা মাংসের ডিশে হাত ডোবাল। একটা হাড় তুলে নিয়ে তক্ষুনি এক রামকামড়। ছোট্টলাল ওর গ্লাসে জল দিতে যাচ্ছিল, একটু হলে তার হাতটাই কামড়ে দিত।

ক্যাবলা বললে, মামা—হরিণের মাংস বুঝি? মামা বললেন, শিকারে না গেলে কি হরিণ পাওয়া যায়? আজকে পাঁঠাই খাও, দেখি কাল যদি একটা মারতে-টারতে পারি।

—আমরা সঙ্গে যাব তো?

—আমার আপত্তি নেই। কুট্টিমামা হাসলেন : কিন্তু বাঘের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়—

ক্যাবলা বললে, না মামা, আমরা ভয় পাব না। পটলডাঙার ছেলেরা কখনও ভয় পায় না। আমাদের লিডার টেনিদাকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন না।...আচ্ছা টেনিদা, আমরা কি বাঘকে ভয় করি?

টেনিদা চোখ বুজে, গলা বাঁকিয়ে একমনে একটা হাড় চিবুচ্ছিল। হঠাৎ কেমন ভেবড়ে গেল।

বিচ্ছিরি রেগে, নাকটাকে আলুসেদ্ধর মতো করে বললে, দেখছিস মন দিয়ে একটা কাজ করছি, খামকা কেন ডিসটার্ব করছিস র‍্যা? হাড়টাকে বেশ ম্যানেজ করে এনেছিলুম, দিলি মাটি করে!

হাবুল ফ্যাকফ্যাক করে হেসে উঠল : তার মানে ভয় পাইতাছে!

—হ্যাঁ, ভয় পাচ্ছে। তোকে বলেছে!

—কওনের কাম কী, মুখ দেইখ্যাই তো বোঝন যায়। অখনে পাঠার হাড় খাইতাছ, ভাবতাছ বাঘে তোমারে পাইলেও ছাইড়্যা কথা কইব না—তখন তোমারে নি ধইর‍্যা—

বাঁ হাত দিয়ে দুম করে একটা কিল টেনিদা বসিয়ে দিলে হাবুলের পিঠে।

হাবুল হাউমাউ করে বললে, মামা দ্যাখেন—আমারে মারল।

মামা বললেন, ছিঃ ছিঃ মারামারি কেন। ওর যদি ভয় হয়, তবে ও বাড়িতে থাকবে। যাদের সাহস আছে, তাদেরই সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

টেনিদার মেজাজ গরম হয়ে গেল।

—কী, আমি ভিতু!

ক্যাবলা বললে, না—না, কে বলেছে সেকথা। তবে কিনা তোমার সাহস নেই—এই আর কি।

—সাহস নেই!—এক কামড়ে পাঁঠার হাড় গুঁড়িয়ে ফেলল টেনিদা : আছে কি না দেখবি কাল! বাঘ-ভালুক-হাতি-গণ্ডার যে সামনে আসবে, এক ঘুষিতে তাকে ফ্ল্যাট করে দেব।

ক্যাবলা বললে, এই তো বাহাদুরকা বাত—আমাদের লিডারের মতো কথা!

মামা বললেন, শুনে খুশি হলাম। তবে যা ভাবছ তা নয়, বাঘ অমন ঝট করে গায়ের উপর এসে পড়ে না। তাকেই খোঁজবার জন্যে বরং অনেক পরিশ্রম করতে হয়। তা ছাড়া সঙ্গে দুটো বন্দুকও থাকবে—ঘাবড়াবার কিছু নেই।

হাবুল সেন খুশি হয়ে বললে, হ, সেই কথাই ভালো। বাঘেরে ঘুষিঘাষি মাইর‍্যা লাভ নাইবাঘে তো আর বক্সিং-এর নিয়ম জানে না। দিব ঘচাং কইর‍্যা একখানা কামড়! বন্দুক লইয়া যাওনই ভালো।

টেনিদা বললে, আঃ, তোদের জ্বালায় ভালো করে একটু খাওয়া-দাওয়া করবারও জো নেই, খালি বাজে কথা! কই হে ছোট্টুলাল, আর-এক প্লেট মাংস আনো। বেড়ে বেঁধেছে বাপু, একটু বেশি করেই আনো।

বিকেলে আমরা চায়ের বাগানে বেশ মজা করেই বেড়ালুম, কারখানাও দেখা হল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলুম দূরের কমলানেবুর বন পর্যন্ত। জায়গাটা ভালো—সামনে একটা ছোট্ট নদী রয়েছে। আমাদের সঙ্গে ছোট্টুলাল গিয়েছিল, সে বললে, নদীটার নাম জংলি।

সবাই বেশ খুশি, কেবল আমার মেজাজটাই বিগড়ে ছিল একটু। মানে, ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। চা জিনিসটা খেতে ভালো, আমি ভেবেছিলুম চায়ের পাতা খেতেও বেশ খাসা লাগবে। বাগান থেকে একমুঠো কাঁচা পাতা ছিড়ে চুপি-চুপি মুখেও দিয়েছিলুম। মাগো—কী যাচ্ছেতাই খেতে। আর সেই থেকে মুখে এমন একটা বদখত স্বাদ লেগে ছিল যে নিজেকে কেমন ছাগল-ছাগল মনে হচ্ছিল—যেন একটু আগেই কতগুলো কচি ঘাস চিবিয়ে এসেছি!

তার মধ্যে আবার নদীর ধারে দাঁড়িয়ে টেনিদা বাজখাঁই গলায় গান ধরলে :

এমনি চাঁদিনি রাতে সাধ হয় উড়ে যাই,—
কিন্তু ভাই বড় দুঃখ আমার যে পাখা নাই—

বলতে যাচ্ছি—এই বিকেলে চাঁদের আলো এল কোত্থেকে, এমন সময় ফস করে ক্যাবলা সুর ধরে দিলে :

তোমার যে ল্যাজ আছে,
তাই দিয়ে ওড়ো ভাই—

টেনিদা ঘুষি পাকিয়ে বললে, তবে রে—

ক্যাবলা টেনে দৌড় লাগাল। টেনিদা তাড়া করল তাকে। আর পরমুহূর্তেই এক গগনভেদী আর্তনাদ।

হাবুল, ছোট্টুলাল আর আমি দেখতে পেলুম। স্বচক্ষেই দেখলুম।

ঘন ঝোপের মধ্য একখানা কদাকার লোমশ হাত বেড়িয়ে এসে খপ করে টেনিদার কাঁধ চেপে ধরল। আর তারপর বেরিয়ে এল আরও কদাকার, আরও ভয়ঙ্কর একখানা মুখ। সে-মুখ মানুষের নয়। ঘন লোমে সে-মুখও ঢাকা—দুটো হিংস্র হলদে চোখ তার জ্বলজ্বল করছে—আর কী নিষ্ঠুর নির্মম হাসি ঝকঝক করছে তার দু-সারি ধারালো দাঁতে।

হাবুল বললে, অরণ্যের বি—বি—বি—

আর বলতে পারল না। আমি বললুম—ভীষিকা, তারপরেই ধপাস করে মাটিতে চোখ বুজে বসে পড়লুম। আর টেনিদার করুণ মর্মান্তিক আর্তনাদে চারদিক কেঁপে উঠল।

০৫. শাখামৃগ কথা

অরণ্যের সেই করাল বিভীষিকার সামনে যখন হাবুল স্তম্ভিত, আমি প্রায় মূৰ্ছিত, ক্যাবলা খানিক দূরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আর টেনিদার গগনভেদী আর্তনাদতখন

তখন আশ্চর্য সাহস ছোট্টলালের। মাটি থেকে একটা শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিয়ে সে ছুটল সেই ভীষণ জন্তুটার দিকে : ভাগ—ভাগ জলদি।

টেনিদা তো গেছেই—বোধহয় ছোট্টুলালও গেল। আমি দু-চোখের পাতা আরও জোরে চেপে ধরেছি, এমনি সময় কিচকিচ কিচিংকাচুং বলেই একটা অদ্ভুত আওয়াজ, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবলার অট্টহাসি।

চমকে তাকিয়ে দেখি, বনের সেই বিভীষিকা টেনিদার ঘাড় ছেড়ে দিয়ে লাফে লাফে সামনের একটা উঁচু শিমুল ডালে উঠে যাচ্ছে। আর ছোট্টলাল শুকনো ডালটা উচিয়ে তাকে ডেকে বলছে : আও—আও—ভাগতা কেঁও। মারকে মারকে তেরি হাড্ডি হাম পটক দেব–হুঁ:!

কিন্তু হাড্ডি পটকাবার জন্যে সে আর গাছ থেকে নামবে বলে মনে হল না। বরং গাছের উপর থেকে তার দলের আরও পাঁচ-সাতজন দাঁত খিঁচিয়ে বললে, কিঁচ-কিঁচ কাঁচালঙ্কা–কিঞ্চিৎ–

এখনও কি ব্যাপারটা বলে দিতে হবে? ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা আর কিছু নয়, একটা গোদা বানর।

ক্যাবলা তখনও হাসছে। বললে, টেনিদা–ছ্যা-ছ্যা! পটলডাঙার ছেলে হয়ে একটা বানরের ভয়ে তুমি ভিরমি গেলে!

টেনিদা মুখ ভেংচে বললে, থাম—থাম-বেশি চালিয়াতি করতে হবে না। কী করে বুঝব যে ওটা বানর? খামকা জঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে বিচ্ছিরি মুখ করে অমন করে ঘাড়টা খিমচে দিলে কার ভালো লাগে বল দিকি?

আমি বেশ কায়দা করে বললুম, আমি আর হাবলা তো দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম যে ওটা বানর। তাই আমরা হাসছিলুম।

হাবুল বললে, হ-হ। আমরা খুবই হাসতে আছিলাম।

ছোট্টুলালই গোলমাল করে দিলে। বললে, কাঁহা হাঁসতে ছিলেন? আপলোগ তো ডর খাকে একদম ভূঁইপর বৈঠে গেলেন!

টেনিদা বললে, মরুক-গে, আর ভালো লাগছে না। মেজাজ-টেজাজ সব খিঁচড়ে গেছে। দিব্যি বিকেল বেলায় গান-টান গাইছিলুম, কোত্থেকে বিটকেল একটা গোদা বানর এসে দিলে মাটি করে।

ছোট্টুলাল বললে, আপ অত চিল্লালেন কেন? বান্দরকে কষিয়ে এক থাপ্পড় লাগিয়ে দিতেন—উসকো বদন বিগড়াইয়ে যেত–হঃ!

—তার আগে ও আমারই বদন বিগড়ে দিত! বাপরে কী দাঁত! নে বাপু, এখন বাড়ি চল। বাঁদরের পাল্লায় পড়ে পেটের খিদে বড্ড চাগিয়ে উঠেছে কিছু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক।

শিমুল গাছের উপর বানরগুলো তখনও কিচির-মিচির করছিল। ছোট্টলাল শুকনো ডালটা তাদের দেখিয়ে বললে, আও—একদফা উতার আও! এইসা মারেগা কি

উত্তরে পটাপট করে কয়েকটা শুকনো শিমুলের ফল ছুটে এল। আমি আঁই আঁই আঁই করে মাথাটা সরিয়ে না নিলে একটা ঠিক আমার নাকে এসে লাগত।

হাবুল সেন বললে, শূন্য থিক্যা গোলাবর্ষণ করতাছে—পাইরা উঠবা না! অখনি ধরাশায়ী কইর‍্যা দিব সক্কলরে।

বলতে বলতে—ঠকাস! ঠিক তাক-মাফিক একটা শিমুলের ফল এসে লেগেছে ছোটুলালের মাথায়! এ

দাঃদ্দা বলেসে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল—আর তক্ষুনি ফলটা ফেটে চৌচির হয়ে শিমুল তুলো উড়তে লাগল চারিদিকে।

ছোটুলালের সব বীরত্ব উবে গেছে তখন। বহুৎ বদমাস বান্দর—বলেই সে প্রাণপণে ছুট লাগাল। বলা বাহুল্য, আমরাও কি আর দাঁড়াই? পাঁচজনে মিলে অ্যাঁয়সা স্পিডে ছুটলাম যে অলিম্পিক রেকর্ড কোথায় লাগে তার কাছে! গাছের উপর থেকে বানরদের জয়ধ্বনি শোনা যেতে লাগল—পলাতক শত্রুদের ওরা যেন বলছে—দুয়ো, দুয়ো!

কুট্টিমামার কোয়ার্টারে ফিরে মন-মেজাজ যাচ্ছেতাই হয়ে গেল।

পটলডাঙার চারমূর্তি আমরা—কোনও কিছু আমাদের দমাতে পারে না—শেষকালে কিনা একদল বানর আমাদের বিধ্বস্ত করে দিলে! ছ্যা-ছ্যা!

প্লেট-ভর্তি হালুয়ায় একটা খাবলা বসিয়ে টেনিদা বললে, কী রকম খামকা বাঁদরগুলো আমাদের ইনসাল্ট করলে বল দিকি!

ক্যাবলা বললে, অসহ্য অপমান!

আমি বললুম, এর প্রতিকার করতে হবে!

হাবুল বললে, হ, অবশ্যই প্রতিশোধ লইতে হইব।

টেনিদা বললে, যা বলেছিস—নির্মম প্রতিশোধ নেওয়া দরকার।—বলেই আমার হালুয়ার প্লেট ধরে এক টান।

আমি হাঁ-হাঁ করে উঠলুম, তা আমার প্লেট ধরে টানাটানি কেন? আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাও নাকি?

—মেলা বকিসনি। টেনিদা থাবা দিয়ে আমার প্লেটের অর্ধেক হালুয়া তুলে নিলে : তোর ভালোর জন্যেই নিচ্ছি। অত খেয়ে তুই হজম করতে পারবি না—যা পেটরোগা!

—আর তুমি পেটমোটা হয়েই বা কী কীর্তিটা করলে শুনি?—আমার রাগ হয়ে গেল—একটা বানরের ভয়ে একদম মূর্ছা যাচ্ছিলে!

—কী বললি?—বলে টেনিদা আমাকে একটা চাঁটি মারতে যাচ্ছিল, কিন্তু ক্যাবলা হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে এমন চেঁচিয়ে উঠল যে থমকে গেল টেনিদা।

ক্যাবলা বললে, টেনিদা, সর্বনাশ হয়ে গেল!

—কিসের সর্বনাশ রে?

—বানরটা তোমার ঘাড়ে আঁচড়ে দেয়নি তো?

—দিয়েছে বোধহয় একটু।—টেনিদা ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে বললে, সে কিছু -সামান্য একটুখানি নখের আঁচড়। তা কী হয়েছে?

ক্যাবলা মুখটাকে প্যাঁচার মতন করে বললে, দিয়েছে তো একটু আঁচড়! বাস—আর দেখতে হবে না।

টেনিদার গলায় হালুয়ার তাল আটকে গেল।

—কী দেখতে হবে না? অমন করছিস কেন?

ক্যাবলা মোটা গলায় জিজ্ঞেস করলে, কুকুরে কামড়ালে কী হয়?

হাবুল দারুণ উৎসাহে বললে, কী আবার হইব? জলাতঙ্ক।

টেনিদার মুখখানা কুঁকড়ে-টুকড়ে কি রকম যেন হয়ে গেল। ঠিক একতাল হালুয়ার মতো হয়ে গেল বলা চলে।

—কিন্তু আমাকে তো কুকুরে কামড়ায়নি। আর, মাত্র একটু আঁচড়ে দিয়েছে তাতে—

এইবার আমি কায়দা পেয়ে বললুম, যা হবার ওতেই হবে—দেখে নিয়ো।

—কী হবে? টেনিদার হালুয়ার মতো মুখটা এবার ডিমের ডালনার মতো হয়ে গেল।

ক্যাবলা খুব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললে, কেন, প্রেমেন মিত্তিরের গল্প পড়োনি? হবে স্থলাতঙ্ক।

—অ্যাঁ।

—তারপর তুমি আর মাটিতে থাকতে পারবে না। বানরের মতো কিচমিচ আওয়াজ করবে—

আমি বললুম, এক লাফে গাছে উঠে পড়বে—

হাবুল সেন বললে, আর গাছের ডালে বইস্যা বইস্যা কচি-কচি পাতা ছিড়া ছিড়া খাইবা।

টেনিদা হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল : আর বলিসনি—সত্যি আর বলিসনি। আমি বেজায় নাভার্স হয়ে যাচ্ছি। ঠিক কেঁদে ফেলব বলে দিলুম।

বোধহয় কেঁদেও ফেলত—হঠাৎ কুট্টিমামা এসে গেলেন।

—কী হয়েছে রে? এত গণ্ডগোল কেন?

—মামা, আমার স্থলাতঙ্ক হবে—টেনিদা আর্তনাদ করে উঠল।

—স্থলাতঙ্ক! তার মানে?-কুট্টিমামার চোখ কপালে চড়ে গেল।

আমরা সমস্বরে ব্যাপারটা যে কী তা বোঝাতে আরম্ভ করলুম। শুনে কুট্টিমামা হেসেই অস্থির। বললেন, ভয় নেই, কিছু হবে না। একটু আইডিন লাগিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

শুনে টেনিদার সে কী হাসি! বত্রিশটা দাঁতই বেরিয়ে গেল যেন।

—তা কি আর আমি জানি না মামা। এই প্যালারামকেই একটু ঘাবড়ে দিচ্ছিলুম কেবল।

চালিয়াতিটা দেখলে একবার?

০৬. বড় বেড়ালের আবির্ভাব

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেলে আমরা বারান্দায় এসে বসলুম। আকাশ আলো করে চাঁদ উঠেছে। চায়ের বাগান, দূরের শালবন, আরও দূরের পাহাড় যেন দুধে স্নান করছে। ঝিরঝিরে মিষ্টি হওয়ায় জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর। খাওয়াটাও হয়েছে দারুণ। আমার ইচ্ছে করছিল গিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ি। কিন্তু কুট্টিমামা গল্পের থলি খুলে বসেছেন—সে-লোভও সামলানো শক্ত।

আমরা তিনজনে তিনটে চেয়ারে বসেছি। একখানা ছোট তক্তোপোশে আধশোয়া হয়ে আছেন কুট্টিমামা। সামনে গড়গড়া রয়েছে, গুড়গুড় করে টানছেন আর গল্প বলছেন।

সেই অনেক কাল আগের কথা। জঙ্গল, কেটে সবে চায়ের বাগান হয়েছে। বড় বড় পাইথন, বাঘ আর ভালুকের রাজত্ব। কালাজ্বর, আমাশা, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া এসব লেগেই আছে। বাগানে কুলি রাখা শক্ত—দুদিন পরে কে কোথায় পালিয়ে যায় তার আর ঠিক-ঠিকানা থাকে না। কুলিদের আর কী দোষ—প্রাণের মায়া তো সকলেরই আছে।

তখন কুট্টিমামার বাবা এই বাগানে কাজ করতেন। পাকা রাস্তা ছিল না—ষোলো মাইল দূরের রেল স্টেশন থেকে গোরুর গাড়ি করে আসতে হত। বাঘ-ভালুকের সঙ্গে দেখা হত হামেশা। কুট্টিমামা তখন খুব ছোট্ট কত জন্তু-জানোয়ার দেখেছেন কতবার।

তারই একদিনের গল্প।

সেবার কুট্টিমামা আর ওঁর বাবা নেমেছেন রেল থেকে—বিকেলের গাড়িতে। সময়টা শীতকাল। একটু পরেই অন্ধকার নেমে এল। কাঁচা রাস্তা দিয়ে গোরুর গাড়ি দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে। দুপাশে ঘন অন্ধকার শাল-শিমুলের বন। কুট্টিমামা চুপচাপ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন, জঙ্গলের মধ্যে থোকা থোকা জোনাক জ্বলছে। অনেক দূরে পাহাড়ের গায়ে হাতির ডাক-হরিণ ডেকে উঠছে মধ্যে মধ্যে গাড়ির সামনে দিয়ে ছুটে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে খরগোশ। ঝিঁঝির আওয়াজ উঠছে একটানা—ঘুমের ভেতর গাছের ডালে কুঁক কুঁক করছে বনমুরগি।

দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন কুট্টিমামা। টুকটক করে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

গাড়ি থেমে দাঁড়িয়েছে। শালবনের ভেতর দিয়ে সেদিনও অনেকখানি চাঁদের আলো পড়েছে বনের রাস্তায়। সেই চাঁদের আলোয় আর বনের ছায়ায়—

কুট্টিমামা যা দেখলেন তাতে তাঁর দাঁতকপাটি লেগে গেল।

গোরুর গাড়ি থেকে মাত্র হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে এক বিকট মূর্তি। কুচকুচে কালো লোমে তার শরীর ভরা বুকে কলারের মতো একটা শাদা দাগ। হিংসায় তার চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলছে। মুখটা খোলা—দু'সারি দাঁত যেন সারি সারি ছুরির ফলার মতো সাজানো। আলিঙ্গন করবার ভঙ্গিতে হাত দুখানা দুপাশে বাড়িয়ে অল্প টলতে টলতে এগিয়ে আসছে সে।

ভালুক!

ভালুক বলে কথা নয়। এদিকের জঙ্গলে ছোটখাটো ভালুক কিছু আছেই। কিন্তু মানুষ দেখলে তারা প্রায়ই বিশেষ কিছু বলে না—মানে মানে নিজেরাই সরে যায়। কিন্তু এ তো তা নয়! অদ্ভুত বড়—অস্বাভাবিক রকমের বিরাট! আর কী তার চোখ কী দৃষ্টি সেই চোখে! সাক্ষাৎ নরখাদক দানবের চেহারা!

গোরু দুটোর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। ছটফট করছে—একটা বিচিত্র আওয়াজ বেরুচ্ছে তাদের গলা দিয়ে।

কুট্টিমামার বাবাও দারুণ ভয় পেয়েছেন। সঙ্গে বন্দুক নেই। ফিসফিস করে বললেন, এখন কী হবে?

নেপালী গাড়োয়ান বীর বাহাদুর একটু চুপ করে থেকে বললে, কিছু ভাববেন না বাবু, আমি ব্যবস্থা করছি।

ফস করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল বীর বাহাদুর। ভালুক তখন পাঁচ-সাত হাতের মধ্যে এসে পড়েছে। কুট্টিমামা ভাবলেন, এইবার গেছে বীর বাহাদুর। ভালুক এখুনি দুহাতে ওকে বুকে জাপটে ধরবে। আর যা চেহারা ভালুকের। একটি চাপে সমস্ত হাড়-পাঁজরা একেবারে গুঁড়ো করে দেবে। ভালুকরা অমনি করেই মানুষ মারে কিনা!

কিন্তু নেপালীর বাচ্চা বীর বাহাদুর—এ-সব জিনিসের অন্ধিসন্ধি সে জানে। চট করে গাড়ির তলা থেকে একরাশ খড় বের করে আনল, তারপর দেশলাই ধরিয়ে দিতেই খড়গুলো মশালের মতো দাউদাউ করে জ্বলে উঠল।

আর সেই জ্বলন্ত খড়ের আঁটি নিয়ে সে এগিয়ে গেল ভালুকের দিকে।

আগুন দেখে ভালুক থমকে গেল। তারপর বীর বাহাদুর আর-এক পা সামনে বাড়াতেই সব বীরত্ব কোথায় উবে গেল তার! অতবড় পেল্লায় জানোয়ার চার পায়ে একেবারে চোঁ-চোঁ দৌড়—বোধহয় সোজা পাহাড়ে পৌঁছে তবে থামল।

কুট্টিমামার গল্প শুনে আমরা ভীষণ খুশি।

টেনিদা বললে, মামা, আমাদের কিন্তু শিকারে নিয়ে যেতে হবে।

কুট্টিমামা বললেন, যে-সব বীরপুরুষ, বাঘের ডাক শুনলেই—

হাবুল সেন বললে, না মামা, ভয় পামু না। আমরাও বাঘেরে ডাকতে থাকুম।

ডাইক্যা কমু—আইসো বাঘচন্দর, তোমার লগে দুইটা গল্পসল্প করি।

ক্যাবলা বললে, আর বাঘও অমনি হাবুলের পাশে বসে গলা জড়িয়ে ধরে গল্প আরম্ভ করে দেবে।

তখন আমি বললুম, আর মধ্যে-মধ্যে হাবলাকে আলুকাবলি আর কাজুবাদাম খেতে দেবে।

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, কী যে বাজে বকবক করিস তোরা—একদম ভালো লাগে না। হচ্ছে একটা দরকারি কথা-খামকা ফাজলামি জুড়ে দিয়েছে।

কুট্টিমামা হাই তুলে বললেন, আচ্ছা, সে হবে-এখন। এখন যাও শুয়ে পড় গে সবাই। কালকে ভাবা যাবে এসব।

টেনিদা, হাবুল আর কুট্টিমামা শুয়েছেন বড় ঘরে। এ-পাশের ছোট ঘরটায় আমি আর ক্যাবলা।

বিছানায় শুয়েই কুর-কুর করে ক্যাবলার নাক ডাকছে। কিন্তু অচেনা জায়গায় এত সহজেই আমার ঘুম আসে না। মাথার কাছে টিপয়ের উপর একটা ছোট্ট নীল টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। আমি ল্যাম্পটাকে একেবারে বালিশের পাশে টেনে আনলুম। তারপর সুটকেস খুলে শিবরামের নতুন হাসির বই জুতো নিয়ে জুতোজুতি আরাম করে পড়তে লেগে গেলুম।

পড়ছি আর নিজের মনে হাসছি। পাশেই খোলা জানালা দিয়ে মিঠে হাওয়া আসছে। দুধের মতো জ্যোৎস্নায় স্নান করছে চায়ের বাগান আর পাহাড়ের বন। কতক্ষণ সময় কেটেছে। জানি না। হাসতে হাসতে এক সময় মনে হল, জানালার গায়ে যেন খড়খড় করে আওয়াজ হচ্ছে।

তাকিয়ে দেখি, একটা বেশ বড়সড় বেড়াল। জানালার ওপর উঠে বসেছে—আর জ্বলজ্বল করে তাকাচ্ছে আমার দিকে।

বললুম, যাঃ—যাঃ—পালা—

পালাল না। বললে, গর্—র্—র্–

তখন আমার ভালো করে চোখে পড়ল।

শুধু একটা নয়—তার পাশে আর একটা বেড়াল। সেটার হাঁড়ির মতো প্রকাণ্ড মাথা—ভাঁটার মতো চোখ আর গায়ে ঘন হলদের ওপর কালো ফোঁটা।

এত বড় বেড়াল! আর, এ কেমন বেড়াল!

সেই প্রকাণ্ড বেড়ালটাও বললে, গর্—র্—র্–ঘুঁ!

আর ঘুঁ! আমি তৎক্ষণাৎ আকাশ-ফাটানো চিৎকার করলুম একটা। তারপর ক্যাবলাকে জড়িয়ে ধরে সোজা আছড়ে পড়লুম বিছানা থেকে। টেবিল ল্যাম্পটাও সেইসঙ্গে ভেঙে চুরমার।

আর সেই অথই অন্ধকারের ভেতর—

০৭.

অন্ধকারে দুজনে কুমড়োর মতো গড়াগড়ি খেলুম কিছুক্ষণ। ক্যাবলা যতই বলে, ছাড়—ছাড়—আমি ততই গোঁ-গোঁ করতে থাকি : বা—বা—বা—

এর ভেতরে লণ্ঠন হাতে টেনিদা, হাবলা আর কুট্টিমামা এসে হাজির। ছোটুলালও সেইসঙ্গে।

—কী হল? কী হল?

—আরে ই ক্যা ভৈল বা?

ক্যাবলা তড়াক করে উঠে পড়ে বললে, দেখুন না কুট্টিমামা, ঘুমের ঘরে প্যালাটা আমাকে জাপটে ধরে খাট থেকে নীচে ফেলে দিলে। কিছুতেই ছাড়ে না। খালি বলছে : বা—বা—বা—

বা—বা—বা?—টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, তার মানে, বাঃ—বেশ মজার খেলা হচ্ছে! এই প্যালাটাকে নিয়ে সব সময় একা কেলেঙ্কারি হবে! ওর গাধার মতো লম্বা কান দুটোকে ইস্ক্রুপের মতো পেঁচিয়ে দিলে তবে ঠিক হয়। এই প্যালা, এই গাড়লরাম উঠে পড় বলছি—

আমি কি উঠি নাকি অত সহজে? ক্যাবলার পাশেই তো সেই একজোড়া বড় বেড়াল বসে আছে।

চোখ বুজেই বলি, ওই জা—জা—জা—

হাবুল বললে, কারে যাইতে কস? কেডা যাইব?

বললুম, জা—নালায়!

হাবুল বিচ্ছিরি চটে গেল। বললে, কী, আমি নালায় যামু? ক্যান, আমি নালায় যামু ক্যান? তর ইচ্ছা হইলে তুই যা—নালায় যা, নর্দমায় যা—-গোবরের গাদায় যা—

আমি তেমনি চোখ বুজে বললুম, দুত্তোর! জানালায় তা—তাকিয়ে দ্যাখো না একবার! বা—বাঘ বসে আছে ওখানে।

—অ্যাঁ, জানালায় বাঘ! বলেই টেনিদা লাফ দিয়ে প্রায় হাবুলের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল।

হাবুল বললে, ইঃ-খাইছে, খাইছে!

কুট্টিমামা হেসে উঠলেন।

—জানালায় বাঘ? এই বাগানের ভেতর? ঘুমের ঘোরে তুমি স্বপ্ন দেখেছ প্যালারাম।

ক্যবলা খিকখিক করে হাসতে লাগল, হাবুল খ্যাখ্যা করে হাসতে লাগল, টেনিদা খ্যাঁচর-খ্যাঁচর করে হেসে চলল। আর পেট চেপে ধরে খৌ-খৌ করে সবচেয়ে বেশি করে হাসতে লাগল ছোটুলাল।

—খৌ—খো—খৌ! আরে খৌ—খৌ-বাঘ কাঁহাসে আসবে! বাঘের মাসি এসেছিল হোবে— খৌ —খৌ—খৌ-! কী খুশি সবাই, আর কী হাসির ধুম! যেন আমাকে পাগল পেয়েছে ওরা!

রাগে গা জ্বলে গেল, আমি উঠে বসলুম।

—চলে গেছে কিনা, তাই সবাই হাসছে। যদি দেখতে—

টেনিদা বললে, আমিও তো দেখেছিলুম। এই একটু আগেই। দুটো গণ্ডার আর তিনটে জলহস্তী আমার দিকে তেড়ে আসছিল। আমি এক ঘুষিতে একটা গণ্ডারকে মেরে ফেললুম—দুই চড়ে দুটো জলহস্তী কাত হয়ে গেল। বাকি দুটো ল্যাজ তুলে পাঁই-পাঁই করে দৌড়ে পালাল। অবিশ্যি স্বপ্নে।

আবার হাসি। ছোটুলাল তো প্রায় নাচতে লাগল। আমার এত রাগ হল যে ইচ্ছে করতে লাগল ছোটুলালের ঠ্যাঙে ল্যাং মেরে মাটিতে ফেলে দিই কিংবা ওর কানের ভেতরে কতগুলো লাল পিঁপড়ে ঢেলে দিই।

কুট্টিমামা বললেন, থামো—থামো। সবটা ওকে বলতে দাও। আচ্ছা প্যালারাম, তুমি তো ঘুমুচ্ছিলে?

-মোটেই না। আমি শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ছিলুম।

—তারপরে?

—জানালায় একটা গর আওয়াজ। তাকিয়ে দেখি—

বলতে বলতে আমি থেমে গেলুম। বুকের ভেতর দুরুদুরু করে উঠল।

—কী দেখলে?

—প্রথমে একটা বাচ্চা বড়সড় বেড়ালের মতো দেখতে। তারপরে আর একটা। জালার মতো মাথা-ভাঁটার মতো চোখ, কাঁটার মতো গোঁফ—

ক্যাবলা বললে, ধামার মতো পিলে—

টেনিদা বললে, শিঙিমাছের মতো শিং—

হাবুল জুড়ে দিলে, আর পটোলের মতন দাঁত—

বুঝতে পারছ তো? আমার সেই পালা-জ্বরের পিলে আর পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোলকে ঠাট্টা করা হচ্ছে।

শুনে কুট্টিমামা পর্যন্ত মুচকে মুচকে হাসলেন, আর খোঁয়া—খোঁ-খোঁ বলে আবার নাচতে শুরু করে দিলে ছোট্টুলাল।

ভাবছি ছোট্টুলালকে এবার সত্যিই ঘ্যাঁচ করে একখানা ল্যাং মেরে দেব যা থাকে কপালে, এমন সময় টেনিদা বললে, না কুট্টিমামা, প্যালাকে আর এখানে রাখতে ভরসা হচ্ছে না!

ক্যাবলা বললে, ঠিক। বাঘের কথা শুনেই যেমন করছে, তাতে তো—

হাবুল বললে, বাঘ একখান চক্ষের সামনে দেখলে ভয়েই মইরা যাইব নে।

টেনিদা বললে, কালই ওকে প্লেনে তুলে দেওয়া যাক।

ক্যাবলা বললে, বেয়ারিং পোস্টে।

হাবুল বললে একটা বস্তার মইধ্যে কইর‍্যা তুইল্যা দিলেই হইব—পয়সা লাগব না।

অপমানে আমার কান কটকট করতে লাগল, খালি মনে হতে লাগল নাকের ডগায় কতগুলো উচ্চিংড়ে লাফাচ্ছে। কিন্তু এদের কোনও কথা বলে লাভ নেই—এরা বিশ্বাস করবে না। আমি রেগে গোঁজ হয়ে বসে রইলুম।

কুট্টিমামা বললেন, যাও—যাও, সব শুয়ে পড় এখন। আর রাত জেগে শরীর খারাপ করে লাভ নেই।

আমি শেষবার বলতে চেষ্টা করলুম : আপনারা বিশ্বাস করছেন না—

টেনিদা ভেংচি কেটে বললে, ঝা—যা খুব হয়েছে। আর ওস্তাদি করতে হবে না তোকে! রাক্ষসের মতো খাবি আর শেষে পেট-গরম হয়ে উল্টুম-ধুল্টুম স্বপ্ন দেখবি! দরজা-জানালা বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে পড়। কাল ভোরের প্লেনে যদি তোকে কলকাতায় চালান না করি তো—

দাঁত বের করে আরও কী সব বলতে যাচ্ছিল, ঠিক এমনি সময় একটা বিকট হইহই চিৎকার। সেটা এল কুলি লাইনের দিক থেকে। তারপরেই জোর টিন-পেটানোর আওয়াজ।

আমরা সবাই ভীষণভাবে চমকে উঠলুম। সবচাইতে বেশি করে চমকালেন কুট্টিমামা।

—ও কী! ও আওয়াজ কেন?

চিৎকারটা আরও জোরালো হয়ে উঠল। আকাশ ফেটে যেতে লাগল টিন-পেটানোর শব্দে! তারপরেই কে একজন ছুটতে ছুটতে এসে বাইরে থেকে হাঁক পাড়ল : বাবু-ছোট ম্যানেজারবাবু—

ছোট্টলাল দরজা খুলে দিলে। দেখা গেল, লণ্ঠন হাতে কুলিদের একজন সর্দার।

কুট্টিমামা বললেন, কী হয়েছে রে? অমন চেঁচামেচি করছিস কেন?

—কুলি-লাইনে বাঘ এসেছিল বাবু!

বাঘ!

ঘরে যেন বাজ পড়ল। আর দেখি—সবাই যেন হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আর ছোট্টলালের চোখ দুটো একেবারে গোল গোল হয়ে গেছে—টিকিটা খাড়া হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে।

এইবারে জুত পেয়ে আমি বললুম, কেমন বাপু ছোট্টলাল—আভি খৌয়া-খৌয়া করকে হাসছ না কেন?

কুলি-সর্দার বললে, একটা চিতা, সঙ্গে বাচ্চাও ছিল। একটা গোরুকে জখম করেছে আর একটা ছাগল মেরে নিয়ে পালিয়েছে।

কারও মুখে আর কথাটি নেই।

আর—তক্ষুনি আমি ঘর কাঁপিয়ে হাসতে শুরু করলুম। সেই হাসির আওয়াজে টেনিদা লাফিয়ে হাবুলের ঘাড়ের উপর পড়ল হাবুল গিয়ে পড়ল ছোটুলালের গায়ে, আর—আঁই দাদা বলে চিৎকার ছেড়ে একেবারে চিৎপাত হল ছোট্টুলাল।

০৮.

কুট্টিমামা বললেন, তাই তো! আবার চিতাবাঘের উৎপাত শুরু হল।

সর্দার বললে, ওদিকের জঙ্গলে বাঘ বড় বেড়ে গেছে বাবু। মাসখানেক ধরেই আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল। এখন একেবারে বাগানে ঢুকে পড়েছে। আর আসতে যখন শুরু করেছে। তখন সহজে ছাড়বে না!

কুট্টিমামা মাথা নেড়ে বললেন, দু-একটা মারলে চলছে না। আচ্ছা, এখন যাও। দেখি কাল সকালে কী করা যায়।

সর্দার চলে গেল। কুট্টিমামা বললেন, তোমরাও সব শুয়ে পড় গে। আর প্যালারাম—এবার ভালো করে জানালা বন্ধ করে দিয়ো।

আমরা সব চুপচাপ চলে এলুম। হাবুলের বকবকানি, টেনিদার চালিয়াতি আর ফুট-কাটা একদম বন্ধ। সব একেবারে স্পিকটি নট। আর ছোট্টলাল? সে তো তক্ষুনি—আঁই দাদা হো—বলে একটা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

খড়খড়ি আর কাচের জানালা দুটোই বন্ধ করে দিতে যাচ্ছি, ক্যাবলা বললে, খড়খড়িটা খুলে রাখ না প্যালা! বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ দেখা যাবে। কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে রে!

আমি দাঁত-মুখ খুব বিচ্ছিরি করে বললুম, থাক—আর পারকিতিক দিরিশ্যি দেখে দরকার নেই! চাঁদের আলোয় খুশি হয়ে বাঘ এসে যদি জানালার বাইরে দাঁত খিঁচোয়?

—আমরাও বাঘকে ভেংচে দেব।

—আর যদি জানালা ভেঙে ঢোকে?

—আমরা দরজা ভেঙে পালিয়ে যাব!

দেখেছ ইয়ার্কিটা একবার! বাঘ যেন আমাদের পটলডাঙার একাদশী কুণ্ডু—পেছন থেকে 'হাঁড়ি ফাটল' 'হাঁড়ি ফাটল' বলে চেঁচিয়ে চটিয়ে দিলেই হল!

বললুম, বেশি ফেরেব্বাজি করিসনে ক্যাবলা, ঘুমো। —বলে আমি দুটো জানালাই শক্ত করে এঁটে দিলুম। ঘুমোতে চেষ্টা করছি কিন্তু ঘুম কি ছাই আসে? খালি বন্ধ জানালায় চোখ পড়ছে। এই মনে হচ্ছে বাইরের খড়খড়ি কেউ কড়কড় করে আঁচড়াচ্ছে, আবার যেন শুনছি ঘাসের উপর দিয়ে কী সব হাঁটছে—হুমহাম করে কী একটা ডেকেও উঠল। এদিকে আবার নাকের ডগায় দু-তিনটে মশা বিন-বিন করছে। ক্যাবলাটা তো দেখতে-না-দেখতেই ঘুমিয়ে পড়ল। আমি কী করি? মশারি একটা আছে—ফেলে দেব? কিন্তু মশারির ভেতরে আমি একদম শুতে পারি না—কেমন দম আটকে আসে।

তা হলে মশাই মারি—কী আর করা? কিন্তু চেষ্টা করে দেখলুম, কিছুতেই মারা যায় না। নাকের ওপর চাঁটি হাঁকড়েছি তো কানের কাছে গিয়ে পোঁ করে উঠল। আবার কণটি প্রদেশ আক্রমণ করেছি তো শত্রুবাহিনী নাসিকে এসে উপস্থিত। কাঁহাতক পেরে ওঠা যায়? আধঘণ্টা ধরে নিজেকে সমানে চাঁটিয়ে এবং ঘুষিয়ে—শেষতক হাল ছেড়ে দিলুম। বললুম, যাও না বাপুজঙ্গলে যাও না! বাঘ আছে-হাতি আছে, অনেক রক্ত আছে তাদের গায়ে। যত খুশি খাও গে! আমি পটলডাঙার প্যালারাম—সবে পালা-জ্বরের পিলেটা সেরেছে—আমার রক্তে আর কী পাবে? খানিক পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল বই তো নয়!

যেই বলেছি—অমনি কী কাণ্ড!

হুড়মুড়িয়ে জানালাটা ভেঙে পড়ল। আর কী সর্বনাশ! বাইরে বাইরে যে একটা হাতি! পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড-জমাট অন্ধকার দিয়ে তৈরি তার শরীর! দুটো কুতকুতে চোখে আমার দিকে খানিক তাকিয়েই কেমন যেন মিটমিট করে হাসল। তারপরেই করেছে কী—হাত-দশেক লম্বা একটা গুঁড় বাড়িয়ে কপাৎ করে আমার

একটা লম্বা কান টেনে ধরেছে।

এতক্ষণ তো আমি পান্তুয়ার মতো পড়ে আছি কিন্তু এবার আত্মারাম প্রায় খাঁচাছাড়া! বাপ-রে–মা-রে-মেজদা রে—পটলডাঙা রে–বলে রাম-চিৎকার ছেড়েছি।

আর তক্ষুনি কানের কাছে ক্যাবলা বললে, কী আরম্ভ করেছিস প্যালা? ভিতুর ডিম কোথাকার!

বললুম, হা-হা-হাতি!

ক্যাবলা বললে, গোদা পায়ের লাথি!

চমকে চোখ মেলে চাইলুম। কোথায় হাতি—কোথায় কী। ঘরভর্তি ঝকঝকে সকালের আলো। আর ক্যাবলা কোত্থেকে একটা পাখির পালক কুড়িয়ে এনে আমার কানের ভেতর দিতে চেষ্টা করছে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। আর পালকটা আমার কানে ঢোকাতে না পেরে ভারি ব্যাজার হল ক্যাবলা। বললে, কোথায় রে তোর হা-হা-হাতি? স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি?

–বকিসনি! আমার কানে পালক দিচ্ছিলি কেন?

—তোকে জাগাবার জন্যে। কিন্তু পারলুম কই? তার আগেই তো জেগে গেলি—ইস্টুপিড কোথাকার!

—মারব এক থাপ্পড় বলে আমি রেগেমেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম।

সকালের চা এবং সেইসঙ্গে লুচি-আলুভাজা-রসগোল্লার 'টা' বেশ ভালোই হল তারপর কুট্টিমামা চলে গেলেন ফ্যাক্টরিতে। আমাদের বলে গেলেন, তোমরা বাগানের ভেতর ঘুরে বেড়াও—ভয়ের কিছু নেই। তবে জঙ্গলের দিকে যেয়ো না। চিতাবাঘের উৎপাত যখন শুরু হয়েছে, তখন সাবধান থাকাই ভাল।

টেনিদা বললে, হেঃ–বাঘ! জানো কুট্টিমামা—রাত্তিরেই কেমন একটু বেকায়দা হয়ে যায়। কিন্তু দিনের বেলায় বাঘ একবার আসুক না সামনে! এমন একখানা আন্ডারকাট বসিয়ে দেব–

হাবুল বললে, আপনার কালীসিঙ্গির মহাভারতের ধিক্যাও জব্বর!

কুট্টিমামা অবাক হয়ে বললেন, আমার কালীসিঙ্গির মহাভারত! তার মানে?

হাবুল সবে বলতে যাচ্ছে; সেই যে মহাভারতের একখানা পেল্লায় ঘাও নি মাইর্যা—

আর বলতে পারল না। তার আগেই টেনিদা ওর পিঠে কটাং করে একটা জবরদস্ত চিমটি কেটে দিয়েছে।

হাবুল হাউ-মাউ করে উঠল : খাইসে, খাইসে। কুট্টিমামা আরও অবাক হয়ে বললেন, খাইছে। কীসে খেল তোমাকে?

—টেনিদা!

টেনিদা তাড়াতাড়ি বললে, না মামা, আমি ওকে খাচ্ছি না। ওটা এত অখাদ্য যে বাঘে খেলেও বমি করে দেবে। ওর পিঠে একটা ডেয়ো পিঁপড়ে কামড়াচ্ছিল, সেটাকে ফেলে দিলুম কেবল। তুমি যাও—নিজের কাজে যাও।

খানিকক্ষণ কেবল বোকা-বোকা হয়ে তাকিয়ে দেখে কুট্টিমামা চলে গেলেন।

টেনিদা এবার হাবুলের মাথায় কুটু করে একটা ছোট্ট গাঁট্টা দিলে। বললে, তোকে ও-সব বলতে আমি বারণ করিনি? জানিসনে—নিজের বীরত্বের কথা বললে কুট্টিমামা লজ্জা পায়?

–আর তোমার সব চালিয়াতি ফাঁস হয়ে যায়! টুক করে কথাটা বলেই ক্যাবলা তিন হাত লাফিয়ে সরে গেল। টেনিদা একটা চাঁটি হাঁকিয়েছিল, সেটা হাওয়ায় ঘুরে এল।

যাই হোক, আমরা চার মূর্তি তো বাগানে বেরিয়ে পড়লুম। চমৎকার সকাল, মিঠে রোদ্দুর, প্রাণজুড়োনো হাওয়া। দোয়েল শিস দিচ্ছে, বুলবুলি নেচে বেড়াচ্ছে। মাথার ওপর শিরিষ পাতার ঝিরিঝিরি। ঝুড়ি কাঁধে কুলি মেয়েরা টুকটুক করে পাতি তুলছে—বেশ লাগছে দেখতে।

পাতি তোলা দেখতে দেখতে কখন আমি দলছাড়া হয়ে অন্য দিকে চলে গেছি টেরই পাইনি। যখন খেয়াল হল, দেখি বাগানের বাইরে চলে এসেছি। সামনে মাঠ—তাতে কতগুলো এলোমেলো ঝোপ আর পাঁচ-সাতটা গাছ একসঙ্গে ঝাঁকড়া হয়ে দাঁড়িয়ে। আরও তাকিয়ে দেখি কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই।

কী সর্বনাশ—বাঘের মুখে পড়ব নাকি?

কিন্তু এখানে বাঘ! এমন সুন্দর রোদ্দুরে! এমনি চমৎকার সকালে! ধেৎ! আর গাছগুলো যে আমলকীর! কত বড় কী সুন্দর দেখতে! গোছায় গোছায় যেন মণিমুক্তোর মতো ঝুলছে।

নোলায় জল এসে গেল। নিশ্চয় গাছতলায় আমলকী পড়েছে! যাই—গোটাকয়েক কুড়িয়ে আনি। আমলকী দেখে বাঘের ভয়-টয় বেমালুম মুছে গেল মন থেকে।

গেলুম গাছতলায়? ধরেছি ঠিক। বড় বড় পাকা আমলকীতে ছেয়ে আছে মাটি।

বেছে বেছে কয়েকটা কুড়িয়ে নিলুম। তারপর পাশেই একটা সরু মতন লম্বা ডাল পড়ে আছে দেখে-বসলুম তার উপর।

কিন্তু একী! ডালটা যে কেমন রবারের মতো নরম!

আর তৎক্ষণাৎ ফোঁস করে একটা আওয়াজ। ডালটা নড়ে উঠল, বাঁকা হয়ে চলতে শুরু করে দিলে।

অ্যাঁ!

সাপ—অজগর!

বাপ—রে গেছি! তড়াক করে এক লাফে আমি গিয়ে একটা কাঁটা-ঝোপের উপর পড়লুম। আর তক্ষুনি দেখলুম বরফির মতো একটা অদ্ভুত মাথা লকলক করে উঠেছে লম্বা জিভ—আর নতুন নয়া পয়সার মতো দুটো জ্বলজ্বলে চোখ ঠায় তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকেই।

০৯. এ কার কণ্ঠস্বর?

সেই নয়া পয়সার মতো চোখ দুটোর দিকে তাকিয়েই তো আমার হয়ে এসেছে। গল্পে শুনেছি, অজগর সাপ অমনিভাবে চোখের দৃষ্টি দিয়ে নাকি হিপনটাইজ করে ফেলে, তারপর ধীরেসুস্থে এগিয়ে এসে পাকে পাকে জড়িয়ে একেবারে কপাৎ। অতএব হিপনটাইজ করার আগেই ধড়মড়িয়ে উঠে আমি তো টেনে দৌড়। দৌড়ই আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি তাড়া করে আসছে কি না পেছন-পেছন!

না—এল না। এঁকেবেঁকে, সুড়সুড়িয়ে, আস্তে আস্তে নেমে গেল পাশের একটা শুকনো নালার ভেতর।

আধ মাইল দৌড়ে বাগানের মধ্যে এসে যখন থামলুম, তখন আমি আর আমি নেই! এ কোথায় এলুম রে বাবা! কথা নেই বার্তা নেই—কোত্থেকে গোদা বাঁদর এসে খপ করে কাঁধ চেপে ধরে রাত্তিরে জানালার কাছে এসে চিতাবাঘ দাঁত খিঁচিয়ে যায়, আমলকী গাছের তলায় ঘাপটি মেরে ময়াল সাপ বসে থাকে! আফ্রিকার মতো বিপজ্জনক জায়গায় বেড়াতে এলে এমনি দশাই হয়!

থুড়ি—আফ্রিকা নয়। এ নিতান্তই বাংলাদেশ। কিন্তু এমনভাবে রাতদিন প্যাঁচে পড়ে গেলে কারও কি আর কিছু খেয়াল থাকে—তোমরাই বলো। তখন মনে হয় আমার নাম প্যালারাম হতে পারে—গদাইচরণ হতে পারে, কেষ্টদাস হওয়াও অসম্ভব নয়। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা গোবরডাঙা হতে পারে, জিব্রাল্টার হতে পারে—জাঞ্জিবার হলেই বা ঠেকাচ্ছে কে?

দুত্তোর, কিচ্ছুটি ভালো লাগছে না। কেমন উদাস-উদাস হয়ে যাচ্ছি। আর বাঁচব না বলে মনে হচ্ছে। এই আফ্রিকার জঙ্গলে—না-না, আফ্রিকা নয়, এই ম্যাডাগাস্কারের মরুভূমি—দুত্তোর, ম্যাডাগাস্কারও নয়—মানে, এই খুব বিচ্ছিরি জায়গায় আমি নির্ঘাত মারা যাবে। বাঘেই খাক কি সাপেই ফলার করুক।

মারা যাব—এ-কথা মনে হলেই আমার খুব করুণ সুরে গান গাইতে ইচ্ছে করে। বাগেশ্রী-টাগেশ্রী ওই রকম কোনও একটা সুরে। আচ্ছা, বাগেশ্রী না বাঘেশ্রী? বেমক্কা বনের মধ্যে বাঘের ছিরি দেখলে গলা দিয়ে কুঁই কুঁই করে যে-গান বেরোয়—তাকেই বাঘেশ্রী বলে নাকি? খুব সম্ভব। আর বাঘ যখন গম্ভীর সুরে বলে—হালুম, খাম্-খাম—তখন সেই সুরটার নাম বোধহয় খাম্বাজ। তাহলে মল্লার গান কি মল্লরা—মানে পালোয়ানরা কুস্তি করবার সময় গেয়ে থাকে?

কিন্তু মল্লার-ফল্লার চুলোয় যাক। সাপ বাঘের ফলার হওয়ার আগে বরং মনের দুঃখে ঘরে যাওয়াই ভালো। টেনে দৌড় দেওয়ার ধুকপুকুনি একটু থামলে, আমি খুব মিহি গলায় গাইতে লাগলুম :

এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো
সে মরণ স্বরগ সমান—

বেশ আবেগ দিয়ে গাইছি, চোখে জল আসব-আসব করছে, এমন সময় কানের কাছে কে যেন খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে উঠল :

—আরে খেলে যা! এই ভরা রোদ্দুরে চাঁদের আলো পেলি কোথায়?

আর কে? বেয়াক্কেলে ক্যাবলাটা! খুব ভাব এসেছিল, একদম গুলিয়ে দিলে। সাধে কি টেনিদা যখন-তখন চাঁদিতে ওর চাঁটি হাঁকড়ে দেয়।

—গোলমাল করছিস কেন? আমি মারা যাব।

—যা না। কে বারণ করেছে তোকে? বেশ কায়দা করে—যা-ই—বি-দায় বিদায় বলে মরে যা, আমরা তোর শোকসভা করব। কিন্তু খবরদার, ওরকম যাচ্ছেতাই সুরে গান গাইবি না!

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, দ্যাখ ক্যাবলা, বেশি ঠাট্টা করিসনি। জানিস—এক্ষুনি একটা অজগর সাপ

আমাকে প্রায় ধরে খাচ্ছিল?

ক্যাবলা বললে, খাচ্ছিল নাকি? তা খেলে না কেন? তোকে খেয়ে পাছে পালাজ্বর হয় এই ভয়েই ছেড়ে দিলে বুঝি?

—সত্যি বলছি, ইয়া পেল্লায় এক অজগর সাপ—

ক্যাবলা বাধা দিয়ে বললে, বটেই তো। ত্রিশ হাত লম্বা আর সাড়ে চার হাত চওড়া। জানিস আমাকেও এক্ষুনি একটা তিমি মাছ—তা প্রায় পঞ্চাশ হাত হবে—একটা ইঁদুরের গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে কপাৎ করে চেপে ধরে আর-কি! কোনও মতে পালিয়ে বেঁচেছি।

বলে মুখ-ভর্তি শাঁকালুর দোকান দেখিয়ে ক্যাবলার কী হাসি!

—বিশ্বাস হল না—না?

—কেন এলোমেলো বকছিস প্যালা? চালিয়াতি একটু বন্ধ কর এখন। কপালজোরে একটা বাঘ না-হয় দেখেই ফেলেছিস, তাই বলে অজগর-গণ্ডার-হিপোপটেমাস-উড়ুক্কু মাছ সব তুই একাই দেখবি? আমরা দুটো-একটাও দেখতে পাব না? গল্প মারতে হয় পটলডাঙায় চাটুজ্যেদের রোয়াকে গিয়ে যা-খুশি মারিস, এখানে ওসব ইয়ার্কি চলবে না। এখন চল—ওরা সবাই তোকে গোরু-খোঁজা করছে।

বেশ, বলব না। কাউকেই কোনও কথা বলব না আমি। এমনকি কুট্টিমামাকেও না। তারপর কালকে একটা মতলব করে সবাইকে ওই আমলকী গাছের দিকে পাঠিয়ে দেব। তখন বোঝা যাবে নালা থেকে অজগর বেরোয়, না ইঁদুরের গর্ত থেকে পঞ্চাশ হাত তিমি মাছই বেরিয়ে আসে।

সন্ধেবেলায় কুট্টিমামা বললেন, এক-আধটা চিতাবাঘ না মারলে নয়। ভারি উৎপাত শুরু করেছে। আজও বিকেল নাগাদ একটা এসেছিল কুলি লাইনের দিকে। অবিশ্যি কিছু করতে পারেনি। কিন্তু এখন রোজ হাঙ্গামা বাধাবে মনে হচ্ছে।

টেনিদা খুব উৎসাহ করে বললে, তাই করো মামা। গোটা কয়েক ধাঁ করে মেরে ফেলে দাও, আপদ চুকে যায়।

ক্যবলা বললে, তারপর আমরা সবাই মিলে একটা করে বাঘের চামড়া নেব।

হাবুল বললে, আর সেই চামড়া দিয়া জুতা বানাইয়া মচমচাইয়া হাঁইট্যা যামু।

আমি চটেই ছিলুম। সেই অজগরকে নিয়ে ক্যাবলাটা ঠাট্টা করবার পর থেকে আমার মন-মেজাজ এমন খিঁচড়ে রয়েছে যে কী বলব। আমি বললুম, আর কলার খোসায় পা পড়ে ধপাস্ করে আছাড় খামু।

কুট্টিমামা হেসে বললেন, আচ্ছা—আচ্ছা, আগে বাঘ তো মারা যাক, পরের কথা পরে হবে। আজ কয়েকটা টোটা আনতে পাঠিয়েছি শহরে—নিয়ে আসুক, তারপর কাল বিকেলে বেরুব।

—আমরাও যাব তো সঙ্গে ?—ফস করে জিজ্ঞেস করল ক্যাবলা।

শুনেই তো আমার পেটের মধ্যে গুরুগুরিয়ে উঠেছে। আগে যেটুকু বা সাহস ছিল, জানালার পাশে বাঘ এসে দাঁড়াবার পর থেকে সমানে ধুকপুক করছে বুকের ভেতরটা। তারপর ওই বিচ্ছিরি সাপটা। নাঃ, শিকারে গেলে আমাকে আর দেখতে হবে না! পটলডাঙার প্যালারামের কেবল বারোটা নয় সাড়ে দেড়টা বেজে যাবে। বাঁচালেন কুট্টিমামাই।

—সে হরিণ শিকার হলে নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু চিতাবাঘ বড্ড শয়তান। কিছু বিশ্বাস নেই ওদের।

টেনিদাও বোধহয় মওকা খুঁজছিল। বললেন, আমরা তো শিকার করবার জন্যেই এসেছিলুম। কিন্তু কুট্টিমামার অসুবিধে হলে কী আর করা যায়—মনে ব্যথা পেলেও বাংলোতেই বসে থাকব।

ক্যাবলা বললে, সমঝ গিয়া। তোমার ভয় ধরেছে, তাই না যেতে পারলে বাঁচো। ওরা থাকুক মামা—

আমি সঙ্গে যাব।

হাবলা সঙ্গে সঙ্গেই পোঁ ধরলে : হঃ—ক্যাবলা সাহস কইরা যাইতে পারব—আর আমি পারুম না। আমারেও লইতে হইব।

আমার যে কী বিচ্ছিরি স্বভাব—ওদের উৎসাহ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে আমারও দারুণ তেজ। এসে যায়। তখন মনে হয় পালাজ্বর-ফালাজ্বর পিলে-টিলে কিচ্ছু না—আমি সাক্ষাৎ ভীম-ভবানী, এক্ষুনি গরিলার সঙ্গে দমাদম বসিং লড়তে পারি। মনে হয়, মনের দুঃখে মরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না-মরি তো একটা কিছু করেই মরব।

একটু আগেই ভয় ধরে গিয়েছিল, হঠাৎ বুক চিতিয়ে বলে ফেললুম, আমিও যাব—নিশ্চয় যাব!

টেনিদা কেমন করুণ চোখে আমাদের দিকে তাকাল। তারপর ঘাড়-টাড় চুলকে নিয়ে বললে, সবাই যদি যায়—তবে আমিই আর বাদ থাকি কেন?

ক্যাবলা বললে, কিন্তু তুমহারা ডর লাগ গিয়া।

—ডর? হেঁ! আমি পটলডাঙার টেনি শর্মা—আমি ভয় করি দুনিয়ায় এমন কোন—

কথাটা শেষ হতেও পেল না। হঠাৎ বাইরে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে এক বিটকেল আওয়াজ। টেনিদা তড়াং করে লাফিয়ে উঠল : ও কী—ও কী মামা?

কুট্টিমামা কী যেন বলতে গিয়েই হঠাৎ থমকে গেলেন। আমরা দেখলুম তাঁর মুখের চেহারা কেমন পাল্টে গেছে—দুচোখে অমানুষিক ভয়ের ছাপ।

কুট্টিমামা কেবল ফিসফিস করে বললেন, সর্বনাশ-কী সর্বনাশ! তারপর এক হাতে গলাটা চেপে ধরলেন।

বাইরে আবার চ্যাঁ-চ্যাঁ করে সেই বীভৎস ধ্বনি। আর কুট্টিমামার আতঙ্কে স্তব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে আমরাও একটা রহস্যময় ভয়ের অতলে ডুবে যেতে লাগলুম।

বাইরে ও কী ডাকল? কোন্ অদ্ভুত আতঙ্ক—কোন্ ভয়াল ভয়ঙ্কর?

১০. টেনিদার বিদায়

খানিক পরে হাবুল সেনই সামলে নিলে। মামার কপালে-তোলা মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী হইল মামা? অমন কইর‍্যা চক্ষু আকাশে তুইল্যা বইস্যা আছেন ক্যান?

কী ডাকল বাইরে? ভূত না রাইক্কস?

কুট্টিমামার মুখখানা এবার ভীষণ ব্যাজার হয়ে গেল।

—দূর কী আর ডাকব? ও তো প্যাঁচা।

—প্যাঁচা !—ক্যাবলা আশ্চর্য হয়ে বললে, তাতে আপনি ভয় পেলেন কেন?

—ভয় পেলুম কখন?

আমি বললুম, বা-রে, এই তো আপনি বললেন, কী সর্বনাশ—কী সর্বনাশ! তারপরেই ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন।

—আরে, ঘাবড়ে গেছি সাধে? —কুট্টিমামার ব্যাজার মুখটা আরও ব্যাজার হয়ে গেল : একটা বাঁধানো দাঁত ছিল, সেটা গেল খুলে আর মনের ভুলে ক্লিপ-টিপসুদ্ধ সেটাকে টক করে গিলে ফেললুম! যাই—এক্ষুনি একটা জোলাপ খেয়ে ফেলি-গে।

কুট্টিমামা উঠে চলে গেলেন।

হাবুল বললে, দাঁতটা প্যাটে থাকলেই বা ক্ষতি কী! মামার তো সুবিধাই হইল। যা খাইব তারে ডবল চাবান দিতে পারব: একবার চাবাইব মুখে, আর একবার কইস্যা প্যাটের মধ্যে চাবান দিতে পারব।

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, চুপ কর, তোকে আর ওস্তাদি করতে হবে না! কাল আমি তোকে একটা দেশলাই, খানিক সর্ষের তেল আর আধসের বেগুন গিলিয়ে দেব। পেটের মধ্যে বেগুন ভাজা করে খাস!

ছোট্টুলাল এসে বললে, খানা তৈয়ার।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে পড়লুম আমরা। টেনিদা বললে, কেয়া বানায়া আজ?

ছোট্টুলাল বললে, ডিমের কারি, মাছের ফ্রাই—

টেনিদা বললে, ট্রা-লা-লা-লা-লা! কাল তো শিকারে যাচ্ছি। আমরা বাঘের পেটে যাব, হিপোপটেমাসেই গিলে খাবে কে জানে! চল—আজ প্রাণ ভরে ফাঁসির খাওয়া খেয়ে নিই!

ক্যাবলা বলতে যাচ্ছিল, ডুয়ার্সের জঙ্গলে কি হিপো—

কিন্তু বলবার সুযোগ পেলে না। তার আগে টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল : ডি-লা গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস—

আমরা কোরাস তুলে বললুম, ইয়াক-ইয়াক!

আর ছোট্টলাল চোখ দুটোকে আলুর দমের মতো করে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সকালে উঠেই সাজ-সাজ রব।

দেখি, বেশ বড় একটা মোটর ভ্যান এসে গেছে। ওদিকে কুট্টিমামা বুট আর হাফপ্যান্ট পরে একেবারে তৈরি। গলায় টোটার মালা হাতে বন্দুক। কুলিদের সর্দারও এসে হাজির—তারও হাতে একটা বন্দুক। সর্দারের নাম রোশনলাল।

মামা বললেন, রোশনলাল খুব পাকা শিকারি। ওর হাতের তাক ফস্কায় না।

আমরাও চটপট কাপড়-জামা পরে নিলুম। কিন্তু টেনিদার আর দেখা নেই।

কুট্টিমামা বললেন, টেনি কোথায়?

টেনিদা—ভদ্রভাষায় যাকে বলে বাথরুম—তার মধ্যে ঢুকে বসে আছে। আর বেরুতেই চায় না। শেষে দরজায় দমাদম ঘুষি চালাতে লাগল ক্যাবলা।

—শিকারে যাওয়ার আগেই কি অজ্ঞান হয়ে গেলে নাকি টেনিদা? যদি সত্যিই অজ্ঞান হয়ে থাকো, দরজা খুলে দাও। আমরা তোমার নাকে স্মেলিং সলট লাগিয়ে দিচ্ছি।

এর পরে কোনও ভদ্রলোকই অজ্ঞান হয়ে থাকতে পারে না। রেগেমেগে দরজা খুলে বেরিয়ে এল টেনিদা।

-টেক কেয়ার ক্যাবলা—কে বলে আমি অজ্ঞান হয়েছি? কেবল পেটটা একটু চিন-চিন করছিল—

কুট্টিমামার হাঁক শোনা গেল : কী হল টেনি—রেডি?

হাবুল বললে, টেনিদার প্যাট চিন-চিন করে।

আমি বললুম, মাথা ঝিন-ঝিন করে—

ক্যাবলা বললে, বাঘ দেখার আগেই প্রাণ টিন-টিন করে।

টেনিদা ঘুষি বাগিয়ে ক্যাবলাকে তাড়া করলে—ক্যাবলা পালিয়ে বাঁচল।

হাঁড়ির মতো মুখ করে টেনিদা বললে, ভাবছিস আমি ভিতু? আচ্ছা—চল শিকারে। পটলডাঙার এই টেনি শর্মা কাউকে কেয়ার করে না! বাঘ-ফাগ যা সামনে আসবে—স্রেফ হাঁড়িকাবাব করে খেয়ে নেব দেখে নিস!

টেনিদার মজাই এই। ঠিক হাওড়া স্টেশনের গাড়িগুলোর মতো। লিলুয়া পর্যন্ত যেন চলতেই চায় না—খালি ক্যাঁচখালি কোঁচ। তারপর একবার দৌড় মারল তো পাঁই-পাঁই শব্দে সোজা বর্ধমান—তখন আর কে তার পাত্তা পায়। এই গুণের জন্যেই তো টেনিদা আমাদের লিডার।

যাই হোক, আমরা বেরিয়ে পড়লুম। কুট্টিমামা আর রোশনলাল বসলেন ড্রাইভারের পাশে, আমরা বসলুম ভ্যানের ভিতর। একটু পরেই গাড়ি এসে জঙ্গলে ঢুকল।

দুদিকে বড় বড় শাল গাছ—তাদের তলায় নানা আগাছার জঙ্গল। এখানে-ওখানে নানা রকমের ফুল ফুটেছে, মাথা তুলে আছে ডোরাকাটা বুনো ওলের ডগা। ছোট ছোট কাকের মতো কালো কালো একরকম পাখি রাস্তার উপর দিয়ে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে—ছোট-ছোট নালা দিয়ে তিরতির করে বইছে পরিষ্কার নীলচে জল।

সামনে দিয়ে কয়েকবার কান খাড়া করে দৌড়ে পালাল খরগোশ। মাথা নিচু করে তীরের গতিতে ছুটে গেল একটা হরিণ, সোনালি লোমের ওপর কী সুন্দর কালো কালো ছিট!

কুট্টিমামা বললেন, ইস-ইস! আর একটু হলেই মারতে পারা যেত হরিণটাকে!

কথাটা আমার ভালো লাগল না। এমন সুন্দর হরিণগুলোকে মানুষ কেন মারে। দুনিয়ায় তো খাবার জিনিসের অভাব নেই। দুমদাম করে হরিণ না মারলে কী এমন ক্ষতিটা হয় লোকের?

পাশের শিমুল গাছের ডালে বড় একটা পাখি ডেকে উঠল।

ক্যাবলা হাততালি দিয়ে বললে, ময়ুর—ময়ূর!

ময়ুরই বটে। ঠিক চিনেছি আমরা। অনেক ময়ুর দেখেছি চিড়িয়াখানায়।

বাঘের কথা ভুলে গিয়ে আমার ভারি ভালো লাগছিল জঙ্গলটাকে। কী সুন্দর—কী ঠাণ্ডা ছায়ায় ভরা! কত ফুল—কত পাখির মিষ্টি ডাক—কত খরগোশ—কত হরিণ! ইচ্ছে করছিল পাহাড়ি নালার ওই নীলচে ঝর্নার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্নান করি।

হঠাৎ চমক ভাঙল রোশনলালের গলার আওয়াজ।

—বাবু—বাবু!

কুট্টিমামা বললেন, হুঁ—দেখেছি।...বাহাদুর, গাড়ি রোখো!

গাড়িটা আস্তে আস্তে থেমে গেল। মামা আর রোশনলাল নামলেন গাড়ি থেকে।

মামা আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা চুপচাপ বসে থাকো গাড়িতে। কাচ তুলে দাও। নেহাত দরকার না পড়লে নামবে না। আমরা আসছি একটু পরে।...বাহাদুর—তুম ভি আও—

মাটির দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখতে দেখতে তিনজনে টুপ করে মিলিয়ে গেল বনের ভিতর।

আমরা চারমূর্তি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলুম ভ্যানের ভিতর। কিন্তু কতক্ষণ আর এভাবে বোকার মতো বসে থাকতে ভালো লাগে? কাচ তুলে দেওয়াতে কেমন গরমও বোধ হচ্ছিল। অথচ বাইরে ঠাণ্ডা ছায়া-হাওয়া বইছে ঝিরঝিরিয়ে, টুপটুপিয়ে পড়ছে শালের পাতা। আমরা যেন জেলখানার মধ্যে আটকে আছি—এমনি মনে হচ্ছিল।

ক্যাবলা বললে, টেনিদা, একটু নেমে পায়চারি করলে কেমন হয়?

টেনিদা বললে, কুট্টিমামা বারণ করে গেল যে! কাছাকাছি যদি বাঘ-টাঘ থাকে—

হাবুল বললে, হঃ। এমন দিনের ব্যালা—চাইরদিক এমন মনোরম—এইখানে বাঘ থাকব। ক্যান? আর বাঘ যদি এইখানেই থাকব-তাইলে অরা বাঘের খোঁজে দূরে যাইব ক্যান?

পাকা যুক্তি। শুনে টেনিদা একবার কান, আর একবার নাকটা চুলকে নিলে। বললে, তা বটে—তা বটে! তবে, মামা বারণ করে গেল কিনা—

ক্যাবলা বললে, মামারা বারণ করেই। সংস্কৃতে পড়োনি টেনিদা? মা—মা—অথাৎ কিনা, না—না। ওটা মামা নামের গুণ—সবটাইতে মা-মা বলবে।

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, ধ্যাত্তোর সংস্কৃত! ইস্কুলে পণ্ডিতের চাঁটিতে চোখে অন্ধকার দেখতুম—কলেজে এসে সংস্কৃতের হাত থেকে বেঁচেছি। তুই আর পণ্ডিতি ফলাসনি ক্যাবলা—গা জ্বালা করে!

ক্যাবলা বললে, তা জ্বালা করুক। তো ম্যায় উতার ষাঁউ?

—সে আবার কী? হাউ-মাউ করছিস কেন?

—হাউ-মাউ নয়-রাষ্ট্রভাষা। মানে, নামব?

—সোজা বাংলায় বললেই হয় !—টেনিদা ভেংচি কেটে বললে, অমন ভুতুড়ে আওয়াজ করছিস কেন? আয়—নামা যাক। কিন্তু বেশি দূর যাওয়া চলবে না—কাছাকাছিই থাকতে হবে।

আমরা নেমে পড়লুম ভ্যান থেকে।

বেশি দূর আর যাব না ভেবেও হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা এগিয়েছি। চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যটিশ্য দেখে আমি বেশ কায়দা করে বলতে যাচ্ছি; দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর—ঠিক এমন সময়—

জঙ্গলের মধ্যে কেমন মড়মড় শব্দ! পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি—

হাতি। গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকেই!

আমি চেঁচিয়ে উঠলুম : টেনিদা—বুনো হাতি!

বাপরে—মা-রে! কিন্তু ভ্যানের দিকে যাবার উপায় নেই-হাতি পথ জুড়ে এগিয়ে আসছে!

—ক্যাবলা, হাবুল, প্যালা—গাছে, গাছে—উঠে পড়—কুইক—টেনিদার আদেশ শোনা গেল।

কিন্তু তার আগেই আমরা সামনের একটা মোটা গাছে তরতর করে উঠতে আরম্ভ করেছি। যেভাবে তিন লাফে আমরা গাছে চড়ে গেলুম, তা দেখে কে বলবে আমাদের পেছনে একটা করে লম্বা ল্যাজ নেই।

হাতিটা তখন ঠিক গাছটার তলায় এসে পড়েছে। আর সেই মুহূর্তেই অঘটন ঘটল একটা। মড়মড় করে ডাল ভাঙবার আওয়াজ এল, একটা চিৎকার শোনা গেল টেনিদার, তারপর—

তারপর রোমাঞ্চিত হয়ে আমরা দেখলুম, টেনিদা পড়েছে হাতির পিঠের ওপর। উপুড় হয়ে দুহাতে চেপে ধরেছে হাতির গলার চামড়া। আর পিঠের উপর খামকা এই উৎপাতটা ভাদ্রমাসের পাকা তালের মতো নেমে আসাতে হাতিটা ছুট লাগিয়েছে প্রাণপণে।

আমরা আকুল হয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম : টেনিদা—টেনিদা—

হাতি জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়ার আগে আমরা শুনলুম টেনিদা ডেকে বলছে : তোদের পটলডাঙার টেনিদাকে তোরা এবার জন্মের মতো হারালি! বিদায়–বিদায়—

১১. অভিযানের আরম্ভ

গাছের উপর বসে আমরা তিন মূর্তি একসঙ্গে কেঁদে ফেললুম।

টেনিদা—আমাদের লিডার—পটলডাঙার চার মূর্তির সেরা মূর্তি—এমনি করে বুনো হাতির পিঠে চেপে বিদায় নিলে! এ আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না—কেউ না।

টেনিদা আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক মিষ্টি আর বিস্তর ডালমুট খেয়েছে। চাঁটি গাঁট্টা লাগিয়েছে যখন-তখন। কিন্তু টেনিদাকে নইলে আমাদের যে একটি দিনও চলে না। যেমন চওড়া বুক—তেমনি চওড়া মন! হাবুল সেবার যখন টাইফয়েড হয়ে মরো-মরো তখন সারারাত জেগে, নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে টেনিদাই তাকে নার্স করেছে—বাঁচিয়ে তুলেছে বলা চলে। পাড়ার কারও বিপদ-আপদ হলে টেনিদাই গিয়ে দাঁড়িয়েছে সকলের আগে। লোকের উপকারে এক মুহূর্তের জন্য তার ক্লান্তি নেই—মুখে হাসি তার লেগেই আছে। ফুটবলের মাঠে সেরা খেলোয়াড়, ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন। আর গল্পের রাজা। এমন করে গল্প বলতে কেউ জানে না!

সেই টেনিদা আমাদের ছেড়ে চলে যাবে? এ হতেই পারে না! এ অসম্ভব!

ক্যাবলাই চোখের জল মুছে ফেলল সকলের আগে। ডাকলে, হাবল!

—কী কও?—ধরা গলায় হাবুল জবাব দিলে।

—কেঁদে লাভ নেই। টেনিদাকে খুঁজে বের করতে হবে।

—কোথায় পাবে?—আমি জিজ্ঞেস করলুম।

—যেখানেই হোক।

ফোঁসফোঁস করতে করতে হাবুল বললে, বুনো হাতি—কোথায় যে লইয়া গেছে—

ক্যাবলা ততক্ষণে নেমে পড়েছে গাছ থেকে। বললে, পৃথিবীর বাইরে তো কোথাও নিয়ে যায়নি। দরকার হলে দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত খুঁজে দেখব। নেমে আয় তোরা।

আমরা নামলুম।

ক্যাবলা বললে, শোনো বন্ধুগণ! আমরা পটলডাঙার ছেলে, ভয় কাকে বলে কোনও দিন জানিনি। তোমরা নিশ্চয়ই এর মধ্যে ভুলে যাওনি সেই ঝর্ণিপাহাড়ির অভিযানকাহিনী নিশ্চয় ভুলে যাওনি, স্বামী ঘুটঘুটানন্দের চক্রান্ত আমরা কেমন করে ফাঁস করে দিয়েছিলুম! মানুষের শয়তানিকে ঠাণ্ডা করতে পেরেছি, আর বুনো জানোয়ারকে ভয়? জানোয়ার মানুষের চাইতে নিচুদরের জীব—তাকে হারিয়ে, হটিয়েই মানুষ এগিয়ে চলেছে। আমরাও টেনিদাকে ফিরিয়ে আনবই।

—যদি হাতি তাকে মেরে ফেলে থাকে?

—আমি তা বিশ্বাস করি না। সে আমাদের লিডার—বিপদে পড়লে যেমন বেপরোয়া তেমনি সাহসী হয়ে ওঠে—সে তো তোমরা জানোই। সে ঠিকই বেঁচে আছে। তবু আমাদের কর্তব্য আমরা করব। আর—আর যদি দেখি সত্যিই হাতি তাকে মেরে ফেলেছে, তা হলে আমরাও মরব। টেনিদাকে ফেলে আমরা কিছুতেই কলকাতায় ফিরে যাব না। কী বল তোমরা?

আমরা দুজনে বুক চিতিয়ে উঠে দাঁড়ালুম।

—ঠিক। আমিও তাই কই।—হাবুল বললে।

—চারজন এসেছিলুম—তিনজন কিছুতেই ফিরে যাব না। মরলে চারজনেই মরব।—আমি বললুম।

ক্যাবলা বললে, তা হলে এখনি আমরা বেরিয়ে পড়ি।

—কিন্তু কুট্টিমামা আর রোশনলালকে খবর দিতে পারলে—

—কোথায় খবর দিবি, আর পাবিই বা কোথায়? তা ছাড়া এক সেকেন্ডও আমরা সময় নষ্ট করতে পারব না। চল, এগোনো যাক—

—কোনদিকে যাবি?—হাবুল জানতে চাইল।

—হাতির পায়ের দাগ নিশ্চয় পাওয়া যাবে। তাই ধরেই এগোব।

আমি বললুম, একটা বন্দুক-টন্দুক যদি থাকত—

ক্যাবলা রাগ করে বললে, তুই আর এখন জ্বালাসনি প্যালা! বন্দুক থাকলেই বা কী হত শুনি—কোনও জন্মে আমরা কেউ ছুঁড়েছি নাকি ওসব? বন্দুক আমাদের দরকার নেই, মনের জোরই হল সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আয়—

—চল—

আমরা এগিয়ে চললুম। বুক এক-আধটু দুর-দুর না করছিল তা নয়, মনে হচ্ছিল পটলডাঙায় ফিরে গিয়ে বাবা-মা ভাইবোনদের মুখও হয়তো কোনওদিন আর দেখতে পাব না। হয়তো এ-জঙ্গলেই বাঘ ভালুক হাতির পাল্লায় আমার প্রাণ যাবে। যদি যায়—যাক। দুনিয়ায় ভীরু আর স্বার্থপরদের কোনও জায়গা নেই। ও-ভাবে বাপমার কোলে আহ্বাদে পুতুল হয়ে বেঁচে থাকার চাইতে বীরের মতো মরা ভালো। আর, একবার ছাড়া তো দুবার মরব না!

ক্যাবলা ঠিকই বুঝেছিল। ডালপালা ভেঙে, গাছপালা মাড়িয়ে হাতিটা যেভাবে এগিয়ে গেছে আমরা তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলুম। কোথাও কোথাও নরম মাটিতে তার পায়ের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে আমরা বনের পথ বেয়ে চলতে লাগলুম। কিন্তু তখনও হাতির দেখা নেই, টেনিদারও চিহ্নমাত্রও না।

শেষে এক জায়গায় এসে আমাদের থমকে দাঁড়াতে হল।

চারধারে জঙ্গল কেমন তচনচ। চার পাশেই হাতির পায়ের দাগ। মনে হয়, পাঁচ-সাতটা হাতি জড়ো হয়েছিল এখানে তারপর নানা দিকে যেন তারা ঘুরে বেড়িয়েছে। এর মধ্যে কোন্ হাতিটার পিঠে টেনিদা গদিয়ান হয়ে বসে আছে—সে কথা কে বলবে!

ক্যাবলা বললে, তাই তো! কোন্ দিকে যাই?

হাবুল ভেবেচিন্তে বলল, এইভাবে ঘুরা খুব সুবিধা হইব না। চল ক্যাবলা, আবার ভ্যানের কাছে ফিরা যাই। মামারে সঙ্গে কইর‍্যা—

ক্যাবলা বললে, না।

কী করবি তা হলে?—আমি জিজ্ঞেস করলুম।

—তিনজনে তিনদিকে যাব।

—একা-একা?

—হ্যাঁ—একলা চল রে।

আমার পালাজ্বরের পিলেটা অবশ্য এতদিনে অনেক ছোট হয়ে গেছে, কিন্তু যেটুকু আছে তা-ও চড়াৎ করে লাফিয়ে উঠল।

—একা যাব?

ক্যাবলা দুটো জ্বলজ্বলে চোখ মেলে আমার দিকে চাইল।

—তুই ভ্যানে ফিরে যা প্যালা। আমি আর হাবুল চললুম খুঁজতে।

আমার রক্ত গরম হয়ে উঠল। আমি ভীরু! একা আমারই প্রাণের ভয়। কখনও না।

বললুম, তোর ইচ্ছে হয় তুই ফিরে যা। আমি টেনিদাকে খুঁজব।

ক্যাবলা আমার পিঠ চাপড়ে দিলে। খুশি হয়ে বললে, ব্যস, ঠিক হ্যায়। ই হ্যায় মরদকা বাত! এবার

তিনজন তিনমুখে। বন্ধুগণ, হয়তো আমাদের এই শেষ দেখা। হয়তো আমরা আর কেউ বেঁচে ফিরব না। তাই যাওয়ার আগে একবার বল—

—পটলডাঙা—

—জিন্দাবাদ!

–চার মূর্তি—

–জিন্দাবাদ!

তারপরেই দেখি, ওরা দু'জনে দুদিকে বনের মধ্যে স্কুট করে কোথায় চলে গেল। আমি এখন একা। এই বাঘ-সাপ-হাতির জঙ্গলে একেবারে একা। নিজেকে বললুম, বুকে সাহস আনো পটলডাঙার প্যালারাম! তুমি যে কেবল শিঙিমাছ দিয়েই পটোলের ঝোল খেতে এক্সপার্ট তা নও, তার চাইতে আরও অনেক বেশি। আজ তোমার চরম পরীক্ষা। তৈরি হও সেজন্যে।

একটা শুকনো ডাল পড়ে ছিল সামনে। সেইটে কুড়িয়ে নিয়ে আমিও চলতে শুরু করলুম। মরবার আগে অন্তত কষে এক ঘা তো বসাতে পারব! সে হাতিই হোক আর বাঘই হোক।

কিন্তু বেশিদূর যেতে হল না আমাকে।

একটা ঝোপের ওপর যেই পা দিয়েছি, অমনি—

সড়াক্–ঝরঝরাৎ–

পায়ের তলার থেকে মাটি সরে গেল। আর তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলুম, মহাশূন্য বেয়ে আমি কোথায় কোন পাতালের দিকে পড়ে যাচ্ছি।

-মা-

তারপরেই আমার চোখ বুজে এল।

১২. শজারু সঙ্গীত

গর্তে পড়ে মনে হয়েছিল—পটলডাঙার প্যালারাম এবার একদম ফিনিশ—হাড়গোড় কিছু বুঝি আর রইল না। 'মরে গেছি-মরে গেছি'—ভাবতে ভাবতে দেখি, আমি মোটেই মারা যাইনি। দিব্যি বহাল তবিয়তে একরাশ নরম কাদার ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছি পিঠটা ঠেস দেওয়া রয়েছে মাটির দেওয়ালে।

কোমরটা কেবল একটু ঝনঝন করছে—মাথাতেও ঝাঁকুনি লেগেছে। সেটুকু সামলে নিয়ে চোখ মেলে তাকালুম। মাথার হাত-দশেক ওপরে একটা গোল আকাশ-আরও ওপরে একটা গাছের ডাল দুলছে। আশেপাশে চেয়ে দেখলুম অন্ধকার, গর্তটা কত বড় কিংবা আমি ছাড়া এর ভেতরে আর কী আছে, কিছু বুঝতে পারলুম না।

এমন সময় খুব কাছেই যেন একটা ঝমঝম করে শব্দ শুনতে পেলুম। ঠিক মনে হল কেউ যেন হাতে করে টাকার তোড়া বাজাচ্ছে।

আমার খাড়া খাড়া কান দুটো আরও খাড়া হয়ে উঠল। ব্যাপারখানা কী?

গর্তে যখন পড়েছি তখন তো মারাই গেছি। কিন্তু মরবার আগে সব ভালো করে জেনেশুনে নেওয়া দরকার, কারণ বইতেই পড়েছি : মৃত্যুকাল পর্যন্ত জ্ঞান সঞ্চয় করিবে। ওটা কীসের আওয়াজ?

মাথায় ঝাঁকুনি লাগবার জন্যেই বোধহয় চোখ এখনও ঝাপসা হয়ে রয়েছে। খুব লক্ষ করেও একদিকে ছোট একটা ছায়ার মতো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলুম না। কিন্তু আবার শুনলুম কে যেন ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে, আর শব্দ উঠছে : ঝম-ঝম-ঝম—

অ্যাঁ—যখের গর্ত নাকি?

ভাবতেই আমার কানের ভেতরে গুবরে পোকারা কুরকুর করতে লাগল, নাকের ওপর যেন উচ্চিংড়ে লাফাতে লাগল, পেটের মধ্যে ছোট হয়ে-যাওয়া সেই পালাজ্বরের পিলেটা কচ্ছপের মতো শুড় বের করতে লাগল। শেষকালে কি পাতালে যখের রাজ্যে এসে পৌঁছে গেলুম? সেই কি অমন করে মোহরের থলি বাজিয়ে আওয়াজ করছে? একটু পরেই থলিটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলবে : বৎস প্যালারাম, অনেক কষ্ট করে তুমি এখানে এসে পৌঁছেছ দেখে ভারি খুশি হয়েছি, এবার এই মোহর নিয়ে তুমি দেশে চলে যাও বিরাট অট্টালিকা বানাও-ঘোড়াশালে ঘোড়া, হাতিশালে হাতি—

হাতির কথা ভাবতেই মনে হল, আমাদের লিডার টেনিদা বুনো হাতির পিঠে চড়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। আমরা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। কিন্তু কোথায় টেনিদা—আমিই বা কোথায়? এই বিচ্ছিরি আফ্রিকার জঙ্গলেদানা, ম্যাডাগাস্কারের অরণ্যে—দুত্তোর ডুয়ার্সের এই যাচ্ছেতাই বনের ভেতর, আমাদের চারমূর্তিরই বারোটা বেজে গেল।

সব ভুলে গিয়ে আমার এখন একটু একটু কান্না পেতে লাগল। মাকে মনে পড়ছে, বাবা, ছোড়দি, বড়দা, ছোট বোন দুটোকে মনে পড়ছে, এমনকি, যে-মেজদা একবার পেট কামড়েছে বললেই দেড় হাত লম্বা একটা সিরিঞ্জ নিয়ে আমার পেটে ইঞ্জেকশন দিতে আসে, তাকেও মনে পড়ে যাচ্ছে। খুব ছোটবেলায় বড়দা একবার আমায় বলেছিল ঘড়ি দেখে আসতে। ঘড়ি দেখে এসে আমি খুব গম্ভীর চালে বলেছিলুম, সাড়ে দেড়টা বেজেছে, আর শুনেই বড়দা আমার একটা লম্বা কানে তিড়িং করে চিড়িং মেরে দিয়েছিল। হায় বড়দা আর কোনও দিন অমন করে আমার কানে মোচড় দেবে না!

বারোটা নয়, এবার সত্যিই আমার সাড়ে দেড়টা বেজে গেল!

আবার সেই ঝমঝম শব্দ! চমকে উঠলুম।

চোখটা মুছে চাইতে এবার আমার জ্ঞান লাভ হয়। ধ্যেৎ—যখ-টখ কিছু না—সব বোগাস। এতক্ষণে

গর্তের ভেতরকার অন্ধকারটা চোখে খানিকটা ফিকে হয়ে এসেছে। দেখলুম বেড়ালের চাইতে একটু বড় কী একটা জন্তু হাত-চারেক দূরে দাঁড়িয়ে সমানে ফোঁসফোঁস আওয়াজ করছে। তার খুদে-খুদে চোখ দুটো অন্ধকারে চিকচিক করছে আর তার সারা শরীরে মোটা মোটা ঝাঁটার কাঠির মতো কী সব খাড়া হয়ে রয়েছে।

আমি বলে ফেললুম, তুই আবার কে রে? ঝাঁটা বাঁধা বেড়ালের মতো দেখতে?

শুনেই জন্তুটা গা ঝাড়া দিলে। আর তক্ষুনি আওয়াজ হল : ঝন-ঝম—ঝুমুর-ঝুমুর!

আরে, তাই বল! এইবারে বুঝেছি। মিস্টার শজারু। ছেলেবেলায় মল্লিকা মাসিমার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলুম শক্তিগড়ে। ওঁদের বাড়ির পাশে আমবাগানে রাত্তির বেলা শজারু ঘুরে বেড়াত আর ভয় পেলেই কাঁটা বাজিয়ে আওয়াজ করত ঝুম ঝুম! মল্লিকা মাসিমা বলতেন, শজারুর মাংস খেতে খুব ভালো। যখন কাঁটা উঁচিয়ে দাঁড়ায়, তখন দুম করে ওর পিঠের উপর একটা কলাগাছ ফেলে দিতে হয়। ব্যস—জব্দ। কাঁটা কলাগাছে আটকে যায়—আর পালাতে পারে না।

বুঝতে পারলুম, আমি পড়বার আগে শজারু মশাইও কী করে গর্তে পড়েছেন। তাই আমি আসাতে খুব রাগ হয়েছে—ভাবছেন, আমিই বুঝি প্যাঁচ কষিয়ে ওঁকে ফেলে দিয়েছি। তাই খুব কাঁটা ফুলিয়ে আমাকে ভয় দেখানো হচ্ছে।

আমার খুব মজা লাগল। থাকত কলাগাছ—লম্ফঝম্ফ তোমার বেরিয়ে যেত! এখন দাপাদাপি করো—যত ইচ্ছে!

আরে, মারা যখন গেছিই, তখন আর ভাবনা কী! শজারুটার ফোঁসফোঁসানি দেখে আমার দস্তুরমতো গান পেয়ে গেল। তোমরা তো জানোই—দেখতে আমি রোগা-পটকা হলে কী হয়—গান ধরলে আমার গলা থেকে এমনি হালুষ রাগিণী বেরুতে থাকে যে ক্যাবলাদের রামছাগলটা পর্যন্ত দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে ম্যা-হা-হা বলে চিৎকার ছাড়ে। শজারুটা যাতে তেড়ে এসে আমাকে কয়েকটা খোঁচা-টোচা না লাগিয়ে দেয়, সেজন্যে ওকে ভেবড়ে দেবার জন্যে আমি হাউ-মাউ করে হ-য-ব-র-ল থেকে গাইতে শুরু করলাম :

বাদুড় বলে, ওরে ও ভাই শজারু,
আজকে রাতে হবে একটা মজারু—

সেই বন্ধ গর্তের ভেতর আমার বেয়াড়া গলার বাজখাঁই গান যে কেমন খোলতাই হল—সে বোধহয় না বললেও চলে। এমন পিলে কাঁপানো আওয়াজ বেরুল যে শুনে নিজেই আমি চমকে গেলুম। শজারুটা তিড়িক করে একটা লাফ মারল।

এই রে, তেড়ে আসে নাকি আমার দিকে! ওর গোটাকয়েক কাঁটা গায়ে ফুটিয়ে দিলেই তো গেছি—একেবারে ভীষ্মের শরশয্যা! প্রাণের দায়ে জোর গলা-খাঁকারি দিয়ে আবার আরম্ভ করলুম :

আসবে সেথায় প্যাঁচা এবং প্যাঁচানি—

শজারুটা এবার কেমন একটা আওয়াজ করলে। তারপর আমার দিকে আর না এগিয়ে—সুড়সুড়িয়ে আরও পেছনে সরে গেল, কাঁটা ফুলিয়ে কোণে গোল হয়ে বসে রইল। আমার গানের গুঁতোয় আপাতত বিপর্যস্ত হয়ে গেছে মনে হল—সহজে যে আর আক্রমণ করবে এমন বোধ হচ্ছে না।

ও থাক বসে। আমিও বসি।

কিন্তু আমিও বসব? বসে থেকে আমার কী লাভ? আমি তো এখনও মরিনি। উপর থেকে হাত-দশেক নীচে একটা গর্তের মধ্যে পড়েছি বটে, তাই বলে এখনও তো আমার পঞ্চত্ব পাওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। একটু চেষ্টা করলে হয়তো আরও কিছুদিন শেয়ালদা বাজারের শিঙিমাছ আর কচি পটোল সাবাড় করবার জন্যে আমি বেঁচে থাকতে পারি।

আর শুধু নিজের বাঁচাটাই কি বড় কথা? আমাদের বাংলার প্রফেসর একদিন পড়াতে পড়াতে

বলেছিলেন, নিজের জন্যে বাঁচে জানোয়ারেরা, সকলের জন্য বাঁচে মানুষ। আমি পটলডাঙার প্যালারাম-রোগা-পটকা হতে পারি, ভিতু হতে পারি, কিন্তু আমি মানুষ। খালি আমার নিজের কথাই তো ভাবলে চলবে না। আমাদের লিডার টেনিদাকে যেমন করে হোক উদ্ধার করতে হবে, চার মূর্তির আর সবাই কোথাও যদি কেউ বিপদে পড়ে থাকে তাদের বাঁচাতে হবে। আমি বাঁচব-সকলের জন্যেই বাঁচব!

গর্তের কোনায় গোল-হয়ে বসে থাকা শজারুটা কেমন ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে উঠল। আমার মনে হল, যেন রাষ্ট্রভাষায় বললে, কেয়াবাৎ-কেয়াবাৎ! অথাৎ কিনা শাবাশ, শাবাশ!

আবার মাথা তুলে চাইলুম।

ওপরে গর্ত জুড়ে সেই গোল আকাশটুকু। একটা গাছের ডাল নেমে এসেছে, তার পাতা কাঁপছে ঝিরঝিরিয়ে। পারব না—একটু চেষ্টা করলে উঠে যেতে পারব না? তেনজিং এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে পারলেন—আমি একটা গর্ত বেয়ে উঠে যেতে পারব না ওপরে? তেনজিংয়ের তো আমার মতো দুখানা হাত আর দুখানা পা-ই ছিল! তবে?

দেখিই না একবার চেষ্টা করে। সেই-যে বইতে আছে না, যে মাটিতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধরে? মাটির ভেতর দিয়ে আছড়ে পড়েছি, মাটি ধরেই উঠে যাব।

যা থাকে কপালে বলে উঠতে যাচ্ছি, আর ঠিক তখন—

হঠাৎ কানে এল বনবাদাড় ভেঙে কে যেন দুড়দাড় করে ছুটে আসছে। তার পরেই হুড়মুড় সরসরঝরঝর করে আওয়াজ। ঠিক মনে হল, গোল আকাশটা তালগোল পাকিয়ে নীচে আছড়ে পড়ল। আমার মুখ-চোখে ধুলো-মাটি আর গাছের পাতার পুষ্পবৃষ্টি হল, আর কী একা পেল্লায় জিনিস ধপধপপাস করে নেমে এল গর্তে প্রায় আমার গা ঘেঁষে। তার প্রকাণ্ড ল্যাজটা চাবুকের মতো আমার গায়ে ঘা মারল।

আর সেই বিরাট জন্তুটা গুরুর—হুম—বলে কানফাটানো এক চিৎকার ছাড়ল।

সে-চিৎকারে আমার মাথা ঘুরে গেল। চোখের সামনে দেখলুম সারি সারি সর্ষে ফুলের শোভা। উৎকট দুর্গন্ধে যেন দম আটকে আসতে চাইল।

গর্তে যে পড়েছে তাকে আমি দেখেছি। সে বাঘ! বাঘ ছাড়া আর কেউ নয়।

আমার তা হলে বারোটা নয়—সাড়ে দেড়টাও নয়, পুরো সাড়ে আড়াইটে বেজে গেল। একবার আমি হাঁ করলুম, খুব সম্ভব গাঁ-গাঁ করে খানিক আওয়াজ বেরুল, তারপর

তারপর থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে গর্তের মাটিতে একেবারে পপাত।

১৩. বাঘ ভার্সাস যোগ

খুব সম্ভব মরেই গিয়েছিলাম। কিন্তু মরা মানুষকেও যে জাগিয়ে তুলতে পারে সে হল বাঘের ডাক। কানের পাশে যেন একসঙ্গে পঁচিশটা বাজ পড়ল এইরকম মনে হল আমার, আর মুখের ওপর ফটাস করে মোটা কাছির মতো কিসের একটা ঘা লাগল। বুঝতে পারলুম, বাঘের ল্যাজ।

মাত্র একহাত দূরে আমার বাঘ পড়েছে—তারপরেও কি আমার বেঁচে থাকা সম্ভব? আমি—পটলডাঙার প্যালারাম—এ-যাত্রা নির্ঘাত তা হলে মারাই গৈছি। আর যদি মরেই গিয়ে থাকি তা হলে আর কিসের ভয় আমার? আমি তো এখন ভূত। ভূতকে কি কখনও বাঘে ধরে?

আবার বিশটা বাজের মতো আওয়াজ করে, গর্ত ফাটিয়ে বাঘ হাঁক ছাড়ল—তারপরেই একটা পেল্লায় লাফ। আমি ঝট করে একটু সরে গিয়েছিলুম বলে বাঘ আমার গায়ে পড়ল না, কিন্তু ল্যাজটার ঘায়ে আমার নাক প্রায় থেঁতলে গেল। আর বাঘের নখের আঁচড়ে গর্তের গা থেকে খানিক মাটি ঝুরঝুর করে চোখময় ছড়িয়ে গেল।

এ তো ভালো ল্যাঠা দেখছি! বাঘ যদি আমাকে না-ও ধরে—বাঘের দাপাদাপিতেই আমি—মানে আমার ভূতটা মারা যাবে। কিংবা নাকে যখন ল্যাজের ঘা এসে এমন বেয়াড়াভাবে লেগেছে যে মনে হচ্ছে হয়তো আমি বেঁচেই আছি।

আবার বাঘের গর্জন। উঃ, কান দুটো তো ফেটে গেল! এসপার কি ওসপার!

এবার বাঘ লাফ মারবার আগেই আমি লাফ মারলুম। আর হাতে যা ঠেকল তা গোটাকয়েক গাছের শেকড়।

আমি পটলডাঙার প্যালারাম—জীবনে কোনও দিন একসারসাইজ করিনি—পালাজ্বরে ভুগেছি আর পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খেয়েছি। দু-একবার খেলতে নেমেছিলুম, কিন্তু কী কাণ্ড যে করেছি তোমাদের ভেতর যারা প্যালারামের কীর্তি-কাহিনী পড়েছ তারা তা সবই জানো। সব্বাই আমাকে বলে—আমি রোগাপটকা, আমি অপদার্থ। কিন্তু এখন দেখলুম—রোগা-টোগা ওসব কিছু না—স্রেফ বাজে কথা। মনে জোর এলে আপনি গায়ের জোর এসে যায়—দুনিয়ার কোনও কাজ আর অসম্ভব বলে বোধ হয় না। আমি প্রাণপণে সেই শেকড় ধরে ঝুলতে লাগলুম। তাকিয়ে দেখি আরও শেকড় রয়েছে ওপরে। কাঁচা মাটির গর্তে পা দিয়ে দিয়ে শেকড় টেনে টেনে—

আরে—আরে—আমি যে ওপরে উঠে গেছি প্রায়! একটু—আর একটু—

নীচের গর্তে তখন যে কী দাপাদাপি চলছে ভাবাই যায় না। বাঘের চিৎকারে বিশটা নয়—পঁচিশটা নয়—একশোটা বাজ যেন ফেটে পড়ছে। বাঘ লাফিয়ে উঠছে থেকে থেকে—একবার একটা থাবা প্রায় আমার পা ছুঁয়ে গেল। শেষ শক্তি দিয়ে আমি সবচেয়ে ওপরের শিকড়টা টেনে ধরলুম, সেটা মটমট করে উঠল, তারপর ছিড়ে পড়ার আগেই আমি গর্তের মুখে আবার শক্ত মাটিতে উঠে পড়লুম।

আর তখন মনে হল, আমার বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা যেন ফেটে যাচ্ছে। কাঁধ দুটোকে কে যেন আলাদা করে ছিড়ে নিচ্ছে দুদিকে। কপাল থেকে ঘাম চোখে নেমে এসে সব। ঝাপসা করে দিচ্ছে, আগুন ছুটছে সারা গায়ে। ঘাসের ওপর দাঁড়াতে গিয়েও আমি দাঁড়াতে পারলুম না সত্যিই বেঁচে আছি না মরে গেছি ভালো করে বোঝবার আগেই সব অন্ধকার হয়ে গেল।

তারপর আস্তে আস্তে মাথাটা পরিষ্কার হতে লাগল। মুখের ওপর কী যেন সুড়সুড় করে হাঁটছে এমনি মনে হল। টোকা দিয়ে সেটাকে ফেলে দিয়ে দেখি, একটা বেশ মোটাসোটা গুবরে পোকা। চিত হয়ে পড়ে বোঁ-বোঁ করে হাত-পা ছুঁড়ছে।

আস্পর্ধা দ্যাখো একবার! আমার মুখখানাকে বোধহয় গোবরের তাল মনে করেছিল। এখন থাকো চিত হয়ে!

তক্ষুনি আবার যেন পাতাল থেকে কামানের ডাক এল। মাটিটা কেঁপে উঠল থরথরিয়ে।

দেখলুম, আমি মাটিতে পা ছড়িয়ে উবুড় হয়ে পড়ে আছি। আমার মাথার সামনে ঠিক ছইঞ্চি দূরে কুয়োর মতো মস্ত একটা গর্তের মুখ। আমার হাতের মুঠোয় কতগুলো সরু সরু ছেড়া শেকড়।

সব মনে পড়ে গেল। একটু আগেই গর্তটা থেকে আমি উঠে এসেছি। তারপর ভিরমি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলুম।

কিন্তু গর্তের মধ্যে বাঘ কি এখনও আছে? নিশ্চয় আছে। নইলে সে উঠে এলে আমি আর মাটিতে থাকতুম না—আরও ভালো জায়গায় আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়ে যেত—মানে বাঘের পেটের ভেতর। আর সেই শজারু? সে-ও নিশ্চয় যথাস্থানেই রয়েছে আর দুজনে মিলে জোর মজারু চলছে গর্তে।

মজা? বাঘের চিৎকার তো ঠিক সেরকমটা মনে হচ্ছে না।

আমি চার পায়ে ভর দিয়ে উঠলুম গলাটা একটু বাড়িয়ে দিলুম গর্তের দিকে। ভেতরে প্রথমটা খালি অন্ধকার মনে হল—আর বোধ হল, বিষম একটা দাপাদাপি চলছে। কিন্তু তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটু একটু করে আমি সব দেখতে পেলুম।

শজারুটা কেমন তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে তার চারটে পা আর মাথাটা অল্প অল্প নড়ছে। তার পাশেই পড়ে আছে বাঘ—লাফাচ্ছে না, সমানে হাঁপাচ্ছে, আর কী একটা যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে একটানা।

এবারে ব্যাপারটা বুঝতে আর বাকি রইল না।

বাঘ পড়েছিল সোজা শজারুর ওপর। তার ধারালো কাঁটাগুলো বাঘের সর্বাঙ্গে বিঁধেছে শরশয্যার মতো। আর তারই যন্ত্রণায় বাঘ অমনভাবে লাফঝাঁপ করছে—আমি যে শেকড় ধরে ধরে গর্ত বেয়ে ওপরে উঠে এসেছি, সে তা দেখতেও পায়নি। ওই শজারুটা নিজের প্রাণ দিয়ে আমায় বাঁচিয়েছে।

শজারুটার জন্যে আমার ভারি কষ্ট হতে লাগল। আর কেন জানি না—বাঘের জন্যেও মায়ায় মনটা আমার ভরে উঠল। সর্বাঙ্গে শজারুর কাঁটা বিঁধে না-জানি কত যন্ত্রণাই পাচ্ছে বাঘটা। এর চাইতে যদি একেবারে মরে যেত, তাহলেও ঢের ভাল হত ওর পড়ে।

একমনে দেখছি—হঠাৎ টপাস্!

কী একটা ঢিলের মতো এসে পড়ল পিঠের ওপর। আরে—আরে করে উঠে বসলুম—আবার টপাস্! একেবারে চাঁদির ওপর। তাকিয়ে দেখি শুকনো সীমের মতো কী এরকম ফল।

ওপর থেকে আপনি পড়ছে নাকি?

না—না। যেই চোখ তুলে তাকিয়েছি, দেখি গাছের ডালে বসে কে যেন বিশ্রীরকমভাবে ভেংচি কাটছে আমাকে। ইয়া বড় একটা গোদা বাঁদর। এখানে আসা অবধিই দেখছি। হাড়বজ্জাত বাঁদরগুলো পেছনে লেগেছে আমাদের। নাকটাকে ছারপোকার মতো করে গাছ থেকে কতগুলো শুকনো ফল ছিড়ে ছিড়ে সে আমার পিঠ বরাবর তাক করছে, আর সমানে ভেংচি কেটে চলেছে।

আমি চেঁচিয়ে বললুম, এই!—তারপর বাঁদরটাকে আরও ঘাবড়ে দেবার জন্যে হিন্দী করে বললুম, ফের বদমায়েসী করেগা তো কান ধরকে এক থাপ্পড় মারেগা।

অবশ্য গাছের ওপর উঠে ওর কানটা হাতে পাওয়া মুস্কিল—থাপ্পড় মারা আরও মুস্কিল। কিন্তু যে করে হোক, বাঁদরটাকে নার্ভাস করে দেওয়া দরকার। আমি আবার বললুম, এক চাঁটিমে দাঁত উড়ায় দেগা। কেন ঢিল মারতা হ্যায়? হাম পটলডাঙার প্যালারাম হ্যায়—সমঝা?

বাঁদরটা দাঁত বের করে কী যেন বললে। —কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কাঁচাগোল্লা কিংবা অমনি একটা কিছু

হবে।

কাঁচাগোল্লা? আমার দারুণ মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আচ্ছা—তাই সই! তোমায় কাঁচাগোল্লাই খাওয়াচ্ছি!

সামনেই কয়েকটা শুকনো মাটির ঢেলা পড়ে ছিল। তার দু-একটা তুলে নিয়ে বললুম, চলা আও—চলা আও—

সঙ্গে সঙ্গে নাকের ওপর আর-একটা ফল এসে পড়ল। বাঘের ল্যাজের ঘা খেয়ে নাকটা এমনিতেই বোঁচা হওয়ার জো—তার ওপর বাঁদরের এই বর্বর অত্যাচার! আমার শরীরে দস্তুরমতো ব্রহ্মতেজ এসে গেল।

চালাও ঢিল—লাগাও—

দমাদ্দম গাছের ওপর ঢিল চালাতে লেগে গেলুম। একেবারে মরিয়া হয়ে।

হঠাৎ বোঁ—ওঁ—ওঁ করে কেমন বেয়াড়া বিচ্ছিরি আওয়াজ।

এরোপ্লেন নাকি? আরে না-না—এরোপ্লেন কোথায়? গাছের একটা ডাল থেকে দল বেঁধে উড়ে আসছে ওরা কারা? চিনতে আমার একটুও কষ্ট হল না—ছেলেবেলায় মধুপুরে ওদের একটার মোক্ষম কামড় আমি খেয়েছিলুম। সেই থেকে ওদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।

ভীমরুল! আমার ঢিল বাঁদরের গায়ে লাগুক আর না-লাগুক—ঠিক ভীমরুলের চাকে গিয়ে লক্ষ্যভেদ করেছে।

মর্‌চি—মর্‌চি—খাউঞ্চি বলে বাঁদরটা এক লাফে কোথায় হাওয়া হল কে জানে! ওর মধ্যেই দেখতে পেলুম ওর নাকে মুখে ল্যাজে ভীমরুলেরা চেপে বসেছে। বোঝো—আমাকে ভ্যাংচানোর আর ঢিল মারবার মজাটা বোঝো!

কিন্তু এ কী! আমার দিকেও যে ছুটে আসছে ঝাঁক বেঁধে! এখন?

দৌড়দৌড়-মার দৌড়!

তবু সঙ্গ ছাড়ে না যে! যত ছুটছি, ততই যে পেছনে পেছনে আসছে ঝাঁক বেঁধে! এল—এল—এই এসে পড়ল—! গেছি এবার! কামড়ে আমাকে আর আস্ত রাখবে না!

এখন কী করি? বাঘের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে শেষে কি ভীমরুলের হাতে মারা যাব? আমি ঠিক এই সময়েই—

জয় গুরু! সামনে একটা পচা ডোবা!

ঝপাং করে আমি সেই ডোবাতেই সোজা ঝাঁপ মারলুম।

১৪.

কী পচা পাঁক, আর কী বিচ্ছিরি গন্ধ! কতক্ষণ আর মাথা ডুবিয়ে থাকা যায় তার ভেতরে! একটু মাথা তুলি, আর বোঁ—ওঁ—ওঁ! সমানে চক্কর দিচ্ছে ভীমরুলেরা। এ কী ল্যাঠায় পড়া গেল!

ভাগ্যিস ডোবাটায় বেশি জল নেই, নইলে তো ডুবে মরতে হত! হাঁটুসমান কাদা আর একটুখানি জলের ভেতর কোনওমতে ঘাপটি মেরে বসে আছি। চারিদিকে ব্যাঙ লাফাচ্ছে—নাকে কানে পোকা ঢুকছে, ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাচ্ছে। বাঘের গর্ত থেকে উঠে কি শেষতক পচা ডোবার মধ্যেই মারা যাব নাকি?

একবার মাথা ওঠাই—অমনি বোঁ-ও-ওঁ। আবার ডুব! অমনি করে কতক্ষণ কাটল জানি। তারপর যখন ভীমরুলেরা হতাশ হয়ে সরে পড়ল, তখন ভালো করে তাকিয়ে দেখে-টেখে আমি ডোবা থেকে উঠে এলুম।

ইঃ—কী খোলতাই চেহারাখানাই হয়েছে! একটু আগে আমি ছিলুম পটলডাঙার প্যালারাম—ওজন ছিল সর্বসাকুল্যে এক মন সাত সের। এখন আমি যে কে—ঠাহরই করতে পারলুম না। সারা গায়ে কাদার আস্তর পড়েছে, নিজের হাত-পা জামা কাপড় কিছু দেখতে পাচ্ছি না—পা তো ফেলছি না, যেন হাতির মতো পদক্ষেপ করছি। আমি এখন ওজনে অন্তত সাড়ে তিন মন—মাথার ওপর আরও পোয়াটাক ব্যাঙাচি নাচানাচি করছে।

কিন্তু এমন কী করি! কোন্ দিকে যাই?

কাদা-টাদাগুলো খানিক পরিষ্কার করলুম, জামা জুতো ডোবার জলেই ধুয়ে নিলুম। কিন্তু এখন কোন দিকে যাই! শীতে সারা শরীর জমে যেতে চাইছে। চারিদিকে ঘন জঙ্গল কোথায় যাব, কী করব কিছুই ঠিক করতে পারলুম না। টেনিদার কী হল—চারমূর্তির বাকি তিনজনই বা কোথায় কুট্টিমামা তাঁর শিকারিদের নিয়েই বা কোন্ দিকে গেলেন?

সে ভাবনা পরে হবে। এখন এই শীতের হাত থেকে কেমন করে রেহাই পাই?

বনের পাতার ফাঁক দিয়ে এক জায়গায় ঝলমলে রোদ পড়েছে খানিকটা। বেলা এখন বোধহয় দুপুরের দিকে। আমি সেই রোদের মধ্যে এসে দাঁড়ালুম। বেশ ঝাঁঝালো রোদ—এতক্ষণে একটু আরাম পাচ্ছি।

কিন্তু ল্যাঠা কি আর একটা নাকি? এইবারে টের পেলুম—পেটের মধ্যে ছুঁই ছুঁই করে উঠেছে। মানে—জোর খিদে পেয়েছে।

যেই খিদেটা টের পেলুম অমনি মনে হল আমি যেন কতকাল খাইনি—নাড়িভুঁড়িগুলো সব আবার ছিড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে চাইছে। খিদের চোটে আর দাঁড়াতে পারছি না আমি। মনে পড়ল, আসবার সময় টিফিন ক্যারিয়ার-ভর্তি খাবার আনা হয়েছিল—তাতে লুচি ছিল, আলুর দম ছিল, বেগুন ভাজা ছিল, সন্দেশ ছিল—

হায়, কোথায় ভ্যান—কোথায় লুচি আর আলুর দম! জীবনে কোনও দিন কি আর আলুর দমের মুখ দেখতে পাব আমি। কিছুক্ষণ পরে বনের ভেতরই পটলডাঙার প্যালারামের বারোটা বেজে যাবে। যদি বাঘ-ভালুকে না খায়, খিদেতেই মারা যাব।

নাঃ, আর পারা যায় না! কিছু একটা খাবার-দাবার জোগাড় করা দরকার।

যেই খাবার-দাবারের কথা ভাবলুম অমনি শরীরে তেজ এসে গেল। আমি দেখেছি, আমার এই রকমই হয়। সেই একবার হাবুলের ছোট ভাই বাবুলের অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন ছিল। আগের দিন রাতে কোঁ-কোঁ করে জ্বর এসে গেল। ভাবলুম, পরদিন ওরা সবাই প্রেমসে মাংস-পোলাও সাঁটবে আর আমার বরাতে কেবল বার্লির জল। দারুণ মনের জোর নিয়ে এলুম। বললে বিশ্বাস করবে না, সকালেই জ্বর একদম রেমিশন। খেয়েছিলুমও ঠেসে। অবশ্য সেদিন রাত থেকে...কিন্তু সে কথা বলে আর কাজ নেই। মানে, নেমন্তন্নটা তো আর ফসকাতে

দিইনি!

আপাতত আমায় খেতেই হবে। শীতফীত চুলোয় যাক।

বনে তো অনেক রকম ফল-পাকড় থাকে শুনেছি। মুনি-ঋষিরা সেইসব খেয়েই তপস্যা করেন। আমি গাছের দিকে তাকাতে তাকাতে গুটিগুটি এগোলুম। দুৎ—ফল কোথায়? কেবল পাতা আর পাতা! ছাগল হলে অবিশ্যি ভাবনা ছিল না। বড়দা আমাকে ছাগল বলে বটে, কিন্তু আমি তো সত্যিই-সত্যিই ঘাস-পাতা খেতে পারি না! ফল পাই কোথায়।

একটা গাছের তলায় কালো কালো কটা কী যেন পড়ে রয়েছে। একটা তুলে কামড় দিয়ে—দেখি—বাপরে! ইটের চাইতেও শক্ত—দাঁত বসবে না। একটু দুরেই লাল টুকটুকে গোটা-দুই ফল লতা থেকে ঝুলছিল—দৌড়ে গিয়ে একটা ছিড়ে নিলুম। কামড় দিতেই—আরে রামো-রামো! কী বিচ্ছিরি ভেতরটাতে, আর কী দারুণ বদ গন্ধ! থুথু করে ফেলে দিতে পথ পাই না। তখন মনে পড়ল—আরে, এ তো মাকাল! এ তো আমি দেখেছি আগেই! ছ্যা! ছ্যা!

মুনি-ঋষিদের নিকুচি করেছে! বনে ফল থাকে, না ঘোড়ার ডিম থাকে। এখন বুঝতে পাচ্ছি সব গুলপট্টি! আমাকে লাখ টাকা দিলেও আমি কখনও সাধুসন্নিসি হব না—প্রাণ গেলেও না।

কিন্তু খাই কী।

—ক্র্যাং!

পেছনে কেমন একটা বিটকেল আওয়াজ। আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলুম।

আবার সেই শব্দ : ক্র্যাং! ক্র্যাং!

এ আবার কী রে বাবা! কোথাও কিছু দেখছি না অথচ থেকে থেকে অমন যাচ্ছেতাই আওয়াজ করছে কে!

ক্র্যাং—কর-র-র—

একটা দৌড় মারব কি না ভাবছি—এমন সময় হুঁ হুঁ! ঠিক আবিষ্কার করেছি। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি!

দেখি না, পাশেই একটা নালা। তার ভিতরে গোলগাল একটি ভদ্রলোক। ওই আওয়াজ তিনিই করছেন।

ভদ্রলোক? আরে হ্যাঁ—হ্যাঁ—ভদ্রলোক ছাড়া কী বলা যায় আর? একটি নধর নিটোল কোলা ব্যাঙ! পিঠের ওপর বড় বড় টোপ তোলা মস্ত মস্ত চোখ দুটো কানের মতো খাড়া হয়ে রয়েছে। আমার দিকে ড্যাবডেবে চোখ তুলে চেয়ে রয়েছে, আর থেকে থেকে শব্দ করছে; ক্রাংক্রাংকর কুরু

করছে কী জানো? ফুটবলের ব্লাডারে হাওয়া দিলে যেমন করে ফোলে, তেমনিভাবে গলার দুপাশে বাতাস ভরে নিচ্ছে, গলাটা মোটা হয়ে উঠছে। আর বাতাসটা যেমনি ছেড়ে দিচ্ছে অমনি শব্দ হচ্ছে; ক্র্যাং—কড়াং—

বটে! তাহলে এমনি করেই কোলাব্যাঙ ডাকে। সারা বর্ষা এইভাবে গ্যাঙর-গ্যাঙর করে।

আমি ব্যাঙটাকে বললুম, খুব যে মেজাজে বসে আছিস দেখছি!

ব্যাঙ একটা মস্ত লাল জিভ বের করে দেখালে।

—আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস বুঝি?

ব্যাঙ গলার দুধারে বাতাস জড়ো করতে লাগল।

—এক চাঁটিতে তোকে উড়িয়ে দিতে পারি তা জানিস?

ব্যাঙটা আওয়াজ করলে; ক্র্যাং—কুর্‌র্‌! মানে যেন বলতে চাইল; ইস, ইয়ার্কি নাকি? চেষ্টা করেই দেখ না একবার!

—বটে!

—ক্রুং—ফুর্‌র—

-জানিস, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে? আমি ইচ্ছে করলে তোকে এক্ষুনি ভেজে খেতে পারি?

—তবে তাই খা—বলেই কে আমার পিঠে ঠাস্‌ করে একটা চাঁটি মারল।

—বাপরে—ভূত নাকি?

আমি হাত-তিনেক লাফিয়ে উঠলুম। তারপর দেখি, একমুখ দাঁত বের করে হাবুল সেন।

—হাবলা—তুই?

হাবুল বললে, হ, আমি। কিন্তু তোর এ কী দশা হইছে প্যালা? কাদা মাইখ্যা, ভূত সাইজ্যা অ্যাঁটা ব্যাঙের লগে মস্করা করতে আছস?

এই ফাঁকে ব্যাঙটা মস্ত লাফ দিয়ে ঝোপের মধ্যে কোথায় যেন চলে গেল।

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, খোশ-গল্প এখন থাক। কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে পারিস?

—আরে আমি খাবার পামু কই? সেই তখন থিক্যা জঙ্গলের মইধ্যে হারা উদ্দেশ্যে ঘুরতাছি। কে যে কোথায় চইলা গেল খুঁইজাই পাই না। শ্যাষে একটা গাছের নীচে শুইয়া ঘুম দিলাম।

—বনের মধ্যে ঘুমুলি?

-হ, ঘুমাইলাম।

—তোকে যদি বাঘে নিত?

হাবুল আবার একগাল হাসল; আমারে বাঘে খায় না।

—কী করে জানলি?

—আমি হাবুল স্যান না? উইঠ্যা বাঘেরে অ্যাঁমন অ্যাঁটা চোপড় দিমু যে—

বাকিটা হাবুল আর বলতে পারল না। হঠাৎ সমস্ত বন জঙ্গল কাঁপিয়ে কে যেন বিকট গলায় হ্যা-হ্যাঁ-হ্যাঁ করে হেসে উঠল। একেবারে আমাদের কানের কাছেই।

-ওরে বাপরে—

হাবুল আর ডাইনে বাঁয়ে তাকাল না। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল।

আবার সেই শব্দ; হ্যা-হ্যা-হ্যাঃ—

এবার সেই ভিজে কাপড়ে জামায় আমিও হাবুলের পেছন দে ছুট—দে ছুট।

—ওরে হাবলা, দাঁড়া-দাঁড়া যাসনি আমাকে ফেলে যাসনি—

১৫.

বেশি দূর দৌড়তে হল না। হাউ-মাউ করে খানিকটা ছুটেই একটা গাছের শেকড়ে পা লেগে হাবুল ধপাস্! সঙ্গে সঙ্গে আমিও তার পিঠের ওপর কুমড়োর মতো গড়িয়ে পড়লুম।

খাইছে—খাইছে!—হাবলা হাহাকার করে উঠল।

তারপর দুজনে মিলে জড়াজড়ি। ভাবছি পেছন থেকে এবার সেই অট্টহাসির ভূতটা এসে আমাদের দুজনকে বুঝি ক্যাঁক করে গিলে ফেলল।

কিন্তু মিনিট পাঁচেক গড়াগড়ি করেও যখন কিছুই হল না—আর মনে হল আমরা তো এখন কলেজে পড়ছি—ছেলেমানুষ আর নই, অমনি তড়াক করে উঠে পড়েছি। দুত্তোর ভূত! বাঘের গর্তে পড়েই উঠে এলুম—ভূতকে কিসের ভয়।

হাবুল সেন তো বিধ্বস্তভাবে পড়ে আছে, আর চোখ বুজে সমানে রাম রাম বলছে। বোধহয় ভাবছে ভূত ওর ঘাড়ের ওপর এসে চেপে বসেছে। থাক পড়ে। আমি উঠে জুল-জুল চোখে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম।

অমনি আবার সেই হাসির আওয়াজ; হ্যাঁ-হ্যাঃ—হ্যাঃ!

শুনেই আমি চিংড়িমাছের মতো তিড়িং করে লাফ মেরেছি। হাবুল আবার বললে, খাইছে—খাইছে!

কিন্তু কথাটা হল, হাসছে কে! আর আমাদের মতো অখাদ্য জীবকে খেতেই বা চাচ্ছে কে!

আরে ছ্যা ছা! মিথ্যেই দৌড় করালে! কাণ্ডটা দেখেছ একবার! ওই তো বকের মতো একটা পাখি, তার চাইতে গলাটা একটু লম্বা, কদমছাঁট চুলের মতো কেমন একটা মাথা কালচে রং, কুতকুতে চোখ। আবার দুটো বড়বড় ঠোঁট ফাঁক করে ডেকে উঠল : হ্যঃ—হ্যাঃ—

—ওরে হাবলা, উঠে পড়! একটা পাখি!

হাবুল সেন কি সহজে ওঠে? ঠিক একটা জগদ্দল পাথরের মতো পড়ে আছে। চোখ বুজে, তিনটে কুইনাইন একসঙ্গে খাচ্ছে এইরকম ব্যাজার মুখ করে বললে, রামনাম কর প্যালা—রামনাম কর। এইদিকে ভূতে ফ্যাকর ফ্যাকর কইর‍্যা হাসতাছে আর অর অখন পাখি দেখনের শখ হইল!

কী জ্বালা! আমি কটাৎ করে হাবুলের কানে একটা চিমটি কেটে দিলুম। হাবুল চ্যাঁ করে উঠল। আমি বললুম, আরে হতচ্ছাড়া, একবার উঠেই দ্যাখ না! ভূত-টুত কোথাও নেই—একটা লম্বা-গলার পাখি অমনি আওয়াজ করে হাসছে।

—কী, পাখিতে ডাকতাছে!—বলেই বীরের মতো লাফিয়ে উঠল হাবুল। আর তক্ষুনি সেই বিচ্ছিরি চেহারার পাখিটা হাবুলের দিকে তাকিয়ে, গলাটা একটু বাঁকিয়ে, চোখ পিটপিট করে, ঠিক ভেংচি কাটার ভঙ্গিতে হ্যা-হ্যা করে ডেকে উঠল।

হাবুল বললে, অ্যাঁ—মস্করা করতে আছস আমাগো সঙ্গে? আরে আমার রসিক পাখি রে! অখনি তবে ধইর‍্যা রোস্ট বানাইয়া খামু।

আমার পেটের ভেতরে সেই খিদেটা আবার তিং পাং তিং পাং করে লাফিয়ে উঠল। আমি বললুম, রোস্ট বানাবি? তবে এক্ষুনি বানিয়ে ফ্যাল না ভাই। সত্যি বলছি, দারুণ খিদে পেয়েছে।

কিন্তু কোথায় রোস্ট—কোথায় কী! হাবলাটা এক নম্বরের জোচ্চোর! তখুনি দু-তিনটে মাটির চাঙড় তুলে নিয়ে ছুড়ে দিয়েছে পাখিটার দিকে। আর পাখিটা অমনি ক্যাঁক্যাঁ আওয়াজ করে পাখা ঝাপটে বনের মধ্যে ভ্যানিশ।

—গেল-গেল—রোস্ট পালিয়ে গেল—বলে আমি পাখিটাকে ধরতে গেলুম। কিন্তু ও কি আর ধরা যায়!

ভীষণ ব্যাজার হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। পাখিদের ওই এক দোষ। হয় দুটো ঠ্যাং থাকে—সেই ঠ্যাং ফেলে পাঁই-পাঁই করে পালিয়ে যায়, নয় দুটো ডানা থাকে—সাঁই সাঁই করে উড়ে যায়। মানে, দেখতে পেলেই ওদের রোস্ট করা যায় না। খুব খারাপ-পাখিদের এসব ভারি অন্যায়।

আমি বললুম, এখন কী করা যায় হাবুল?

হাবুল যেন আকাশজোড়া হাঁ করে হাই তুলল। বললে, কিছুই করন যায় না বইস্যা থাক।

-কোথায় বসে থাকব?

-যেখানে খুশি। এইটা তো আর কইলকাতার রাস্তা না যে ঘাড়ের উপর অ্যাঁকটা মটরগাড়ি আইস্যা পোড়।

-কিন্তু বাঘ তো এসে পড়তে পারে।

—আসুক না। —বেশ জুত করে বসে পড়ে হাবলা আর-একটা হাই তুলল; বাঘে আমারে খাইব না। তোরে ধইরা খাইতে পারে। কিন্তু তোরে খাইয়া বাঘটা নিজেই ফ্যাচাঙে পইড়া যাইব, গা। বাঘের পেটের মধ্যে পালাজ্বরের পিলা হইব। —বলেই মুখ-ভর্তি শাঁকালুর মতো দাঁত বের করে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল।

ভিজে ভূত হয়ে আছি—সারা গা-ভর্তি এখনও পাঁক। ওদিকে পেটের ভিতর খিদেটা সমানে তেরে-কেটে-তাক বাজাচ্ছে। এদিকে এই হনোলুলু—না মাদাগাস্কার না-না সুন্দরবন—দুত্তোর, ডুয়ার্সের এই যাচ্ছেতাই জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে রয়েছি। তার ওপর একটু পরেই রাত নামবে—তখন হাতি, গণ্ডার, বাঘ, ভালুক সবাই মোকাবিলা করতে আসবে আমাদের সঙ্গে। এখন এইসব ফাজলামি ভালো লাগে? ইচ্ছে হল, হালার কান পেঁচিয়ে একটা পেল্লায় থাপ্পড় লাগিয়ে দিই।

কিন্তু হাবলাটা আবার বক্সিং শিখেছে। ওকে ঘাঁটিয়ে সুবিধে করতে পারব না। কাজেই মনের রাগ মনেই মেরে জিজ্ঞেস করলুম, তোকে বাঘে খাবে না কী করে জানলি?

হাবুল গম্ভীর হয়ে বললে, আমার কুষ্ঠীতে লেখা আছে ব্যাঘ্রে আমারে ভোজন করব না।

আমি রেগে বললুম, দুটোর কুষ্ঠীর নিকুচি করেছে! আমাদের পাড়ার যাদবদার কুষ্ঠীতে তো লেখা ছিল সে অতি উচ্চাসনে আরোহণ করবে। এখন যাদবদা রাইটার্স বিল্ডিংয়ের দশতলার ঘরগুলো ঝাঁট দেয়।

হাবুল বললে তা উচ্চাসনই তো হইল।

আমি ভেংচে বললুম, তা তো হইল। কিন্তু ব্যাঘ্রে না-হয় ভোজন করবে না ভালুক এসে যদি ভক্ষণ করে কিংবা হাতি এসে পায়ের তলায় চেপটে দেয়, তখন কী করবি?

এইবার হাবুল গম্ভীর হল।

—হ, এই কথাটা চিন্তা করন দরকার। ক্যাপ্টেন টেনিদা হাতির পিঠে উইঠ্যা কোথায় যে গেল—সব গোলমাল কইরা দিছে। অ্যাকটা বুদ্ধি দে প্যালা। কোন্ দিকে যাওয়া যায়—ক দেখি?

—যাওয়ার কথা পরে হবে। সত্যি বলছি হাবুল, এখুনি কিছু খেতে না পেলে আমি বাঁচব না। কী খাওয়া যায় বল তো?

—হাতি-ফাতি ধইর‍্যা খা—আর কী খাবি?

ওর সঙ্গে কথা কওয়াই ধাষ্টামো। এদিকে এত ভূতের ভয়—ওদিকে দিব্যি আবার লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। যেন নিজের মোলায়েম বিছানাটিতে নবাবি কেতায় গা এলিয়ে দিয়েছে। একটু পরেই হয়তো ঘুরঘুর করে খাসা নাক ডাকাতে শুরু করবে। ও-হতচ্ছাড়াকে বিশ্বাস নেই—ও সব পারে।

কিন্তু আমায় কিছু খেতেই হবে। আমি খাবই।

চারদিকে ঘুরঘুর করছি। নাঃ—কোথাও একটা ফল নেই—খালি পাতা আর পাতা। বনে নাকি হরেক রকমের ফল থাকে আর মুনি-ঋষিরা তাই তরিবত করে খান। স্রেফ গুলপট্টি!

এমন সময় : কুঁক-কুঁর-কোঁর্-র্—

যেই একটা ঝোপের কাছাকাছি গেছি, অমনি একজোড়া বনমুরগি বেরিয়ে ভোঁ-দৌড়। আমার আবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ইস্-পাখিদের কেন ঠ্যাং থাকে। বিশেষ করে মুরগিদের? কেন ওরা কারি কিংবা রোস্ট হয়ে জন্মায় না?

কিন্তু জয় গুরু! ঝোপের মধ্যে চারটে সাদা রঙের ও কী? অ্যাঁ—ডিম! মুরগির ডিম!

খপ করে দুহাতে দুটো করে ডিম তুলে নিলুম। হাবুলের দিকে তাকিয়ে দেখি ঘুমুচ্ছে। ঘুমুক হতভাগা! ওকে আর ভাগ দিচ্ছি না। এ চারটে ডিম আমিই খাব। কাঁচাই খাব।

একটা ভেঙে যেই মুখে দিয়েছি—ব্যস! আমার চোয়াল সেইখানেই আটকে গেল। আমার সামনে কোত্থেকে এসে দাঁড়িয়েছে এক বিকট কালো মূর্তি—ঝোপের ভেতর মনে হল নির্ঘাত একটা মস্ত ভালুক!

এমনিতে গেছি অমনিতেও গেছি! আমি একটা বিকট চিৎকার করে ডাকলুম : হাবুল। তারপর হাতের একটা ডিম সোজা ছুড়ে দিলুম ভালুকটার দিকে।

আর ভালুক তক্ষুনি ডিমটা লুফে নিয়ে স্পষ্ট মানুষের গলায় বললে, দে না। আর আছে?

১৬. শেষ পর্যন্ত কুট্টিমামা

ভালুকে বাংলা বলে! এমন পরিস্কার ভাষায়!

আমার মাথার চুলগুলো খাড়া হতে যাচ্ছিল, কিন্তু জলে কাদায় মাখামাখি বলে খাড়া হতে পারল না। তার বদলে সারা গায়ে যেন পিঁপড়ে সুড়সুড় করতে লাগল, কানের ভেতর কুটুং কুটুং করে আওয়াজ হতে লাগল। অজ্ঞান হব নাকি? উঁহু কিছুতেই না! বারে বারে অজ্ঞান হওয়ার কোনও মানে হয় না—ভারি বিচ্ছিরি লাগে।

ঠিক এই সময় পেছন থেকে হাবুল বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠল : পলা—পলাইয়া আয় প্যালা—তরে ভাল্লুকে খাইব।

ভাল্লুকে খাইব শুনেই আমি উল্লুকের মতো একটা লাফ দিয়েছি। আর ভালুকটা অমনি করেছে কী—তার চাইতেও জোরে লাফ দিয়ে এসে ক্যাঁক করে আমার ঘাড়টা চেপে ধরেছে।

আমি কাঁউ কাঁউ করে বললুম, গেছি—গেছি—

আর ভালুক ভেংচি কেটে বললে, গেছি—গেছি! যাবি আর কোথায়? কথা নেই, বার্তা নেই—গেলেই হল!

আরে রামঃ—এ যে ক্যাবলা! একটা ধুমসো কম্বল গায়ে!

—ক্যাবলা—তুই!

—আমি ছাড়া আর কে? পটলডাঙার শ্রীমান্ ক্যাবলা মিত্তির—অর্থাৎ শ্রীযুক্ত কুশলকুমার মিত্র। দাঁড়া—সব বলছি। তার আগে ডিমটা খেয়ে নিই—বলে ডিমটা ভেঙে পট করে মুখে ঢেলে দিলে।

কী যে ভীষণ রাগ হল সে আর কী বলব! ভালুক সেজে ঠাট্টা তার ওপর আবার এত কষ্টের ডিম বেশ আমেজ করে খেয়ে নেওয়া! তাকিয়ে দেখি আমার হাতে একটাও ডিম নেই—সব মাটিতে পড়ে একেবারে আঁড়ো। সেই যে লাফটা মেরেছিলুম—তাতেই ওগুলোর বারোটা বেজে গেছে।

এদিকে মজাসে ডিমটা খেয়ে ক্যাবলা গান জুড়ে দিয়েছে; হামটি ডামটি স্যাট অন্ এ ওয়াল—

আমি ক্যাবলার কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলুম। বললুম, রাখ তোর হামটি-ডামটি! কোন্ চুলোয় ছিলি সারাদিন? একটা মোটা ধুমসো কম্বল গায়ে চড়িয়ে এসে এসব ফাজলামো করবারই বা মানে কী?

ক্যাবলা বললে, আরে বলছি, বলছি—হড়বড়াতা কেঁউ? লেকিন হাবুল কিধর ভাগা?

তাই তো হাবুল সেন কোথায় গেল? এই তো গাছতলায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছিল। তারপর আমাকে ডেকে বললে, পালা—পালা। কিন্তু পালিয়েছে দেখছি নিজেই। কোথায় পালাল?

দুজনে মিলে চেঁচিয়ে ডাক ছাড়লুম : ওরে হাবলা রে ওরে হাবুল সেন রে—

হঠাৎ ওপর থেকে আওয়াজ এল : এই যে আমি এইখানে উঠেছি—

তাকিয়ে দেখি, ন্যাড়া-মুড়ো কেমন একটা গাছের ডালে উঠে হাবুল ঘুঘুর মতো বসে আছে।

ক্যাবলা বললে, উঠেছিস, বেশ করেছিস। নেমে আয় এখন। উতাররা।

—নামতে তো পারতাছি না। তখন বেশ তড়াং কইর‍্যা তো উইঠ্যা বসলাম। অখন দেখি লামন যায় না। কী ফ্যাচাঙে পইর‍্যা গেছি ক দেখি? এইদিকে আবার লাসায় কামড়াইয়া গা ছুইল্যা দিতে আছে!

আমি বললুম, লাসায় কামড়ে তোকে তিব্বতে পাঠাচ্ছে।

হাবুল খ্যাঁচখেঁচিয়ে বললে, ফালাইয়া রাখ তর মস্করা। অখন আমি ক্যামন কইর‍্যা? বড় ল্যাঠায় পড়ছি তো!

ক্যাবলা বললে, লাফ দে।

—ঠ্যাং ভাঙব!

—তা হলে ডাল ধরে ঝুলে পড়। আমরা তোর পা ধরে টানি।

—ফালাইয়া দিবি না তো চালকুমড়ার মতন?

-আরে নানা!

—তাই করি! অখন যা থাকে কপালে—

বলেই হাবুল ডাল ধরে নীচে ঝুলে পড়ল। আমি আর ক্যাবলা তক্ষুনি ওপরে লাফিয়ে উঠে হাবুলের দুপা ধরে হেঁইয়ো বলে এক হ্যাঁচকা টান।

—সারছে—সারছে—কম্মো সারছে—বলতে বলতে হাবুল আমাদের ঘাড়ে পড়ল। তারপরে তিনজনেই একসঙ্গে গড়িয়ে গেলুম। আমার নাকটায় বেশ লাগল কিন্তু কী আর করা—বন্ধুর জন্যে সকলকেই এক-আধটু কষ্ট সইতে হয়।

উঠে হাত-পা ঝেড়ে তিনজনে গোল হয়ে বসলুম। আমার গল্প শুনে ক্যাবলা তো হেসেই অস্থির।

—খুব যে হাসছিস? যদি বাঘের গর্তে গিয়ে পড়তিস, টের পেতিস তা হলে!

—বাঘের পাল্লায় আমিও পড়িনি বলতে চাস?

—তুইও?

হাবুল মাথা নেড়ে বললে, পড়বই তো। ব্যাবাকে পড়ব। ক্যাবল আমি না। আমার কুষ্ঠীতে লেখা আছে; ব্যাঘ্রে আমারে কক্ষনো ভোজন করব না।

আমি ধমকে বললুম, চুপ কর হাবলা তোর কুষ্ঠীর গল্প বন্ধ কর। তোর কী হয়েছিল রে ক্যাবলা?

—হবে আবার কী! হাতির পায়ের দাগ ধরে ধরে আমি তো এগোচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ কানে এল ধুড়ুম করে এক বন্দুকের আওয়াজ।

—হ, আওয়াজটা আমিও পাইছিলাম—হাবুল জানিয়ে দিলে।

—অঃ, থাম না হাবলা! বলে যা ক্যাবলা—

ক্যাবলা বলে চলল, তারপরেই দেখি বনের মধ্যে দিয়ে একটা বাঘ পাঁই-পাঁই করে দৌড়ে আসছে। দেখে আমার চোখ একেবারে চড়াং করে চাঁদিতে উঠে গেল। আমিও বাপ বাপ করে দৌড় একেবারে মোটরটার কাছে চলে গেলাম। তারপর মোটরের কাচ-টাচ বন্ধ করে চুপ করে অনেকক্ষণ বসে রইলুম।

—সেই বাঘটাই বোধহয় আমার গর্তে গিয়ে পড়েছিল—আমি বললুম।

—হতে পারে, ক্যাবলা বললে; খুব সম্ভব সেটাই। যাই হোক, আমি তো মোটরের মধ্যে বসে আছি। ঘণ্টা-দুই পরে নেমে টেনিদার খোঁজে বেরুব—এমন সময়, ওরে বাবা!

—কী কী?—আমি আর হাবুল সেন একসঙ্গে জানতে চাইলুম।

—কী আর?—ভীমরুলের চাক। একেবারে বোঁ-বোঁ করে ছুটে আসছে।

আমি বললুম, হুঁ—আমার ঢিল খেয়ে।

ক্যাবলা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, উ তো ম্যয় সমঝ লিয়া! তোর মতো গর্দভ ছাড়া এমন ভালো কাজ আর কে করবে! দৌড়ে আবার গিয়ে মোটরে উঠলুম। ঠায় বসে থাকো আর-এক ঘণ্টা। তারপর দেখি, ড্রাইভারের সিটের পাশে কম্বল রয়েছে একটা। বুদ্ধি করে সেটা গায়ে জড়িয়ে নেমে এলুম ভীমরুল যদি ফের তেড়ে আসে, তা হলে কাজে লাগবে। অনেকক্ষণ এদিকে ওদিকে খুঁজে শেষে আবিষ্কার করলুম, শ্রীমান প্যালারাম বনমুরগির ডিম হাতাচ্ছেন। তারপর—

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, তারপর আর বলতে হবে না—সব জানি। তুই তো তবু একটা ডিম খেলি আর আমার হাত থেকে পড়ে সবগুলো গেল। ইস—এমন খিদে পেয়েছে যে এখন তোকে ধরে আমার কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে!

ক্যাবলা বললে, এই খবদার, কামড়াসনি। আমার জলাতঙ্ক হবে।

–জলাতঙ্ক হবে মানে? আমি কি খ্যাপা কুকুর নাকি?

হাবুল বললে, —কইব কেডা?

আমি হাবুলকে চড় মাতে যাচ্ছিলুম, ক্যাবলা বাধা দিলে। বললে, বন্ধুগণ, এখন আত্মকলহের সময় নয়। মনে রেখো, আমাদের লিডার টেনিদা হাতির পিঠে চড়ে উধাও হয়েছে। তাকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

—সে কি আর আছে? হাতিতে তারে মাইর্যা ফ্যালাইছে! বলেই হাবলা হঠাৎ কেঁদে ফেলল; ওরে টেনিদা রে—তুমি মইরা গেলা নাকি রে?

শুনেই আমারও বুকের ভেতর গুরগুর করে উঠল। আমিও আর কান্না চাপতে পারলুম না।

–টেনিদা, ও টেনিদা–তুমি কোথায় গেলে গো—

এমন যে শক্ত, বেপরোয়া ক্যাবলা–তারও নাক দিয়ে ফোঁসফোঁস করে গোটাকয়েক আওয়াজ বেরুল। তারপর আরশোলার মতো খুব করুণ মুখ করে সেও ডুকরে কেঁদে উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় পেছন থেকে কে যেন বললে, আরে—আরে–এই তো তিনজন বসে আছে!

চমকে তাকিয়ে দেখি, কুট্টিমামা, শিকারি আর বাহাদুর।

আমরা আর থাকতে পারলাম না। তিনজনে একসঙ্গে হাহাকার করে উঠলুম : কুট্টিমামা গো, টেনিদা আর নেই।

কুট্টিমামার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

–সে কি! কী হয়েছে তার?

হাবুল তারস্বরে ডুকরে উঠে বলল, তারে বুনা হাতিতে নিয়া গেছে কুট্টিমামা তারে নিয়া গিয়া অ্যাঁক্কেবারে মাইর্যা ফ্যালাইছে!

কুট্টিমামার হাত থেকে বন্দুকটা ধপাৎ করে মাটিতে পড়ে গেল।

১৭. হাতি থেকে কাটলেট

একটু সামলে-টামলে নিয়ে কুট্টিমামা বললেন, বুনো হাতিতে নিয়ে গেল।

আমরা সবাই কোরাসে গলা তুলে বললুম, হুঁ!

তাই শুনে কুট্টিমামা মাথার চাঁদির ওপর টাকটাকে কিছুক্ষণ কুরকুর করে চুলকোলেন। শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে বললেন, মানে, তা কী করে হয়? হাতিতে নেবে কেমন করে?

হাবুল বললে, হ, নিয়া গেল। হাতি আসতাছে দেইখ্যা আমরা গাছে উঠছিলাম। টেনিদা না—ডাল ভাইঙা একটা হাতির পিঠে গিয়া পড়ল। আর হাতিটাও গাছের পাতা চাবাইতে চাবাইতে তারে কোনখানে য্যান নিয়া গেল।

—তারপর?

ক্যাবলা বললে, আমরা তিনজনে তাকে খুঁজতে বেরুলুম। আমি একটা বন্দুকের আওয়াজ পেলুম। তারপর দেখি একটা বাঘ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসছে। আমি একেবারে এক লাফে গিয়ে মোটরে!

শিকারি বললে, হুঁ, সেই বাঘটা—যেটাকে আমরা গুলি করেছিলুম। পায়েও চোট লেগেছিল।

কুট্টিমামা বললেন, তারপর?

হাবুল বললে, মনের দুঃখে এক বৃক্ষতলে শয়ন কইর‍্যা আমি ঘুমাইয়া পড়লাম। আমার ভাবনা কী —কুষ্ঠীতে লেখা আছে ব্যাঘ্রের নি আমারে কক্ষনো ভক্ষণ করব না। উইঠ্যা দেখি প্যালা সারা গায়ে কাদা মাইখ্যা ভূত সাইজ্যা একটা মস্ত কোলা ব্যাঙ ধইর‍্যা খাইতাছে।

কুট্টিমামা বললেন, কী সর্বনাশ! কোলা ব্যাঙ ধরে খাচ্ছে।

হাবুল সেনটা কী মিথ্যুক দেখেছ। আমি ভয়ঙ্কর আপত্তি করে বললুম, না মামা—আমি কোলা ব্যাঙ ধরে খাইনি। ওই হাবলাই তো পাখির ডাক শুনে দৌড়ে পালাল। আমি একটা গর্তের ভেতর পড়েছিলুম আর বাঘটা গিয়ে সেই গর্তেই একটা শজারুর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল।

মামা বললেন, অ্যাঁ! তবে কুলিরা যে গর্ত কেটেছে, বাঘটা তাতেই পড়েছে নাকি? কিন্তু প্যালারাম— তুমি উঠে এলে কী করে?

—স্রেফ ইচ্ছাশক্তির জোরে, কুট্টিমামা! নইলে বাঘটা যেভাবে দাপাদাপি করছিল, তাতে ওর ল্যাজের চোট খেয়েই আমার প্রাণটা বেরিয়ে যেত—থাবার ঘা খাওয়ার দরকার হত না।

কিছুক্ষণ কুট্টিমামা আমার মুখের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর আবার কুরকুরিয়ে টাকটাকে চুলকে নিয়ে বললেন, বাঘটা তা হলে সেই গর্তের মধ্যেই আছে বলছ?

—নির্ঘাত!

—যাক, বাঘের জন্যে তবে ভাবনা নেই। কাল তুলব বাছাধনকে। কিন্তু টেনি—

বলতেই আবার হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল হাবুল : তারে হাতিতেই মাইরা ফেলছে কুট্টিমামা— এতক্ষণে হালুয়া বানাইয়া রাখছে!

শুনে আমিও ফোঁসফোঁস করে কাঁদতে লাগলুম, আর ক্যাবলা নাক-টাক কুঁচকে কেমন একটা কুঁ—কুঁ আওয়াজ করতে লাগল।

শিকারি মামার কানে-কানে কী বললে। মামা গম্ভীর হয়ে বললেন, আমারও তাই সন্দেহ হচ্ছে। নইলে এখানে বুনো হাতি কেমন করে আসবে! তা ছাড়া হাতি তো বটেই। যদি ভয়-টয় পেয়ে—

শিকারি মাথা নেড়ে বললে, তা ঠিক।

তখন কুট্টিমামা আমাদের দিকে তাকালেন। ডেকে বললেন, শোনো, এখন আর কান্নাকাটি করে লাভ

নেই। চলো সব গাড়িতে। তোমাদের লিডারকে খুঁজতে যেতে হবে।

হাবুল ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, তারে কি আর পাওন যাইব?

কুট্টিমামা বললেন, একটা জায়গা আগে দেখে আসি। সেখানে যদি হদিস না পাই, তাহলে বনের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করতে হবে। চলো এখন গাড়িতে কুইক!

গাড়িটা দূরে ছিল না। আমরা উঠে বসতে না বসতেই ড্রাইভার স্টার্ট দিলে। মামা তাকে কী একটা জায়গায় যেতে বলে দিলেন, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

বনের ভেতর তখন অল্প-অল্প করে সন্ধ্যা নামছে। হেডলাইটের আলো জ্বেলে গাড়ি ছুটল।

হাবুল ফিসফিস করে আমাকে জিজ্ঞেস করলে, এই প্যালা, আমরা কোথায় যাইতাছি ক দেখি?

বিরক্ত হয়ে বললুম, কুট্টিমামাকে জিজ্ঞেস কর, আমাকে কেন?

—না, খুব ক্ষুধা পাইছে কিনা! গাড়িতে টিফিন ক্যারিয়ার-ভর্তি খাবার তো উঠেছিল! সেইগুলি গেল কোথায়?

ঠিক আমার মনের কথা বলে দিয়েছে! এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলুম, এইবার টের পেলুম, পেটের ভেতর তিরিশটা ছুঁচো যেন একসঙ্গে হা-ডু-ডু খেলছে। টিফিন ক্যারিয়ারটা পেলে সত্যি খুব কাজ হত। ওতে লুচি, আলুর দম, ডিমসেদ্ধ এইসব ছিল।

ইস—কতদিন যে আমি আলুর দম খাইনি। আর লুচি যে কী রকম সে তো বলতে গেলেই ভুলেই গেছি। লুচি কী দিয়ে বানায়—সুজি না পোস্ত দিয়ে? লুচি কি হাতখানেক করে লম্বা হয়?

আর থাকতে না পেরে আমি ক্যাবলাকে একটা খোঁচা দিলুম।

ক্যাবলা মুখটাকে ঠিক চামচিকের মতো করে বসে ছিল। আমার খোঁচা খেয়ে খ্যাঁচখেচিয়ে উঠল।

—ক্য হুয়া? জ্বালাচ্ছিস কেন?

আমি চুপি চুপি বললুম, আঃ চাঁচাসনি। কুট্টিমামা শুনতে পাবে। বলছিলুম, বড্ড খিদে পেয়েছে। সেই যে টিফিন ক্যারিয়ারটা সঙ্গে এসেছিল, সেটা কোথায় বল দিকি?

ক্যাবলা হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল।

—ছিঃ প্যালা, তোর লজ্জা হওয়া উচিত। টেনিদার এখনও দেখা নেই—কোথায় হাতির পিঠে চেপে সে চলে গেল, আর তুই এখন খেতে চাইছিস?

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, না-না-না—এমনিতে জানতে চাইছিলুম।

কী করা যায়—চুপ করে বসে থাকতে হল। সত্যি কথা—লিডার টেনিদার জন্যে আমারও বুকের ভেতর তখন থেকে আঁকুর-পাঁকুর করছে। কিন্তু খিদেটাও যে আর সইতে পারছি না। টেনিদা বেঁচে আছে কি না জানি না, কিন্তু আমিও যে আর বেশিক্ষণ বেঁচে থাকব, সে কথা আমার মনে হচ্ছে না।

কী আর করি—চুপ করে বসে আছি। গাড়িটা বনের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে। অন্ধকার দুধারে বেশ ঘন হয়ে এসেছে নানা রকম পাখি ডাকছে। ঝিঝিরা ঝিঁ ঝিঁ করছে।

হঠাৎ হাবুল চেঁচিয়ে উঠল, বাঘ বাঘ—

আবার বাঘ! এ কী বাঘা কাণ্ডে পড়া গেল রে বাবা!

কুট্টিমামা বললেন, কোথায় বাঘ?

আমি ততক্ষণে দেখেছি। বললুম, ওই যে দুরে দেখা যাচ্ছে। মোটরের আলোয় দুটো লাল চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে ওখানে।

কুট্টিমামা হেসে বললেন, বাঘ নয়, ও খরগোশ।

—খরগোশ! অতবড় চোখ! অমন জ্বলে?

—জানোয়ারদের চোখ অমনিই হয়। আলো পড়লে ওইভাবেই জ্বলে। দ্যাখো—দ্যাখো—

গাড়িটা তখন কাছে এসে পড়েছে। দেখি, সত্যিই তো একটা খরগোশ! একেবারে গাড়ির সামনে দিয়ে লাফিয়ে পাশের ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হল।

ক্যাবলা বললে, খরগোশের চোখই এই! বাঘের চোখ হলে—

—আগুনের মতো দপদপ করত। শিকারে স্পটিংয়ের সময় চোখ দেখেই জানোয়ার ঠাহর করা যায়।

—স্পটিং কাকে বলে?

—একটা সার্চলাইটের মতো আলো। স্পটলাইট বলে তাকে। রাত্রে বনের মধ্যে সেইটে ফেলে শিকার খুঁজতে হয়। জানোয়ারের চোখে পড়লে থমকে দাঁড়িয়ে যায়—ধাঁধা লেগে যায় ওদের। তখন গুলি করে মারে।

কথাটা শুনে আমার ভালো লাগল না। এ অন্যায়। মারতে চাও তো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মারো। চোখে আলো ফেলে, ধাঁধিয়ে দিয়ে গুলি করে মারা কাপুরুষের লক্ষণ। আমি পটলডাঙার প্যালারাম জীবনে আমি হয়তো কখনও শিকারি হতে পারব না, কিন্তু যদি হই, এমন অন্যায় আমি কিছুতে করব না।

ঘ্যাস-স্—

গাড়িটা থেমে গেল। আরে—এ কোথায় এসেছি।

বনের বাইরে কয়েকটা তাঁবু। পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। একদিকে তিন-চারটে হাতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কলাগাছ খাচ্ছে। আর তাঁবুর সামনে—

একটা টেবিলে জনতিনেক লোক বসে বসে তরিবত করে খাচ্ছে। তাদের একজন—

আমরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলুম : টেনিদা!!!

টেনিদা গম্ভীর গলায় বললে, কী, এসে গেছিস সব? এখন বিরক্ত করিসনি, আমি কাটলেট খাচ্ছি।

আর টেবিল থেকে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে কুট্টিমামাকে বললেন, এই যে গজগোবিন্দবাবু, আসুন—আসুন। আপনার ভাগ্নে আমাদের হাতির পিঠে সোয়ার হয়ে এসে উপস্থিত—ভয়ে হাফ ডেড! আমরা অনেকটা চাঙ্গা করে তুলেছি এতক্ষণে। আসুন আসুন—চা খান—

আমরা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লুম। আর তাই দেখে টেনিদা গোগ্রাসে কাটলেটটা মুখে পুরে দিলে।

সেই ভদ্রলোক বললেন, এসো—এসো। তোমরা আসবে আন্দাজ করেছিলুম, তোমাদের জন্যেও কাটলেট ভাজা হচ্ছে।

ব্যাপারটা বুঝেছ তো এতক্ষণে? না, না—ওরা বুনো হাতি নয়, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পোষা হাতি। মাসখানেক হল ওঁরা কী কাজে এখানে ক্যাম্প করেছেন। ওঁদেরই হাতি চরতে চরতে এদিকে এসেছিল, আর টেনিদা তারই একটার পিঠে চড়াও হয়ে—

কী কাণ্ড! কী কাণ্ড!

কাটলেট ভাজা হচ্ছে হোক—কিন্তু আমার যে প্রাণ যায়! ক্যাবলাকে বললুম, ক্যাবলা, সেই টিফিন ক্যারিয়ারটা—

ক্যাবলা বললে, দি আইডিয়া। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে কোত্থেকে সেটাকে টেনে নামাল।

তারপর?

তারও পর? উহু, আর নয়। অনেকখানি গল্প আমি তোমাদের শুনিয়েছি, এর পরেরটুকু যদি নিজেরা ভেবে নিতে না পারে, তাহলে মিথ্যেই তোমরা চারমূর্তির অভিযান পড়েছ।

ঝাউ বাংলোর রহস্য

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়

ঝুমুরলাল চৌবেচক্রবর্তী

কথা ছিল, আমরা পটলডাঙার চারজন—টেনিদা, হাবুল সেন, ক্যাবলা আর আমি শ্রীমান প্যালারাম-গরমের ছুটিতে দার্জিলিং বেড়াতে যাব। কলকাতায় একশো সাত ডিগ্রি গরম চলছে, দুপুর বেলা মোটর গাড়ির চাকার তলায় লেপটে যাচ্ছে গলে যাওয়া পিচ, বাতাসে আগুন ছুটছে। গরমের ধাক্কায় আমাদের পটলডাঙার গোপালের মতো সুবোধ কুকুরগুলো পর্যন্ত খেঁকি হয়ে উঠেছে। একটাকে তাক করে যেই আমের আঁটি ছুঁড়েছি, অমনি সেটা ঘ্যাঁক করে তেড়ে এল! আমের আঁটিটা একবার চাটা তো দূরে থাক, শুকে পর্যন্ত দেখলে না!

এরপর আর থাকা যায় কলকাতায়? তোমরাই বলল?

আমরা চারজনেই এখন সিটি কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি, আর ছেলেমানুষ নই। তায় সামার ভ্যাকেশন। কাজেই বাড়ি থেকে পারমিশন পেতে দেরি হল না। খালি মেজদার বকবকানিতেই কানের পোকা বেরিয়ে যাওয়ার জো। নতুন ডাক্তার হয়েছে—সব সময়ে তার বিদ্যে ফলানো চাই! আরও বিশেষ করে মেজদার ধারণা, আমি একটা জলজ্যান্ত হাসপাতাল। পৃথিবীর সমস্ত রোগের মূর্তিমান ডিপো হয়ে বসে আছি, তাই যত বিটকেল ওষুধ আমার গেলা দরকার। সারাদিন ধরে আমাকেই পুটুস-পুটুস করে ইনজেকশন দিতে পারলে তবেই মেজদার আশা মেটে!

মেজদা বলল—যাচ্ছিস যা, কিন্তু খুব সাবধান! তোর তো খাবার জিনিস দেখলেই আর মাথা ঠিক থাকে না। সে চীনেবাদামই হোক আর ফাউল-কাটলেটই হোক। হুঁশিয়ার হয়ে খাবি, সিঞ্চল লেক থেকে দার্জিলিঙে যে-জল আসে, সেটা এমনিতেই খারাপ, তার সঙ্গে যদি যা-তা খাস, তাহলে স্রেফ হিলডাইরিয়া হয়ে বেঘোরে মারা যাবি।

এসব কথার জবাব দেবার কোনও মানে হয় না। আমি গোঁজ হয়ে রইলুম।

তারপরে বাবা আর মায়ের উপদেশ, বড়দার শাসানি—লেখাপড়া শিকেয় তুলে দিয়ে একমাস ধরে ওখানে আড্ডা দিয়ো না। ছোড়দির তিন ডজন গোল্ড স্টোন, ছ-ছড়া পাথরের মালা, ছ-খানা ওয়ালপ্লেটের ফরমাস। শুনতে শুনতে দিকদারি ধরে গেল। কোনওমতে পেন্নাম-টেন্নাম সেরে শিয়ালদা স্টেশনে এসে হাড়ে বাতাস লাগল।

বাকি তিন মূর্তি অনেক আগেই এসে একটা থার্ড ক্লাস কামরায় জমিয়ে বসেছে। বেশি খুঁজতে হল না, টেনিদার বাজখাঁই গলার ডাক শোনা গেল—চলে আয় প্যালা, ইদিকে চলে আয়—

দেখি তিনজনেই তারিয়ে-তারিয়ে অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাচ্ছে।

গাড়িতে উঠে ঝুপ করে বাক্স-বিছানা রেখে প্রথমেই বললুম,বারে, আমার অরেঞ্জ স্কোয়াশ?

—তরটা কাটা গেছে। লেট কইর‍্যা আসছস, তার ফাইন।

হাবুল সেন জানিয়ে দিলে।

আমি চ্যাঁ-চ্যাঁ করে প্রতিবাদ জানালুম—লেট মানে? এখনও কুড়ি মিনিট দেরি আছে ট্রেন ছাড়তে।

—যদি কুড়ি মিনিট আগেই ট্রেন ছেড়ে দিত, কী করতিস তা হলে? টেনিদা গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলে।

—কেন কুড়ি মিনিট আগে ছাড়বে?

—রেখে দে তোর টাইম টেবিল! চোঁ-চোঁ করে অরেঞ্জ স্কোয়াশটা সাবাড় করল টেনিদা । ও তো রেল কোম্পানির একটা হাসির বই। এই তো পরশু জেঠিমা এল হরিদ্বার থেকে দুন এক্সপ্রেসে চেপে। ভোর পাঁচটায় গাড়িটা আসবে বলে টাইম টেবলে ছাপা রয়েছে, এল বেলা বারোটার সময়। সাতঘণ্টা লেট করে গাড়ি আসতে পারে, আর কুড়ি মিনিট আগে ছেড়ে দিতে পারে না? কী যে বলিস তার ঠিক নেই।

যত বাজে কথা!—আমি চটে বললুম, আমিও একটা অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাব।

টেনিদা বললে—খাবিই?

—খাবই।

—নিজের পয়সায়?

—নিশ্চয়।

ক্যাবলা বললে, তোর যে রকম তেজ হয়েছে দেখছি তাতে তোকে ঠেকানো যাবে না। তা হলে কিনেই ফেল। চারটে। মানে চারটেই তোর নিজের জন্য নয়, আমরাও আছি।

হাবুল মাথা নেড়ে বললে—হ, এই প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।

টেনিদা বললে—ডিটো।

ছাড়ল না। চারটে কেনাল আমাকে দিয়ে। আর সেগুলো আমরা শেষ করতে-না করতেই টিং-টিং-টিঙা-টিং করে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের ঘণ্টা পড়ল।

পথের বর্ণনা আর দেব না, তোমরা যারা দার্জিলিঙে গেছ তারা সবাই তা ভালো করেই জানো। সকরিগলির স্টিমারে গলাগলি করে মনিহারিতে হারি-কি-জিতি বলে বাক্স ঘাড়ে করে বাড়ির ওপর দিয়ে রেস লাগিয়ে সে যে কী দারুণ অভিজ্ঞতা সে আর বলে কাজ নেই। ক্যাবলা আছাড় খেয়ে একেবারে কুমড়োর মতো গড়িয়ে গেল, কোথেকে কার এক ভাঁড় দই এসে হাবুল সেনের মাথায় পড়ল, আমার বাঁ পা-টা একটুখানি মচকে গেল আর ছোট লাইনের গাড়িতে উঠবার সময় একটা ফচকে চেহারার লোকের সঙ্গে টেনিদার হাতাহাতির জো হল।

এই সব দুর্ঘটনার পাট মিটিয়ে গুড়গুড়িয়ে আমরা শিলিগুড়িতে পৌঁছলুম ভোরবেলায়। দূরে নীল হয়ে রয়েছে হিমালয়ের রেখা, শাদা মেঘ তার ওপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। স্টেশনের বাইরে বাস আর ট্যাক্সির ভিড়।

দার্জিলিং—দার্জিলিং—খরসাং

কালিম্পং—কালিম্পং—

টেনিদার সঙ্গে মনিহারিতে যে-মারামারি করবার চেষ্টা করছিল সেই ফচকে চেহারার মিচকে লোকটা একটা বাসের ভেতরে বসে মিটমিট করে তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে। দেখলুম, শিলিগুড়ির এই গরমের ভেতরই লোকটা গায়ে নীল রঙের একটা মোটা কোট চড়িয়েছে, গলায় জড়িয়েছে মেটে রঙের আঁশ-ওঠা-ওঠা একটা পুরনো মাফলার। মুখের সরু গোঁফটাকে বাগিয়ে এমন একখানা মুচকি হাসি হাসল যে পিত্তি জ্বলে গেল আমাদের।

লোকটা গলা বাড়িয়ে দিয়ে বললে কী হে খোকারা, দার্জিলিং যাবে?

এসব বাজে লোকের বাজে কথায় কান দিতে নেই। কিন্তু মনিহারি থেকে চটেই ছিল টেনিদা। গাঁ-গাঁ করে বলল —আপনার মতো লোকের সঙ্গে আমরা কোথাও যেতে চাই না।

লোকটা কি বেহায়া! এবারে দাঁত বের করে হাসল। আমরা দেখতে পেলুম, লোকটার উঁচু-উঁচু দাঁতগুলো পানের ছোপ লাগানো, তার দুটো আবার পোকায় খাওয়া।

—যাবে না কেন? বাসে বিস্তর জায়গা রয়েছে, উঠে পড়ো।

—না।

—না কেন?—তেমনি পানেরাঙানো পোকায়-খাওয়া দাঁত দুটো দেখিয়ে ফচকে লোকটা চোখ কুঁচকে হাসল। অ—রাগ হয়েছে বুঝি? তা রেলগাড়িতে ওঠা-নামার সময় অমন দুচারটে কথা কাটাকাটি হয়েই থাকে! ওজন্যে কিছু মনে করতে নেই। তোমরা হচ্ছ আমার ছোট ভাইয়ের মতো, আদর করে একটু কান-টান মলে দিলেই বা কী করতে পারতে? এসো খোকারা, উঠো এসো। আমি তোমাদের পথের সিনারি দেখাতে-দেখাতে নিয়ে যাব। অস্পর্ধা দেখ, আমাদের কান মলে দিতে চায়। লোকটা বাসে চেপে না থাকলে নির্ঘাত টেনিদার সঙ্গে

হাতাহাতিই হয়ে যেত। টেনিদা চিৎকার করে বলল—শাট আপ।
লোকটা এবার হি-হি করে হাসল।
—গেলে না তো আমার সঙ্গে? হায়, তোমরা জানো না, তোমরা কী হারাইতেছ!
—আমরা জানতে চাই না।
ভোঁপ ভোঁপ শব্দ করে বাসটা ছেড়ে দিলে। লোকটা গলা বাড়িয়ে আবার বললে—তোমাদের একটা চকোলেট প্রেজেন্ট করে যাচ্ছি। হয়তো পরে আমার কথা ভাববার দরকার হবে তোমাদের। তখন আর এত রাগ থাকবে না।
বলতে বলতে কী একটা ছুঁড়ে দিলে আমাদের দিকে আর পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাবের উইকেটকিপার ক্যাবলা নিছক অভ্যাসেই সেটা খপ করে ধলে ফেলল।
চকোলেট-বটে! পেল্লায় সাইজের একখানা!
ক্যাবলা বলল—এটা ফেলে দিই টেনিদা?
চটে গেলেও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে টেনিদার ভুল হয় না। ঝাঁ করে চকোলেটটা কেড়ে নিল ক্যাবলার হাত থেকে। মেজাজ চড়েই ছিল, একেবারে খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল।
—ইঃ, ফেলে দেবেন! অত বড় একটা চকোলেট ফেলে দিতে যাচ্ছেন। একেবারে নবাব সেরাজদ্দৌল্লা এসেছেন। এটা আমার। আমিই তো ঝগড়া করে আদায় করলুম।
—আমরা ভাগ পামু না টেনিদা?—হাবুল সেন জানতে চাইল।
টেনিদা গম্ভীর হল!—পরে কনসিডার করা যাবে বলে চকোলেটটা পকেটস্থ করল।
সামনে বাস আর ট্যাক্সি সমান ডাকাডাকি করছে—দার্জিলিং—খরসাং—কালিম্পং—
আমি বললুম—দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে টেনিদা? একটা বাসে-টাসে উঠে পড়া যাক।
—দাঁড়া না ঘোড়ার ডিম। আগে সোরাবজীর রেস্তোরাঁ থেকে ভালো করে রেশন নিয়ে নিই। নইলে পঞ্চাশ মাইল পাহাড়ি রাস্তায় যেতে যেতে পেটের নাড়িভুড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে যাবে। চল, খেয়ে আসা যাক।
খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি ঠিক করতে আরও ঘণ্টাখানেক গেল। তারপর বাক্স খুলে গরম কোট-টোট বের করে নিয়ে আমরা রওনা হলুম দার্জিলিঙের পথে।
নীল পাহাড়ের দিকে আমাদের গাড়িখানা ছুটে চলল তীরের বেগে। চমৎকার রাস্তা। একটু এগিয়ে চায়ের বাগান, তারপর দু'ধারে শুরু হয়ে গেল শালের বন। ঠাণ্ডা-ছায়া আর হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে গেল যেন। আমি বেশ উদাস গান জুড়ে দিলাম—"আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি"
হাবুল সেন কানে হাত চাপা দিয়ে বললে—ইস, কী একখানা সুরই বাইর করতাছস! গানটার বারোটা তো বাজাইলি!
না হয় গলার সুর-টুর আমার তেমন নেই। তাই বলে হাবুল সেন সে কথা বলবার কে! ও তো গলা দিয়ে একটি সুর বের করতে পারে, সেটা হল গর্দভরাগিণী। আমি চটে বললুম-আহা-হা, তুই তো একেবারে সাক্ষাৎ গন্ধর্ব।
ক্যাবলা বললে—তুমলোগ কাজিয়া মত করো। (ক্যাবলা ছেলেবেলায় পশ্চিমে থাকত, তাই মধ্যে মধ্যে হিন্দী জবান বেরিয়ে আসে ওর মুখ দিয়ে) আসল কথা হল, প্যালার এই গানটি এখানে গাইবার কোনও রাইট নেই। এই বনের ভেতর ও স্বচ্ছন্দেই মারা যেতে পারে। আমরা বাধা দিলেও মারা যেতে পারে, কিন্তু এখানে কিছুতেই ওর জন্ম হয়নি। যদি তা হত, তাহলে ও গাছে-গাছে লাফিয়ে বেড়াত, আমাদের সঙ্গে এই মোটরে কিছুতেই বসে থাকত না।
আমাকে বাঁদর বলছে নাকি? একটু আগেই গাছে গোটাকতককে দেখা গেছে—সেইটেই ওর বক্তব্য নয় তো?
আমি কী যেন বলতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল টেনিদা।—এর মানে কী? কী মানে হয় এ-কবিতার?

কবিতা? কিসের কবিতা? আমরা তিনজনে টেনিদার দিকে তাকালুম। একটা নীল রঙের ছোট কাগজ ওর হাতে।

—কোথায় পেলে ওটা? টেনিদা বললে—ওই চকোলেটর প্যাকেটের ভেতর ভাঁজ করা ছিল। টেনিদার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে হাবুল সেন পড়ল—

মিথ্যে যাচ্ছ দার্জিলিং।
সেখানে আছে হাতির শিং।
যাবে তো যাও নীলপাহাড়ি,
সেথায় নড়ে সবুজ দাড়ি।
সেইখানেতে ঝাউ বাংলায়
(লেখা নেইকো 'বুড়ো আংলা'য়)
গান ধরেছে হাঁড়িচাঁচায়,
কুণ্ডুমশাই মুণ্ডু নাচায়।

শ্রীঝুমুরলাল চৌবে চক্রবর্তী

আমরা চারজন কবিতা পড়ে তো একেবারে থ! প্রায় পাঁচ মিনিট পরে মাথা চুলকে ক্যাবলা বলল—এর অর্থ কী?

দু'ধারের ছায়াঘেরা শালবনের ভেতর থেকে এক কোনও অর্থ খুঁজে পাওয়া গেল না।

সে ই স বু জ দা ড়ি

তারপর দার্জিলিঙে গিয়ে আমরা তো সব ভুলে গিয়েছি। আর দার্জিলিঙে গেলে কারই বা অন্য কথা মনে থাকে বলো! তখন আকাশ জুড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা ঝলমল করে, ম্যাল দিয়ে টগবগিয়ে ঘোড়া ছোটে, জলাপাহাড়ে উঠছি তো উঠছিই। সিঞ্চলের বুননা পথে ক' রকম পাখি ডাকছে। কলকাতার গরমে মানুষ যখন আইঢাই করছে আর মনের দুঃখে আইসক্রিম খাচ্ছে, তখন গরম কোট গায়ে দিয়েও আমরা শীতে ঠকঠক করে কাঁপছি।

আমরা উঠেছিলাম স্যানিটোরিয়ামে। হুল্লোড়ের এমন জায়গা কি আর দার্জিলিঙে আছে! পাহাড় ভেঙে ওঠানামা করতে এক-আধটু অসুবিধা হয় বটে, কিন্তু দিব্যি জায়গাটি! তাছাড়া খাসা সাজানো ফুলের বাগান, মস্ত লনে ইচ্ছে করলে ক্রিকেট-ফুটবল খেলা যায়, লাইব্রেরির হলে টেবিল-টেনিস আর ক্যারামের বন্দোবস্ত। খাই-দাই, খেলি, ঘোড়ায় চড়ি, বেড়াই আর ফটো তুলি। এক বটানিকসেই তো শ-খানিক ছবি তোলা হল। এমনি করেষযার-পাঁচদিন মজাসে কাটাবার পর একদিন ক্যাবলাটাই টিকটিক করে উঠল।

—দুৎ, ভালো লাগছে না।

আমরা তিনজন এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম!

ভালো লাগছে না মানে?

—মানে, ভালো লাগছে না।

টেনিদা চটে বললেন—কলেজে ক্লাস করতে পারছে না কিনা, তাই ওর মন খারাপ। এখানকার কলেজ তো খোলাই রয়েছে। যা না কাল লজিকের ক্লাসে ঢুকে পড়।

ক্যাবলা বললে—যাও-যাও!

হাবুল সেন বললে—আমরা যামু ক্যান? আমরা এইখানে থাকুম। তর ইচ্ছা হইলে তুই যা গিয়া। যেইখানে খুশি।

ম্যালের বেঞ্চিতে বসে আমরা চারজনে চীনেবাদাম খাচ্ছিলুম, ক্যাবলা তড়াক করে উঠে পড়ল। বললে—তা হলে তাই যাচ্ছি। যাচ্ছি গাড়ি ঠিক করতে। কাল ভোরে আমি একাই যাব টাইগার হিলে সানরাইজ দেখতে।

টেনিদা সঙ্গে সঙ্গে একখানা লম্বা হাত বের করে ক্যাবলাকে পাকড়ে ফেলল।

—আরে তাই বল, টাইগার হিলে যাবি! এ তো সাধু প্রস্তাব। আমরাও কি আর যাব না?

—না, তোমাদের যেতে হবে না। আমি একাই যাব। হাবুল গম্ভীর হয়ে বললে—পোলাপানের একা যাইতে নাই টাইগার হিলে। বাঘে ধইর‍্যা খাইব।

—ওখানে বাঘ নেই।—ক্যাবলা আরও গম্ভীর।

আমি বললুম—বেশ তো, মোটরের ভাড়াটা তুই একাই দিস। তোর যখন এত জেদ চেপেছে তখন না হয় একাই যাস। আমরা শুধু তোর বডিগার্ড হয়ে যাব এখন। মানে তোকে যদি বাঘে-টাঘে ধরতে আসে—

ক্যাবলা হাত-পা নেড়ে বললে—দুত্তোর, এগুলোর খালি বকরবকর! সত্যই যদি যেতে হয়, চলো এইবেলা গাড়ি ঠিক করে আসি, ক'দিন ধরে আবহাওয়া ভালো যাচ্ছে—বেশি মেঘ বা কুয়াশা হলে গিয়ে শীতে কাঁপাই সার হবে।

পরদিন ভোর চারটায় টাইগার হিলে রওনা হলাম আমরা। বাপ, কী ঠাণ্ডা! দার্জিলিঙ ঠাণ্ডায় জমে আছে। ঘুম স্টেশন রাশি রাশি লেপ কম্বল গায়ে জড়িয়ে ঘুমে অচেতন। শীতের হাওয়ায় নাক কান ছিড়ে উড়ে যাওয়ার জোর। ল্যান্ড রোভার গাড়ি, ঢাকাঢ়াক বিশেষ নেই, প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করে উঠল।

টেনিদা চটে বললে—ধুত্তোর ঘোড়ার ডিমের টাইগার হিল। ক্যাবলার বুদ্ধিতে পড়ে যত ভোগান্তি। একেবারে

জমিয়ে দিলে।

হাবুল বললে—হ, আমাগো আইসক্রিম বানাইয়া ছাড়ব।

লেপ-টেপগুলো গায়ে জড়িয়ে এলে ভালো হত।—আমি জানালুম।

ক্যাবলা বললে—অত বাবুগিরির শখ যখন, কলকাতায় থাকলেই পারতে। পৃথিবীর কত দেশ থেকে কত লোক টাইগার হিলে সানরাইজ দেখতে আসে আর এইটুকু ঠাণ্ডায় ওঁদের একেবারে প্রাণ বেরিয়ে গেল!

—অ—এইটুকু ঠাণ্ডা। —দাঁত ঠকঠকিয়ে টেনিদা বললে!—এইটুকু ঠাণ্ডায় বুঝি তোর মন ভরছে না! আচ্ছা বেশ, কাল মাঝরাতে তোকে এক বালতি বরফ জল দিয়ে স্নান করিয়ে দেব এখন।

আমি বললুম-শরীর গরম করার বেস্ট উপায় হচ্ছে গান। এসো, কোরাসে গান ধরা যাক।

টেনিদা গজগজ করে কী যেন বললে, ক্যাবলা চুপ করে রইল, কিন্তু গানের নামে হাবুল একপায়ে খাড়া। দু'জনে মিলে যেই গলা ছেড়ে ধরেছি : 'হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো' অমনি নেপালী ড্রাইভার দারুণ আঁতকে হাঁই-হাঁই করে উঠল! পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বললে—অমন বিচ্ছিরি করে চেঁচিয়ে চমকে দেবেন না বাবু। খাড়া পাহাড়ি রাস্তা—শেষে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলব।

কী বেরসিক লোক!

টেনিদা মোটা গলায় বললে—রাইট। গান তো নয় যেন একজোড়া শেয়াল কাঁঠাল গাছের তলায় বসে মরা কান্না জুড়েছে।

ক্যাবলা ফিকফিক করে হাসতে লাগল। আর আমি ভীষণ মন খারাপ করে বসে রইলাম। হাবুল আমার কানে ফিসফিস করে সান্ত্বনা দিয়ে বললে—তুই দুঃখ পাইস না প্যালা। কাইল তুই আর আমি নিরিবিলিতে বার্চ-হিলে গিয়া গান করুম। এইগুলান আমাগো গানের কদর কী বুঝব!

যাই হোক, টাইগার-হিলে তো গিয়ে পৌঁছানো গেল। সেখানে এর মধ্যেই বিস্তর গাড়ি আর বিস্তর লোক জড়ো হয়েছে। পাহাড়ের মাথায় সানরাইজ দেখার যে-জায়গাটা রয়েছে তার একতলা-দোতলা একেবারে ভর্তি। আমরা পাশাপাশি করে দোতলায় একটুখানি দাঁড়াবার ব্যবস্থা করে নিলুম।

সামনের অন্ধকার কালো পাহাড়টার দিকে চেয়ে আছি সবাই। ওখান থেকেই সূর্য উঠবে, তারপর বাঁ দিকের ঘুমন্ত কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর সাতরঙের মায়া ছড়িয়ে দেবে। রাশি রাশি ক্যামেরা তৈরি হয়ে রয়েছে। পাহাড় আর বনের কোলে থেকে-থেকে কুয়াশা ভেসে উঠছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

তারপর সেই সূর্য উঠল। কেমন উঠল? কী রকম রঙের খেলা দেখা দিল মেঘ আর কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপরে? সে আর আমি বলব না। তোমরা যারা টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখেছ, তারা তো জানোই ; যারা দেখোনি, না দেখলে কোনওদিন তা জানতে পারবে না।

ক্লিক ক্লিক ক্লিক! খালি ক্যামেরার শব্দ। আর চারদিকে শুনতে পাচ্ছি, 'অপূর্ব! অদ্ভুত! ইউনিক।'

টেনিদা বললে—সত্যি ক্যাবলাকে মাপ করা যেতে পারে। এমন গ্র্যান্ড সিনারি কোনওদিন দেখিনি।

ঠিক সেই সময় পাশ থেকে মোটা গলায় কে বললে—তাই নাকি? কিন্তু এর চেয়েও ভালো সিনারি দেখতে হলে নীল-পাহাড়িতেই যাওয়া উচিত তোমাদের।

নীলপাহাড়ি! আমরা চারজনেই একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলুম। সঙ্গে সঙ্গে সেই অদ্ভুত ছড়াটার কথা মনে পড়ে গেল আমাদের।

একটা ঢাউস কম্বলে লোকটার মুখ-টুক সব ঢাকা, শুধু নাকটা বেরিয়ে আছে। সে আবার মোটা গলায় সুর টেনে বললে—

গান ধরেছে হাঁড়িচাঁচায়,
কুণ্ডুমশাই মুণ্ডু নাচায়।

বলেই সে কম্বলটা সরিয়ে নিলে আর আবছা ভোরের আলোয় আমরা দেখলুম, তার গলায় আঁশ-ওঠা একটা চকোলেট রঙের মাফলার জড়ানো, তার মিচকি মুখে মিচকি হাসি।

—কে?—কে? —বলে টেনিদা যেই চেঁচিয়ে উঠেছে, অমনি চারদিকের ভিড়ের মধ্যে কোথায় স্কট করে মিলিয়ে গেল লোকটা।

কিন্তু সেই গাদাগাদি ভিড়ের ভেতর কোথাও আর তাকে দেখা গেল না। দোতলায় নয়, একতলায় চায়ের স্টলে নয়, এমনকি বাইরে যে-সব গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, তাদের ভেতরেও কোথাও নয়। যেন কুয়াশার ভেতর থেকে সে দেখা দিয়েছিল, আবার কুয়াশার মধ্যেই কোথায় মিলিয়ে গেল।

আমরা চারজনে অনেকক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। সূর্য অনেকখানি উঠে পড়ল আকাশে, চারদিক ভরে গেল সকালের আলোয়, ঝকমক করে জ্বলতে লাগল কাঞ্চনজঙ্ঘা। একটার-পর-একটা গাড়ি নেমে যেতে লাগল দার্জিলিঙের দিকে। সেই রহস্যময় লোকটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল কে জানে!

টেনিদা বললে-স্ট্রেঞ্জ!

আমি বললুম রীতিমতো গোয়েন্দা কাহিনী! হেমেন্দ্রকুমারের উপন্যাসের চেয়েও রহস্যময়।

হাবুল সেন কান-টান চুলকে বললে—আমার মনে হয়—এই সমস্ত ভূতের কাণ্ড।

ক্যাবলাটাই আমাদের ভেতর সব চাইতে মাথা ঠাণ্ডা এবং আগে ঝণ্ডিপাহাড়িতে কিংবা ডুয়ার্সের জঙ্গলে সব সময়েই দেখেছি ও কিছুতেই ঘাবড়ায় না। ক্যাবলা বললে—ভূত হোক কিংবা পাগলই হোক, সুবিধে পেলেই ওর সঙ্গে মোকাবিলা করা যাবে। কিন্তু এখন ও-সব ভেবে লাভ নেই, চলো, বেশ করে চা খাওয়া যাক।

চা-টা খেয়ে বেরিয়ে আমরা কেভেন্টারের ডেয়ারি দেখতে গেলুম। সেখানে পেল্লায় পেল্লায় গোরু আর ঘাড়ে-গদানে ঠাসা মোটা শুয়োর। শুয়োর দেখলেই আমার গবেষণা করতে ইচ্ছা হয়। কেমন মনে হয় দুচো আর শুয়োর পিসতুতো ভাই। একটা ছুঁচোর ল্যাজ একটু কেটে দিয়ে বেশ করে ভিটামিন খাওয়ালে সেটা নির্ঘাত একটা পুরুষ্টু শুয়োরে দাঁড়িয়ে যাবে বলে আমার ধারণা। প্রায়ই ভাবি, ডাক্তার মেজদাকে একটু জিগগেস করে দেখব। কিন্তু মেজদার যা খিটখিটে মেজাজ, তাকে জিগগেস করতে ভরসা হয় না। আচ্ছা, মেজাজওয়ালা দাদাই কি সংক্ষেপে মেজদা হয়? কে জানে!

ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা গেলুম সিঞ্চল লেক দেখতে-লেক মানে কলকাতার লেক নয়, চিল্কাও নয়। দুটো মস্ত চৌবাচ্চায় ঝরনার জল ধরে রেখেছে, আর তাই পাইপে করে দার্জিলিঙের কলে পাঠিয়ে দেয়। দেখে মেজাজ বিগড়ে গেল।

কিন্তু জায়গাটা বেশ। চারিদিকে বন, খুব নিরিবিলি। বসবার ব্যবস্থাও আছে এখানে-ওখানে। ভোরবেলায় গানটা গাইবার সময় বাধা পড়তে মনটা খারাপ হয়েই ছিল, ভাবলুম এখানে নিরিবিলিতে একটুগলা সেধে নিই। ওরা তিনজন দেখছিল, কী করে জল পাম্প করে তোলে। আমি একা একটা বাঁধানো জায়গাতে গিয়ে বসলুম। তারপর বেশ গলা ছেড়ে ধরলুম—

‘খর বায়ু বয় বেগে, চারদিক ছায় মেঘে
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো—

ঠিক তক্ষুনি পেছন থেকে কে বললে শাবাশ!

তাকিয়ে দেখি বনের রাস্তা দিয়ে এক ভদ্রলোক উঠে এসেছেন। মাথায় একটা বাঁদুরে রঙের কান ঢাকা টুপি, চোখে নীল চশমা, হাতে মোটা লাঠি, মুখে পাকা গোঁফ।

ভদ্রলোক বললেন—বেশ গাইছ তো! তোমার অরিজিনালিটি আছে। মানে গানটা রবিঠাকুরের হলেও বেশ নিজের মতো সুর দিয়েছ।

চটব, না খুশি হব বুঝতে পারলুম না।

ভদ্রলোক বললেন—তোমার মতো প্রতিভাবান ছেলেই আমার দরকার। যাবে আমার সঙ্গে?
অবাক হয়ে আমি বললুম—কোথায়?
ভদ্রলোক হেসে বললেন—নীলপাহাড়ি।
সেই নীলপাহাড়ি! আমি বিষম খেলুম একটা।
ভদ্রলোক হেসেই বললেন কী আছে দার্জিলিঙে? কিছু না! ভিড়—ভিড়—ভিড়। শুধু ম্যালে বসে হাঁ করে থাকা, নয় খামকা ঘোড়া দাবড়ানো আর নইলে শীতে কাঁপতে কাঁপতে একবার টাইগার-হিল দেখে আসা। কোনও মানে হয় ও-সবের! চলো নীলপাহাড়িতে। দেখবে, কী আশ্চর্য জায়গা—কী ফুল—কী অপূর্ব রহস্য! আমি সেইখানেই থাকি। সেখানকার ঝাউ বাংলোয়।
ঝাউবাংলো! আমি আবার খাবি খেলুম।
তখন ভদ্রলোক একটানে বাঁদুরে টুপিটা খুলে ফেললেন। টুপির আড়ালে একমুখ দাড়ি। কিন্তু আসল রহস্য সেখানে নয়, আমি দেখলুম তাঁর দাড়ির রং সবুজ! একেবারে ঘন সবুজ।
একবার হাঁ করেই মুখটা বন্ধ করলুম আমি। আমার মাথাটা ঘুরতে লাগল-লাটুর মতো বনবনিয়ে।

ফ র মু লা ব না ম কা গা মা ছি

আমার মাথাটা সেই-যে বনবনিয়ে লাটুর মতো ঘুরতে লাগল, তাতে মনে হল, সারা সিঞ্চল পাহাড়টাতেই আর গাছগাছালি কিছু নেই, সব সবুজ রঙের দাড়ি হয়ে গেছে। আর সেই দাড়িগুলো আমার চারপাশে বোঁ বোঁ করে পাক খাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে উঠেছিলুম, সঙ্গে সঙ্গেই ধপাস করে বাঁধানো বেঞ্চিটায় বসে পড়তে হল। বুড়ো ভদ্রলোক বললেন কী হল খোকা?

আমি উত্তরে বললুম—ওফ।

ওফ, মানে? ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বললেন—ব্যাপার কী হে? পেট কামড়াচ্ছে? ফিক ব্যথা উঠেছে? নাকি মৃগী আছে তোমার? এইটুকু বয়সেই এইসব রোগ তো ভালো নয়।

মাথাটা একটু একটু সাফ হচ্ছে, আমি কিছু একটা বলতে গেলুম। তাঁর আগেই তিনমূর্তি—টেনিদা, ক্যাবলা, আর হাবুল সেন এসে পৌঁছেছে। আর বুড়ো ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়েই হাবুল সেন খাইছে বলে দুহাত লাফিয়ে সরে গেল। ক্যাবলার চোখ দুটো ঠিক আলুর চপের মতো বড় বড় হয়ে উঠল। আর টেনিদা বলে ফেলল—ডিলা গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস!

ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে চারদিক তাকালেন। বললেন- কী হয়েছে বলো দেখি? তোমরা সবাই আমাকে দেখে অমন ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? আর ওই যে কী বললে—"ডিলা মেফিস্টোফিলিস"—ওরই বা মানে কী? টেনিদা বললে—ওটা ফরাসী ভাষা।

—ফরাসী ভাষা! ভদ্রলোক তার সবুজ দাড়ি বেশ করে চুমরে নিয়ে বললেন-"আমি দশ বছর ফ্রান্সে ছিলুম, এরকম ফরাসী ভাষা তো কখনও শুনিনি। আর মেফিস্টোফিলিস মানে তো শয়তান! তোমরা আমাকে বুড়ো মানুষ পেয়ে খামকা গালাগালি দিচ্ছ নাকি হে?

এবার মনে হল, ভদ্রলোক রীতিমতো চটেই গেছেন।

আমাদের ভেতর ক্যাবলাই সবচাইতে চালাক আর চটপটে, ও কিছুতেই কখনও ঘাবড়ে যায় না। ও-ই সাহস করে ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে এল। বলল—আজ্ঞে আপনার দাড়িটা...

-কী হয়েছে দাড়িতে?

—মানে সবুজ দাড়ি আমরা কেউ কখনও দেখিনি কিনা, তাই

—ওঃ এই কথা!—ভদ্রলোক এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন আর আমরা দেখতে পেলুম ওঁর সামনের পাটিতে একটা দাঁত নেই, আর একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। হাসির সঙ্গে সঙ্গে ওঁর নাক দিয়ে ফোঁতফোঁত আওয়াজ হল।

বেশ খানিকটা সোনালি দাঁতের ঝিলিক আর ফোকলা দাঁতের ফাঁক দেখিয়ে হাসি থামালেন। তারপর বললেন —ওটা আমার শখ। আমি একজন প্রকৃতি-প্রেমিক, মানে বন-জঙ্গল গাছপালা এইসব নিয়ে পড়ে থাকি। একটা বইও লিখছি গাছ-টাছ নিয়ে। তাই শ্যামল প্রকৃতির সঙ্গে ছন্দ মেলাবার জন্যে দাড়িটাকেও সবুজ রঙে রাঙিয়ে নিয়েছি। বুঝতে পারলে?

টেনিদা হঠাৎ ফস করে জিগগেস করলে—আপনি কবিতা লেখেন স্যার?

হাবুল বললে-হ-হ, আপনি পদ্য লিখতে পারেন?

—পদ্য? কবিতা? ভদ্রলোকের মুখখানা আবার আহ্লাদে ভরে উঠল—তা লিখেছি বই কি এককালে। তোমাদের তখন জন্ম হয়নি। তখন কত কবিতা মাসিকপত্রে বেরিয়েছে আমার। এখন অবিশ্যি ছেড়েছুড়ে দিয়েছি। কিন্তু মগজে ভাব চাগিয়ে উঠলে মাঝে-মাঝে দুটো-চারটে বেরিয়ে আসে বই কি। এই তো সেদিন

রাত্তিরে চাঁদ উঠেছে, পাইনগাছের মাথাগুলো ঝলমল করছে, আর আমি বসে বসে একটা ইংরেজি প্রবন্ধ লিখছি। হঠাৎ সব কী রকম হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখি আমার কলমটা যেন আপনিই তরতর করে কবিতা লিখে চলেছে। কী লিখেছিলুম একটু শোনো—

ওগো চাঁদিনী রাতের পাইন—
ঝলমল করছে জ্যোৎস্না
দেখাচ্ছে কী ফাইন!
ঝিরঝির করে ঝরনা ঝরছে
প্রাণের ভেতর কেমন করছে
ভাবগুলো সব দাপিয়ে মরছে
ভাঙছে ছন্দের আইন—
ওগো পাইন।

—কী রকম লাগল?

আমরা সমস্বরে বললুমফাইন! ফাইন!

ভদ্রলোক আর একবার দাড়িটা চুমরে নিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। আরও কোনও কবিতা বোধহয় তাঁর মাথায় আসছিল। কিন্তু ক্যাবলা ফস করে জিগগেস করলে আপনি মুণ্ডু নাচাতে পারেন?

—মুণ্ডু নাচাব? কার মুণ্ডু নাচাতে যাব আবার? টেনিদা জিগগেস করলে—আপনি কুণ্ডুমশাই বুঝি?

—কুণ্ডুমশাই? আমার চৌদ্দপুরুষেও কেউ কুণ্ডুমশাই নেই। আমার নাম সাতকড়ি সাঁতরা। আমার বাবার নাম পাঁচকড়ি সাঁতরা। আমার ঠাকুর্দার নাম—

হাবুল বলে ফেলল—তিনকড়ি সাঁতরা।

সাতকড়ি অবাক হয়ে গেলেন—তুমি জানলে কী করে?

—দুইটা কইর‍্যা সংখ্যা বাদ দিতে আছেন কিনা, তাই হিসাব কইর‍্যা দেখলাম। আপনের ঠাকুর্দার বাবার নাম হইব এককড়ি সাঁতরা। তেনার বাবার নাম যে কী হইব—হিসাবে পাইতেছি না; মাইনাস দিয়া করন লাগব মনে হয়।

—শাবাশ-শাবাশ! সাতকড়ি সাঁতরা হাবুলের পিঠটা বেশ ভালো করে থাবড়ে দিলেন। —তোমার তো খুব বুদ্ধি আছে দেখছি। কিন্তু আমার ঠাকুর্দার কথা ভেবে আর মন খারাপ কোরো না—তাঁর নাম আমারও জানা নেই। যাই হোক, ভারি খুশি হলুম। আমি তোমাদের চারজনকেই ঝাউ বাংলোয় নিয়ে যাব।

ঝাউ বাংলো! —ওরা তিনজনেই এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠল।

—আহা! সেই কথাই তো বলছিলুম তোমার এই বন্ধুকে। আহা, কী জায়গা! দার্জিলিঙের মতো ভিড় নেই, চেঁচামেচি নেই, নোংরাও নেই। পাইন আর ঝাউয়ের বন। তার ভেতর দিয়ে সারি সারি ঝরনা নামছে। কত ফুল ফুটেছে এখন। শানাই, হাইড্রেনজিয়া, ফরগেট-মি-নট, রডোডেনড্রন এখন লালে লাল। আর আর তার মাঝে আমার বাংলো।

সাতকড়ি যেন ঘুমপাড়ানি গানের মতো সুর টেনে চললেন—তিনদিন যদি ওখানে থাকো, তা হলে তোমাদের মধ্যে যারা নিরেট বেরসিক, তারাও তরতর করে কবিতা লিখতে শুরু করে দেবে।

—কিন্তু তার আগে যদি ঝুমুরলাল চৌবে চক্রবর্তীর ছড়াটার মানে বোঝা যেত—

সাতকড়ি বললেন কী বললে? ঝুমুরলাল চৌবে চক্রবর্তীর ছড়া? কী বিটকেল নাম! ওনামে কেউ আবার ছড়া লেখে নাকি?

—আজ্ঞে লেখে, তাও আবার আপনার ঝাউ বাংলোকে নিয়ে।
—অ্যাঁ!
—তাতে আপনার সবুজ দাড়ির কথাও আছে।
—বটে! লোকটার নামে আমি মানহানির মামলা করব।
টেনিদা বললে—তাকে আপনি পাচ্ছেন কোথায়? সেই মিচকেপটাশ লোকটা এক-একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। সে বলেছে, আপনার ঝাউ বাংলোয় নাকি হাঁড়িচাঁচায় গান গায়।
সাতকড়ি চটে গেলেন হাঁড়িচাঁচায় গান গায়? নীলপাহাড়িতে হাঁড়িচাঁচা কোত্থেকে আসবে? ও বুঝেছি। আমি মধ্যে-মধ্যে শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে থাকি বটে। তার নাম হাঁড়িচাঁচার গান? লোকটাকে আমি জেলে দেব।
—আরও বলেছে, সেখানে কুণ্ডুমশায় মুণ্ডু নাচায়।
-স্রেফ বাজে কথা। সেখানে কুণ্ডুমশায় বলে কেউ নেই। আমি আছি আর আছে আমার চাকর কাঞ্ছা। নিজের মুণ্ডু নাচানো আমি একদম পছন্দ করি না। কাঞ্ছাও করে বলে মনে হয় না আমার।
ক্যাবলা বললে—শুধু তাই নয়। আপনি বলার আগে সেই আমাদের ঝাউবাংলোয় নেমন্তন্ন করেছে।
—আমার বাড়িতে মিচকে আর ফচকে লোক তোমাদের নেমন্তন্ন করে বসেছে? আচ্ছা ফেরেব্বাজ তো। লোকটাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত।
হাবুল বললে—তারে আপনি পাইবেন কই?
তখন সাতকড়ি সাঁতরা মিনিটখানেক খুব গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ সেই বেঞ্চিটায় বসে পড়লেন। আর ভীষণ করুণ স্বরে বললেন, বুঝেছি, সব বুঝতে পেরেছি এইবার।
আমরা চারজনে চেঁচিয়ে উঠলুম! কী বুঝেছেন?
—এ সেই কদম্ব পাকড়াশির কাণ্ড।
—কে কদম্ব পাকড়াশি?
—আমার চিরশত্রু। যখন কবিতা লিখেছি, তখন কাগজে কাগজে আমার কবিতার নিন্দে করত। এখন সে বিখ্যাত জার্মানী বৈজ্ঞানিক কাগামাছির গুপ্তচর। আমার নতুন আবিষ্কৃত ফরমুলাগুলো সে লোপাট করে নিতে চায়। আমি বুঝতে পারছি—ঝাউবাংলোর এক দারুণ দুর্দিন আসছে। চুরি, ডাকাতি, হত্যা, রক্তপাত। ওফ!
এক দারুণ রহস্যের সন্ধান পেয়ে আমরা চারজনে শিউরে উঠলুম। হাবুল সেন তো সঙ্গে-সঙ্গে এক চিৎকার ছাড়ল। টেনিদার মুখের দিকে দেখি, ওর মৈনাকের মতো লম্বা নাকটা কীরকম ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে, ঠিক একটা সিঙাড়ার মতো দেখাচ্ছে এখন। খানিকক্ষণ মাথা-টাথা চুলকে বললে—চুরি-ডাকাতি-হত্যা রক্তপাত! এ যে ভীষণ কাণ্ড মশাই। পুলিশে খবর দিন।
—পুলিশ! পৃথিবীর সবকটা মহাদেশের পুলিশ দশ বছর চেষ্টা করেও কাগামাছির টিকিটি ছুঁতে পারেনি। অবশ্যি কাগামাছির কোনও টিকি নেই—তার মাথা-জোড়া সবটাই টাক। নানা ছদ্মবেশে সে ঘুরে বেড়ায়। কখনও তিব্বতী লামা, কখনও মাড়োয়ারি বিজনেসম্যান, কখনও রাত্তিরবেলা কলকাতার গলিতে দুমুখো আলো হাতে মুশকিল আসান। পৃথিবীর সব ভাষায় কাগামাছি কথা কইতে পারে। শুধু তাই? একবার সে এক কাঁটাবনের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে, এমন সময় সেদিকে পুলিশ এসে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। ধরে ফেলে—এমন অবস্থা। তখন সেই ঝোপের মধ্য থেকে পাগলা শেয়ালের মতো খ্যাঁক-খ্যাঁক আওয়াজ করতে লাগল। পুলিশ ভাবল, কামড়ালেই জলাতঙ্ক—তারা পালিয়ে বাঁচল সেখান থেকে।
—তা হলে আপনি বলছেন সেই মিচকে চেহারার ফচকে লোকটাই কাগামাছি?—আমি জানতে চাইলাম।
-না, ওটা কদম্ব পাকড়াশি। ওর মুখে একজোড়া সরু গোঁফ ছিল?
—ছিল।—হাবুল পত্রপাঠ জবাব দিল।

—আর গলায় একটা রোঁয়া-ওঠা মেটে রঙের ধুসো কম্ফটার?

—তাও ছিল। এবার ক্যাবলাই সাতকড়িবাবুকে আলোকিত করল।

—তবে আর সন্দেহ নেই। ওই হচ্ছে সেই বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো হাড়-হাবাতে রাম-ফড় কদম্ব পাকড়াশি।

—তা হঠাৎ আপনার ওপরে ওদের নজর পড়ল কেন?—টেনিদা আবার জিগগেস করল।

হাবুল বললে—আহা শোন নাই? ওনার কী য্যান্ মুলার উপর তারগো চক্ষু পড়ছে।

টেনিদা বললে—মুলো? মুলোর জন্য এত কাণ্ড? আমাদের শেয়ালদা বাজারে পয়সায় তো একটা করে মুলো পাওয়া যায়। তার জন্যে চুরি-ডাকাতি রক্তপাত? কী যে বলেন স্যার—কোনও মানে হয় না।

সাতকড়ি সাঁতরা বিষম ব্যাজার হয়ে বললেন—মুলো কে বলেছে? মুলো আমার একদম খেতে ভালো লাগে না, খেলেই চোঁয়া ঢেকুর ওঠে। আমি বলছিলুম ফরমুলা।

হাবুল বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললে—অ—ফরমুলা! তা ফরমুলার কথা ক্যাবলারে কন। আমাদের মধ্যে ও-ই হইল অঙ্কে ভালো—সব বুঝতে পারব।

—তোমরাও বুঝতে পারবে! আমি গাছপালা নিয়ে রিসার্চ করতে করতে এক আশ্চর্য আবিষ্কার করে বসেছি। অথাৎ একই গাছে এক সঙ্গে আম কাঁঠাল কলা-আনারস-আপেল আর আঙুর ফলবে। আর বারো মাসেই ফলবে।

—তাই নাকি?—শুনে তো আমরা থ।

—সেইজন্যেই। —সাতকড়ি সাঁতরা বিষন্নভাবে মাথা নাড়লেন। সেইজন্যেই এই চক্রান্ত! ওহো হো! আমার কী হবে!

কিন্তু কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ক্যাবলাকে একটু সন্দিগ্ধ মনে হল। —ফরমুলা চুরি করতে হলে সেটা তো চুপি চুপি করাই ভালো। সেজন্য পথেঘাটে এমন করে ছড়ার ছড়াছড়ি করার কী মানে হয়? সবই তো জানাজানি হয়ে যাবে।

—ওই তো কাগামাছির নিয়ম। গোড়া থেকেই এইভাবে সে রহস্যের খাসমহল তৈরি করে নেয়। বলতে বলতে সাতকড়ি সাঁতরা প্রায় কেঁদে ফেললেন। এই বিপদে তোমরা আমায় বাঁচাবে না? তোমরা এ-যুগের ইয়ংম্যান। এই দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়াবে না আমার?

এমন করুণ করে বললেন যে, আমারই বুকের ভেতরটা 'আ-হা আ-আ' করতে লাগল। আর ফস করে টেনিদা বলে ফেলল—নিশ্চয় করব, আলবাত করব!

—কথা রইল।

—কথা রইল!

—বাঁচালে। বলে সাতকড়ি সাঁতরা উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন—-তা হলে আজ বিকেল সাড়ে-চারটেয় দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে। ন্যাচারাল মিউজিয়মের ওপরে যে-পার্কটা আছে সেখানে।

আর বলেই স্কট করে কাঠবেড়ালির মতো পাশের বনটার ভেতর তাঁর সবুজ দাড়ি, ওভারকোট আর হাতের লাঠিটা নিয়ে ঠিক সেই মিচকেপটাশ কদম্ব পাকড়াশির মতোই হাওয়া হয়ে গেলেন তিনি।

চ কো লে ট না স্বা র টু

সবুজ দাড়ি, বাঁদুরে টুপি, নীল চশমা আর ধুলো ওভারকোট-পরা সাতকড়ি সাঁতরা তো সাঁ করে সিঞ্চলের সেই বনের মধ্যে টুপ করে ডুব মারলেন। আর কলকাতার কাকেরা যেমন হাঁ করে বসে থাকে, তেমনি করে আমরা চারজন এ-ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। শেষে হাবুল সেনই তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। একটা খুদে পাহাড়ি মৌমাছি ওর কান তাক করে এগিয়ে আসছিল দেখে তিন পা নেচে নিয়ে মৌমাছিটাকে তাড়িয়ে দিলে।

হাবুল বললে কাণ্ডটা কী হইল টেনিদা?

টেনিদার মাথায় কোনও গভীর চিন্তা এলেই সে ফরাসী ভাষা শুরু করে। বললে—ডি-লুক্স।

আমি বললুম—তার মানে?

টেনিদা আবার ফরাসী ভাষায় বললে—পুঁদিচ্চেরি!

ক্যাবলা বললে—পুঁদিচ্চেরি? সে তো পণ্ডিচেরি! এর সঙ্গে পণ্ডিচেরির কী সম্পর্ক?

টেনিদা দাঁত খিচিয়ে বললে—থাম থাম। পণ্ডিচেরি! খুব যে পণ্ডিতি ফলাতে এসেছিস। ফরাসী ভাষায় পঁদিচ্চেরি মানে হল,—ব্যাপার অত্যন্ত ঘোরালো।

ক্যাবলা প্রবল প্রতিবাদ করে বললে—কক্ষনো না। আমার পিসেমশাই পণ্ডিচেরিতে ডাক্তারি করতেন। আমি জানি।

—জানিস?

—জানি।

টেনিদা খটাং করে তক্ষুনি ক্যাবলার চাঁদিতে একটা গাঁট্টা মারল। ক্যাবলা উ-হু-হু করে বাগদা চিংড়ির মতো ছটকে গেল টেনিদার সামনে থেকে।

—এখনও বল, জানিস?—বাঘাটে গলায় টেনিদার প্রশ্ন।

—না, জানিনে। —ক্যাবলা চাঁদিতে হাত বুলোত লাগল—যা জানতুম তা ভুলে গেছি। তোমার কথাই ঠিক। পুঁদিচ্চেরি মানে ব্যাপার অত্যন্ত সাংঘাতিক। আর কত যে সাংঘাতিক, নিজের মাথাতেই টের পাচ্ছি সেটা।

টেনিদা খুশি হয়ে বললে—অল রাইট। বুঝলি ক্যাবলা, ইস্কুল ফাইনালে স্কলারশিপ পেয়ে তোর ভারি ডেপোমি হয়েছে। আবার যদি কুরুবকের মতো বক-বক করিস তাহলে এক চড়ে তোর কান—

হাবুল বললে কানপুরে উইড়্যা যাইব।

-কারেক্ট! এইজন্যেই তো বলি, হাবলাই হচ্ছে আমার ফাস্ট অ্যাসিসট্যান্ট। সে যাক! এখন কী করা যায় বল দিকি? এই সবুজদেড়ে লোকটা তো মহা ফ্যাচাঙে ফেলে দিলে!

ক্যাবলা বললে—আমরা কথা দিয়েছে ওকে হেলপ করব।

—তারপর যদি সেই জাপানী বৈজ্ঞানিক কাগামাছি এসে আমাদের ঘাড়ে চড়াও হয়?

আমি বললুম--তাকে মাছির মতোই সাবাড় করে ফেলব!

—কে সাবাড় করবে, তুই! টেনিদা আমার দিকে তাকিয়ে নাক-টাক কুঁচকে, মুখটাকে আলুসেদ্ধর মতো করে বললে—ওই পুঁটি-মাছের মতো চেহারা নিয়ে! তোকে ওই কাগামাছি আর কদম্ব পাকড়াশি স্রেফ ভেজে খেয়ে ফেলবে, দেখে নিস।

হাবুল সেন বললে—এখন ওইসব কথা ছাড়ান দাও। আইজ বৈকালেই তো বুইড়ার লগে দেখা হইব! তখন দেখা যাইব, কী করন যায়। অখন ফিরা চল, বড়ই ক্ষুধা পাইছে।

টেনিদা দাঁত খেঁচিয়ে কী যে বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা গগনভেদী চিৎকার। আমাদের সংস্কৃতের প্রফেসার

যাকে বলেন ‘জীমূতমন্ত্র কিংবা অম্বরে ডম্বরু’—অনেকটা সেই রকম।
আর কে? সেই যে বেরসিক নেপালী ড্রাইভার আমার গানে বাগড়া দিয়েছিল! ড্রাইভার এতক্ষণ নীচে গাড়ি নিয়ে বসেছিল, এইবার অধৈর্য হয়ে পাহাড় ভেঙে উঠে এসেছে ওপরে।
—আপনাদের মতলব কী স্যার। সারাটা দিন সিঞ্চলেই কাটাতে চান নাকি। তা হলে ভাড়া মিটিয়ে আমায় ছেড়ে দিন, আমি দার্জিলিঙে চলে যাই।
টেনিদা বললে—আর আমরা ফিরে যাব কী করে।
—হেঁটে ঘুমে যাবেন, সেখান থেকে ট্রেন ধরবেন। —পরিষ্কার বাংলায় সাফ গলায় জানিয়ে দিলে ড্রাইভার।
আমি বললুম-থাক আর উপদেশ দিতে হবে না। আমরা যাচ্ছি।
আমরা চারজনে গুম হয়ে এসে গাড়িতে বসলুম। মাথার ভেতরে সাতকড়ি সাঁতরা, এক গাছে চার রকম ফল ফলানোর বৈজ্ঞানিক গবেষণা, জাপানী বৈজ্ঞানিক কাগামাছি আর ধড়িবাজ কদম্ব পাকড়াশি, এই সবই ঘুরপাক খাচ্ছে তখন। বনের পথ দিয়ে এঁকেবেঁকে আমাদের ল্যান্ড রোডার নেমে চলেছে।
আমি বজ্রবাহাদুরের পাশে বসেছিলুম। হঠাৎ ডেকে জিগেস করলুম—আচ্ছা ড্রাইভার সাহেব
—আমি ড্রাইভার নই, গাড়ির মালিক। আমার নাম বজ্রবাহাদুর।
—আচ্ছা বজ্রবাহাদুর সিং—
—সিং নয়, থাপা।
তার মানে শিংওলা নিরীহ প্রাণী নয়, দস্তুরমত থাবা আছে। মেজাজ আর গলার স্বরেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল।
আমি সামলে নিয়ে বললুম-আপনি নীলপাহাড়ি চেনেন?
বজ্রবাহাদুর বললে চিনব না কেন? সে তো পুবং-এর কাছেই। আর পুবং-এই তো আমার ঘর।
—তাই নাকি। এবর ক্যাবলা আকৃষ্ট হল— আপনি সেখানকার ঝাউবাংলো দেখেছেন?
—দেখেছি বই কি। ম্যাকেঞ্জি বলে একটা বুড়া সাহেব তৈয়ার করেছিল সেটা। তারপর হিন্দুস্থান স্বাধীন হল আর বুড়া সেটাকে বেচে দিয়ে বিলায়েত চলে গেল। এখন কলকাতার এক বাঙালী বাবু তার মালিক।
আমি জিজ্ঞেস করলুম—কেমন বাড়ি?
বজ্রবাহাদুর বললে—রামরো ছ।
—রামরো ছ!—হাবুল বললে—অঃ বুঝছি। সেইখানেই বোধ হয় ছয়বার রাম রাম কইতে হয়।
বজ্রবাহাদুরের গোমড়া মুখে এবার একটু হাসি ফুটলনা-না, রাম রাম বলতে হয় না, ‘রামরো ছ হল নেপালী ভাষা। ওর মানে, ভালো আছে। খুব খাসা কুঠি।
ক্যাবলা জিগগেস করলে—ওখানে কে থাকে এখন? কলকাতার সেই বাঙালী বাবু?
—সে আমি জানি না।
—আমরা যদি ওখানে বেড়াতে যাই, কেমন হয়?
বজ্রবাহাদুর আবার বললে রামরো। আমার গাড়িতে যাবেন, সস্তায় নিয়ে যাব আর পুবং-এর খাঁটি দুধ আর মাখনের বন্দোবস্ত করে দেব।
আমরা যখন স্যানিটরিয়ামে ফিরে এলুম, তখন খাবার ঘণ্টা পড়ো-পড়ো। তাড়াতাড়ি চান-টান সেরে খেয়ে-দেয়ে নিয়ে ফোয়ারাটার পাশে এসে আমরা কনফারেন্স বসালুম।
—কী করা যায়।
টেনিদা গোটা চল্লিশেক লিচু নিয়ে বসেছিল, খাওয়ার পর ওইটেই তার মুখশুদ্ধি। একটা লিচু টপাৎ করে গালে ফেলে বললে--চুলোয় যাক, আমরা ও-সবের ভেতর নেই। দু'দিনের জন্যে দার্জিলিঙে বেড়াতে এসেছি, খামকা ও-সব ঝাট কে পোয়াতে যায় বাপু! ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে-টেড়িয়ে, দিব্যি ওজন বাড়িয়ে ফিরে যাব—ব্যস!

ক্যাবলা বললে ভদ্রলোককে সকালে যে কথা দেওয়া হল?
লিচুর আঁটিটা সামনের পাইনগাছে একটা কাককে তাক করে ছুড়ে দিলে টেনিদা
—বিকেলে সে কথা ফিরিয়ে নিলেই হল? সবুজ দাড়ি, কাগামাছি। হুঃ। যত সব বোগাস!
আমি বললুম—কিন্তু বজ্ৰবাহাদুর বলছিল, পুবং থেকে খাঁটি দুধ আর মাখন খাওয়াবে।
টেনিদা আমার পেটে একটা খোঁচা দিয়ে বললে—ধুৎ। এটার রাতদিন খাইখাই—এই করেই মরবে। দুধ-মাখনের লোভে কাগামাছির খপ্পরে গিয়ে পড়ি, আর সে আমাদের আরশোলার চাটনি বানিয়ে ফেলুক! বলেই আর একটা লিচু গালে পুরে দিলে!
হাবুল মাথা নেড়ে বললেহ, সেই কথাই ভালো। ঝামেলার মইধ্যে গিয়া কাম নাই।
তখন আমি বললুম—তা হলে থাক। সাতকড়ি সাঁতরাকে দেখে আমরাও কেমন সন্দেহজনক মনে হল। কেমন ঝাঁ করে বনের ভেতর লুকিয়ে গেল—দেখলে না!
হাবুল বলল—আমার তো ভূত বইলাই মনে হইতাছে।
ক্যাবলা ভীষণ চটে গেল—দুত্তোর! দিন-দুপুরে সিঞ্চল থেকে ভূতের আসতে বয়ে গেছে। আসল কথা, তোমরা সবাই হচ্ছ পয়লা নম্বরের কাওয়ার্ড—হিন্দিতে যাকে বলে একদম ডরপোক!
কী বললি! কাওয়ার্ড!—টেনিদা হুংকার ছাড়ল। খুব সম্ভব ক্যাবলাকে একটা চাঁটি কষাতে যাচ্ছিল, এমন সময় স্যানিটারিয়ামের এক কাঞ্ছা এসে হাজির। তার হাতে একটা ছোট প্যাকেট।
এসেই বললে—তিমিরো লাই।
টেনিদা বললে—তার মানে? তিমিরো লাই? এই দুপুর বেলা তিমির কোথায় পাব? আর 'লাই' মানে তো শোয়া। খামকা শুতেই যা যাব কেন?
ক্যাবলা হেসে বলল—না-না বলছে, তোমাদের জন্যে।
-তাই নাকি?—টেনিদা একটানে প্যাকেট নিয়ে খুলে ফেলল। আর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটি মস্ত চকোলেট।
-চকোলেট? কে দিলে? কাঞ্ছা আবার নেপালী ভাষায় জানালে একটু আগেই সে 'মাথি' অথাৎ উপরে বাজারে গিয়েছিল। সেখানে সরু গোঁফ আর গলায় মেটে রঙের মাফলার জড়ানো একটি লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়। সে তার হাতে এইটে দিয়ে বলে, কলকাতা থেকে যে-চারজন ছোকরা বাবু এসেছে তাদের কাছে যেন পৌঁছে দেয়।
সরু গোঁফ, মেটে রঙের মাফলার! তা হলে—
টেনিদা একটানে চকোলেটটা খুলে ফেলল। টুপ করে মাটিতে পড়ল চার ভাঁজ করা একটি চিরকুট। তাতে লেখা ।
'যাচ্ছ না তো নীলপাহাড়ি!
অকর্মা সব ধাড়ি বাড়ি!
এতেই প্রাণে লাগল ত্রাস।
গড়ের মাঠে খাওগে ঘাস।'
হাবুল স্বর করে কবিতাটা পড়ল। আর আমরা তিনজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম—কদম্ব পাকড়াশি।
কিছুক্ষণ চুপচাপ! টেনিদা গম্ভীর! একটা লিচু ছাড়িয়ে মুখের কাছে সেই থেকে ধরে রয়েছে, কিন্তু খাচ্ছে না। টেনিদার এমন আশ্চর্য সংযম এর আগে আমি কোনওদিন দেখিনি।
ক্যাবলা বলল—টেনিদা, এবার?
টেনিদার নাকের ভেতর থেকে আওয়াজ বেরুল—হুম!

—আমাদের অকর্মার ধাড়ি বলেছে : গড়ের মাঠে গিয়ে ঘাস খাবার উপদেশ দিয়েছে।
হাবুল সেন বললে—হ, শত্রুকে চ্যালেঞ্জ কইরা পাঠাইছে।
ক্যাবলা আবার বললে—কদম্ব পাকড়াশির কাছে হার মেনে কলকাতায় ফিরে যাবে টেনিদা? গিয়ে গড়ের মাঠে ঘাস খাবে?
টেনিদা এবারে চিৎকার করে উঠল—কভি নেই। নীলপাহাড়িতে যাবই।
—আলবাত?
—আলবাত! বলেই টপাৎ করে লিচুটা মুখে পুরে দিলে। আমার মনটা চকোলেটের জন্য ছোঁক ছোঁক করছিল, বললুম—তা হলে কদম্ব পাকড়াশির চকোলেটটা ভাগযোগ করে—
টেনিদা সংক্ষেপে বললে, শাট আপ।

বিকেল পাঁচটার সময় আমরা গিয়ে হাজির হলুম ন্যাচারাল মিউজিয়ামের কাছে পার্কটায়।
যারা বেড়াতে বেরিয়েছে, সবাই গিয়ে ভিড় করেছে ম্যালে। সামনে দিয়ে টকটক করে ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে বাচঁহিলের দিকে। প্রায় ফাঁকা পার্কে আমরা চারজন ঘুঘুর মতো একটা বেঞ্চিতে অপেক্ষা করে আছি। এখানেই সেই সবুজ দাড়িওলা সাতকড়ি সাঁতরার আসবার কথা।
দশ-পনেরো-বিশ মিনিট কাটল, বসে আছি তো বসেই আছি। চার আনার চীনেবাদাম শেষ হয়ে পায়ের কাছে ভাঙা খোলার একটা পাহাড় জমেছে। সাতকড়ির আর দেখা নেই।
টেনিদা বিরক্ত হয়ে বলল কই রে ক্যাবলা, সেই সবুজদাড়ি গেল কোথায়?
হাবুল বললে—কইলাম না, ওইটা সিঞ্চল পাহাড়ের ভূত। বনের ভূত বনে গেছে, এইখানে আর আইব না।
ক্যাবলা বললে—ব্যস্ত হচ্ছ কেন? একটু দেখাই যাক না। আমার মনে হয় ভদ্রলোক নিশ্চয়ই আসবেন!
ঠিক তখন পেছন থেকে কে বললে—এই তো এসে গেছি।
আমরা চমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। পার্কে সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। তার ওপর বেশ করে কুয়াশা ঘনিয়েছে। এই পার্কটা যেন চারদিকের পৃথিবী থেকে আলাদা হয়ে গেছে এখন। আর এরই মধ্যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন সেই লোকটা! মাথায় বাঁদুরে টুপি, চোখে নীল চশমা। টেনিদা কী বলতে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক ঠোঁটে আঙুল দিলেন।
—স—সস্। আশেপাশে কাগামাছির চর ঘুরছে। কাজের কথা সংক্ষেপে বলে নিই। তোমরা নীলপাহাড়িতে যাচ্ছ তো? টেনিদা বললে, যাচ্ছি।
—কাল সকালে?
ভদ্রলোক এবার চাপা গলায় বললেন—ঠিক আছে। মোটর ভাড়া করে চলে যেয়ো, ঘণ্টা দেড়েক লাগবে। ওখানে গিয়ে পাহাড়ি বস্তিতে জিগগেস করলেই ঝাউ-বাংলো চিনিয়ে দেবে এখন। আর তোমরা আমার গেস্ট হবে। মোটর ভাড়াও আমি দিয়ে দেব এখন। রাজি?
হাবুল বললেই, রাজি।
—তা হলে আমি চলি। দাঁড়াবার সময় নেই। কালই ঝাউবাংলোয় দেখা হবে। আর একটা কথা মনে রেখো। ছুঁচোবাজি।
—ছুঁচোবাজি? আমি আশ্চর্য হয়ে জিগগেস করলুম ছুঁচোবাজি আবার কী?
—কাগামাছির সংকেত! আচ্ছা চলি। টা-টা—
বলেই ভদ্রলোক ঝাঁ করে চলে গেলেন, কুয়াশার ভেতর দিয়ে কোন্ দিকে যে গেলেন ভালো করে ঠাহরও পাওয়া গেল না। ক্যাবলা উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গেই।
—চলো টেনিদা।

-কোথায়? মোটর স্ট্যান্ডে। বজ্ৰবাহাদুরের গাড়িটা ঠিক করতে হবে।

বলতে না বলতেই ফড়-ফড়-ফড়-ডাং করে আওয়াজ উঠল একটা। আর হাবুলের ঠিক কানের পাশ দিয়ে একটা ছুঁচোবাজি এসে পড়ল সামনের ঘাসের উপর—আগুন ঝরিয়ে তিড়িক করে নাচতে নাচতে ফটাৎ শব্দে একটা ফরগেট-মি-নটের ঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হল।

আমরা ক'জনে হাঁ করে সেই ছুঁচোবাজির নাচ দেখলাম। তারপর ঝোপের মধ্যে ঢুকে যখন সেটা ফুস করে নিবে গেল তখনও কারও মুখে একটা কথা নেই। পার্কটা তখন ফাঁকা, ঘন শাদা কুয়াশায় চারদিক ঢাকা পড়ে গেছে, আশেপাশে যে আলোগুলো জ্বলে উঠেছিল, তারাও সেই কুয়াশার মধ্যে ডুব মেরেছে। আর আমরা চারজন যেন কোনও রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা কাহিনীর মধ্যে বসে আছি।

টেনিদাই কথা কইল প্রথম।

—হাঁ রে, এটা কী হল বল দিকি?

হাবুল একটা চীনেবাদাম মুখে দিয়ে গিলতে গিয়ে বিষম খেল। খানিকক্ষণ খকখক করে কেশে নিয়ে বললে—এইটা আর বুঝতে পারলা না? সেই কদম্ব পাকড়াশি আমাগো পিছে লাগছে।

আমি বললুম—হয়তো বা কাগামাছি নিজেই এসে ছুঁড়ে দিয়েছে ওটা।

টেনিদা বলল ধুত্তোর, এ তো মহা ঝামেলায় পড়া গেল! কোথায় গরমের ছুটিতে দিব্যি ক'দিন দার্জিলিঙে ঘুরে যাব, কোত্থেকে সেই মিচকেপটাশ লোকটা এসে হাজির হল। তারপর আবার সবুজদেড়ে সাতকড়ি সাঁতরা—কী এক জাপানী বৈজ্ঞানিক কাগামাছি না বগাহাঁছি—ভালো লাগে এ-সব?

হাবুল দুঃখ করে বললে—বুঝলা না, আমাগো বরাতই খারাপ। সেইবারে ঝন্টিপাহাড়িতে বেড়াইতে গেলাম—কোত্থিকা এক বিকট ঘুটঘুটানন্দ জুটল।

ক্যাবলা বললে—তাতে ক্ষেতিটা কী হয়েছিল শুনি? ওদের দলটাকে ধরিয়ে দিয়ে সবাই একটা করে সোনার মেডেল পাওনি?

টেনিদা মুখটাকে আলুকাবলীর মতো করে বললে, আরে রেখে দে তোর সোনার মেডেল। ঘুটঘুটানন্দ তবু বাঙালী, যাহোক একটা কায়দা করা গিয়েছিল। আমি ডিটেকটিভ বইতে পড়েছি, এ সব জাপানীরা খুব ডেঞ্জারাস হয়।

হাবুল মাথা নেড়ে বললে, হ-হ, আমিও পড়ছি সেই সব বই। আমাগো ধইরা-ধইরা পুটুত-পুটুত কইরা এক একখান ইনজেকশন দিব, আর আমরা ভাউয়া ব্যাঙের মতো চিতপটান হইয়া পইড়্যা থাকুম। তখন আমাগো মাথার খুলি ফুটা কইরা তার মইধ্যে বান্দরের ঘিলু ঢুকাইয়া দিব।

আমি বললুম—আর তক্ষুনি আমাদের একটা করে ল্যাজ বেরুবে, আমরা লাফ দিয়ে গাছে উঠে পড়ব, তারপর কিচমিচ করে কচিপাতা খেয়ে বেড়াব। আর আমাদের টেনিদা—

হাবুল বলল-পালের গোদা হইব। যারে কয় গোদা বান্দর।

ধাঁই করে টেনিদা একটা গাঁট্টা বসিয়ে দিলে হাবুলের চাঁদির ওপর। দাঁত খিচিয়ে বললে—গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি? আমি মরছি নিজের জ্বালায় আর এগুলো সব তখন থেকে ফাজলামো করছে। অ্যাই—ভাউয়া ব্যাঙ মানে কী রে?

হাবুল বললে—ভাউয়া ব্যাঙ! ভাউয়া ব্যাঙেরে কয় ভাউয়া ব্যাঙ।

ক্যাবলা বিরক্ত হয়ে বলল—আরে ভেইয়া আব উস বাতচিত ছোড় দো, লেকিন। টেনিদা, আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।

—কী সন্দেহ শুনি?

—আমার মনে হল, ওই বুড়োটাই ছুঁচোবাজি ছেড়েছে। আমরা তিনজনে একসঙ্গে চমকে উঠলুম।

—সে কী?

—আমার যেন তাই মনে হল। বুড়ো ওঠবার আগে নিজের পকেটটা হাতড়াচ্ছিল, একটা দেশলাইয়ের

খড়খড়ানিও যেন শুনেছিলুম।
আমি বললুম—তবে বোধহয় ওই বুড়োটাই—
হাবুল ফস করে আমার কথাটা কেড়ে নিয়ে বললে কাগামাছি।
টেনিদা মুখটাকে ডিমভাজার মতো করে নিয়ে বললে—তোদের মুণ্ডু। ও নিজেই যদি কাগামাছি হবে, তা হলে কাগামাছির নামে ভয় পাবে কেন? আর আমাদের ঝাউ বাংলোয় যেতে নেমন্তন্নই বা করবে কেন?
হাবুল আবার টিকটিক করে উঠল—'প্যাটে ইনজেকশন দিয়া দিয়া ভাউয়া ব্যাঙ বানাইয়া দিব, সেইজন্য।'
—ফের ভাউয়া ব্যাঙ! টেনিদা আবার হুঙ্কার ছাড়ল—যদি ভাউয়া ব্যাঙ-এর মানে বলতে না পারিস—
—ভাউয়া ব্যাঙ-এর মানে হইল গিয়া ভাউয়া ব্যাঙ। টেনিদা একটা লম্বা হাত বাড়িয়ে হাবুলের কান পাকড়াতে যাচ্ছিল, হাবুল তিড়িং করে লাফিয়ে সরে গেল-ভাউয়া ব্যাঙ-এর মতই লাফাল খুব সম্ভব! আর ক্যাবলা দারুণ বিরক্ত হল।
—তোমরা কি বসেবসে সমানে বাজে কথাই বলবে নাকি? ঝাউ-বাংলোতে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে না?
টেনিদা দমে গেল।
—যেতেই হবে?
ক্যাবলা বললে—যেতেই হবে। কদম্ব পাকড়াশি দু'নম্বর চকোলেট পাঠিয়ে ভিতু বলে ঠাট্টা করে গেল, ছুঁচোবাজি ছেড়ে আমাদের চ্যালেঞ্জ করলে, সেগুলো বেমালুম হজম করে চলে যাব? আমাদের পটলডাঙার প্রেসটিজ নেই একটা?
আমি আর হাবুল বললুম—আলবাত!
—ওঠো তা হলে। বজ্রবাহাদুরের গাড়িটাই ঠিক করে আসি। কাল ভোরেই তত্তা বেরুতে হবে।

সত্যি কথা বলতে কী, আমি ভালো করে ঘুমুতে পারলুম না। রাত্তিরে মাংসটা একটু বেশিই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে শরীরটা হাঁইফাই করতে লাগল। তারপর স্বপ্ন দেখলুম, একটা মস্ত কালো দাঁড়কাক আমার মাথার কাছে বসে টপটপ করে মাছি খাচ্ছে, একটা একটা করে ঠোক্কর দিচ্ছে আমার চাঁদিতে। আর ফ্যাক-ফ্যাক করে বুড়ো মানুষের মতো বলছে—যাও না একবার নীলপাহাড়ি, তারপর কী হাঁড়ির হাল করি দেখে নিয়ো।
আঁকপাঁক করে জেগে উঠে দেখি, পুরো বত্রিশটা দাঁত বের করে হাবুল সেন দাঁড়িয়ে। তার হাতে একটা সন্দেহজনক পেনসিল। তখন আমার মনে হল, দাঁড়কাক নয়, হাবুলই পেনসিল দিয়ে আমার মাথায় ঠোকর দিচ্ছিল।
বললুম—এই হাবলা কী হচ্ছে?
হাবুল বললে—চায়ের ঘণ্টা পইড়্যা গেছে। রওনা হইতে হইব না নীল-পাহাড়িতে? তরে জাগাইতে আছিলাম।
—তাই বলে মাথায় পেনসিল দিয়ে ঠুকবি?
হাবুলের বত্রিশটা দাঁত চিকচিক করে উঠল—বোঝস নাই, একসপেরিমেন্ট করতাছিলাম।
—আমার মাথা দিয়ে তোর কিসের এক্সপেরিমেন্ট শুনি?
—দেখতাছিলাম, কয় পার্সেন্ট গোবর আর কয় পার্সেন্ট ঘিলু।
—কী ধড়িবাজ, দেখেছ একবার। আমি দারুণ চটে বললুম—তার চাইতে নিজের মাথাটাই বরং ভালো করে বাজিয়ে নে। দেখবি গোবর—সেন্ট পার্সেন্ট।
—চ্যাতস ক্যান? চা খাইয়া মাথা ঠাণ্ডা করবি, চল।
টেনিদা আর ক্যাবলা আগেই চায়ের টেবিলে গিয়ে জুটেছিল, আমি গেলুম হাবুলের সঙ্গে। চা শেষ না হতেই

খবর এল, বজ্ৰবাহাদুর তার গাড়ি নিয়ে হাজির।
ক্যাবলা বললে—নে, ওঠ ওঠ। আর গোরুর মত বসে বসে টোস্ট চিবতে হবে না।
—নিজেরা তো দিব্যি খেলে, আর আমার বেলাতেই—
—আটটা পর্যন্ত ঘুমুতে কে বলেছিল, শুনি?—টেনিদা হুঙ্কার ছাড়ল।
কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, ওরাই দলে ভারি। টোস্টটা হাতে নিয়েই উঠে পড়লুম। সন্দেশ দুটোও ছাড়িনি, ভরে নিলুম জামার পকেটে। যাচ্ছি সেই নীলপাহাড়ির রহস্যময় ঝাউ-বাংলোয়, বরাতে কী আছে কে জানে। যদি বেঘোরে মারাই যেতে হয়, তাহলে মরবার আগে অন্তত সন্দেশ দুটো খেয়ে নিতে পারব।

শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়লুম। আরও আধঘণ্টা পরেই।
দার্জিলিং রেল স্টেশনের পাশ থেকে আমাদের গাড়িটা ছাড়তেই টেনিদা হাঁক ছাড়ল—পটলডাঙা—
আমরা তিনজন তক্ষুনি শেয়ালের মতো কোরাসে বললুম—জিন্দাবাদ!
বজ্ৰবাহাদুর স্টিয়ারিং থেকে মুখ ফেরাল। তারপর তেমনি পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করল কী জিন্দাবাদ বললেন?
চারজনে একসঙ্গে জবাব দিলুম-পটলডাঙা।
—সে আবার কী?
লোকটা কী পেঁয়ো, আমাদের পটলডাঙার নাম পর্যন্ত শোনেনি। আর সেখানকার বিখ্যাত চারমূর্তি যে তার গাড়িতে চেপে একটা লোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চারে চলেছি, তা-ও বুঝতে পারছে না।
টেনিদা মুখটাকে স্রেফ গাজরের হালুয়ার মতো করে বললে—পটলডাঙা আমাদের মাদারল্যান্ড।
হাবুল বললে—উহু, ঠিক কইলা না। মাদারপাড়া।
—ওই হল, মাদারপাড়া। যাকে বলে—
ক্যাবলা বললে ডি-লা গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস।
বজ্ৰবাহাদুর কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল, কী বুঝল সেই জানে। তারপর নিজের মনে কী একবার বিড়বিড় করে বলে গাড়ি চালাতে লাগল।
আমরাও মন দিয়ে প্রকৃতির শোভা দেখতে লাগলুম বসে বসে। পাহাড়ের বুকের ভেতর দিয়ে বাঁকে বাঁকে পথ চলেছে, কখনও চড়াই, কখনও উতরাই। কত গাছ, কত ফুল, কোথাও চা বাগান, কোথাও দুধের ফেনার মতো শাদা শাদা ঝরনা পথের তলা দিয়ে নীচে কুয়াশাঢাকা খাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ঘুম বাঁ-দিকে রেখে পেশক রোড ধরে আমরা তিস্তার দিকে এগিয়ে চলেছে।
আমার গলায় আবার গান আসছিল—এমন শুভ্র নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়---কিন্তু বজ্ৰবাহাদুরের কথা ভেবেই সেই আকুল আবেগটা আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে হল। একেই লোকটার মেজাজ চড়া তার ওপর 'ডি-লা গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস' শুনেই চটে রয়েছে। ওকে আর ঘাঁটানোটা ঠিক হবে না। পুবং-এর ঘি-দুধ খাওয়াবে বলেছে, তা ছাড়া গাড়ি তো ওরই হাতে। আমার গানের সুরে খেপে গিয়ে যদি একটু বাঁ দিকে গাড়িটা নামিয়ে দেয়, তা হলেই আর দেখতে হবে না। হাজার ফুট খাদ হা-হা করছে সেখানে।
হঠাৎ ক্যাবলা বললে—আচ্ছা টেনিদা?
—হুঁ।
—যদি গিয়ে দেখি সবটাই বোগাস?
—তার মানে?
মানে, ঝাউ বাংলোয় সাতকড়ি সাঁতরা বলে কেউ নেই? ওই সবুজ দাড়িওয়ালা লোকটা আমাদের ঠকিয়েছে?

রসিকতা করেছে আমাদের সঙ্গে!

টেনিদার সেজন্য কোনও দুশ্চিন্তা দেখা গেল না। বরং খুশি হয়ে বললে—তা হলে তো বেঁচেই যাই । হাড়-হাবাতে কাগামাছির পাল্লায় আর পড়তে হয় না।

হাবুল বললে—কষ্টডাই সার হইব।

—কষ্ট আবার, কিসের? বজ্রবাহাদুরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে টেনিদা বললে—পুবং-এর ছানা তা হলে আছে কী করতে?

গাড়িটা এবার ডানদিকে বাঁক নিলে। পথের দু'ধারে চলল সারবাঁধা পাইনের বন, টাইগার ফার্নের বন ঝোপ, থরে থপরে শানাই ফুল। রাস্তাটা সরু—ছায়ায় অন্ধকার, রাশি রাশি প্রজাপতি উড়ছে। অত প্রজাপতি একসঙ্গে আমি কখনও দেখিনি। দার্জিলিং থেকে অন্তত মাইল বারো চলে এসেছি বলে মনে হল।

বজ্রবাহাদুর মুখ ফিরিয়ে বলল—নীলপাহাড়ি এরিয়ায় এসে গেছি আমরা।

নীলপাহাড়ি। আমরা চারজনেই নড়ে উঠলুম।

ঠিক তক্ষুনি ক্যাবলা বললে-টেনিদা, দেখেছ? ওই পাথরটার গায়ে খড়ি দিয়ে কী লেখা আছে?

গলা বাড়িয়ে আমরা দেখতে পেলুম, বড় বড় বাংলা হরফে লেখা 'ছুঁচোবাজি।'

সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা পথেরের দিকে আমার চোখ পড়ল। তাতে লেখা কুণ্ডুমশাই।

হাবুল চেঁচিয়ে উঠল—আরে, এইখানে আবার লেইখ্যা রাখছে : 'হাড়িচাঁচা।'

টেনিদা বললে-ড্রাইভার সায়েব, গাড়ি থামান। শিগগির!

বজ্রবাহাদুর কটমট করে তাকাল—আমি ড্রাইভার নই, মালিক।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তা-ই হল। থামান একটু।

—থামাচ্ছি। বলে তক্ষুনি থামাল না বজ্রবাহাদুর। গাড়িটাকে আর-এক পাক ঘুরিয়ে নিয়ে ব্রেক কষল। তারপর বললে—নামুন! এই তো বাউ বাংলো।

আমরা অবাক হয়ে দেখলুম, পাশেই একটা ছোট টিলার মতো উঁচু জায়গা। পাথরের অনেকগুলো সিঁড়ি উঠেছে সেইটে বেয়ে। আর সিঁড়িগুলো যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে পাইন আর ফুলবাগানে ঘেরা চমৎকার একটি বাংলো। ছবির বইতে বিলিতি ঘরদোরের চেহারা যেমন দেখা যায়, ঠিক সেই রকম। চোখ যেন জুড়িয়ে গেল।

আমরা আরও দেখলুম, চোখে নীল গগ, বাঁদুরে টুপিতে মাথা মুখ ঢাকা, গায়ে ওভারকোট আর হাতে একটা লাঠি নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সাতকড়ি সাঁতরা।

বাঁদুরে টুপির ভেতর থেকে ভরাট মোটা গলার ডাক এল—এসো এসো! খোকারা, এসো! আমি তোমাদের জন্যে সেই কখন থেকে অপেক্ষা করে আছি।

আর সেই সময় একটা দমকা হাওয়া উঠল, কী একটা কোত্থেকে খরখর করে আমার মুখে এসে পড়ল। আমি থাবা দিয়ে পাকড়ে নিয়ে দেখলুম, সেটা আর কিছুই নয়-চকোলেটের মোড়ক।

বজ্ৰবাহাদুর গাড়ি নিয়ে পুবং-এ চলে গেল।

যাওয়ার আগে বলে গেল কাল সকালে সে আবার আসবে। আমরা যদি কোথাও বেড়াতে যেতে চাই, নিয়ে যাবে। টেনিদা কিন্তু আসল কথা ভোলেনি। চেঁচিয়ে বললেবাঃ , পুবং-এর মাখন?

—দেখা যাক বলে বজ্ৰবাহাদুর হেসে চলে গেল। এর ট্যাক্সি ভাড়াটা সাতকড়ি সাঁতরা আগেই মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

আমরা চারজনে ঝাউ বাংলোয় গিয়ে উঠলুম। সত্যি, বেড়ে জায়গা! চারদিক পাইন গাছে ঘেরা, নানা রকমের ফুলে ভরে আছে বাগান, কুলকুল করে একটা ঝরনাও বয়ে যাচ্ছে আবার। এ-সব মনোরম দৃশ্য-টৃশ্য তো আছেই, কিন্তু তার চাইতেও সেরা বাংলোর ভেতরটা। সোফা-টোফা দেওয়া মস্ত ড্রয়িংরুম, কত রকম ফার্নিচার, দেওয়ালে কত সব বিলিতি ছবি!

সাতকড়ি আমাদের একতলা দোতলা সব ঘুরিয়ে দেখালেন। তারপর দোতলার এক মস্ত হলঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন-এইটে তোমাদের শোবার ঘর। কেমন, পছন্দ হয়?

পছন্দ বলে পছন্দ! প্রকাণ্ড ঘরটায় চারখানা খাটে বিছানা পাতা, একটা ড্রেসিং টেবিল, দুটো পোশাকের আলমারি (ক্যাবলা বললে, ওয়ার্ডরোব), একটা মস্ত টেবিলের দুদিকে চারখানা চেয়ার, টেবিলের ওপরে ফুলদানি, পাশে স্নানের ঘর। আমি লক্ষ করে দেখলুম বইয়ের শেলফও রয়েছে একটা, তাতে অনেকগুলো ছবিওলা বিলিতি মাসিক পত্রিকা। ঘরটার তিনদিকে জানালা, তাই দিয়ে এন্তার পাহাড়-জঙ্গল আর দূরের চা বাগান দেখা যায়।

সাতকড়ি বললেন—ওই চা বাগানটা দেখছ? ওর একটা ভারি মজার নাম আছে।

আমরা জিজ্ঞেস করলুমকী নাম?

—রংলি রংলিওট!

—কী দারুণ নাম। টেনিদা চমকে উঠল—মানে কী ওর?

হাবুল পণ্ডিতের মতো মাথা নাড়ল—এইটা আর বুঝতে পারলা না? তার মানে হইল, মায়ে পোলারে ডাইক্যা কইতাছে—এই রংলি, সকাল হইছে, আর শুইয়া থাকিস না। উইঠ্যা পড়, উইঠ্যা পড়।

সাতকড়ি তার সবুজ দাড়িতে তা দিয়ে হাসলেন। বললেন—না, ওটা পাহাড়ি ভাষা। ওর মানে হল, এই পর্যন্তই, আর নয়।

—অদ্ভুত নাম তো। এ-নাম কেন হল?—আমি জানতে চাইলাম।

—সে একটা গল্প আছে, পরে বলব। আর ওই চা বাগানের ওপারে যে-পাহাড়টা দেখছ, তার নাম মংপু!

—মংপু?-ক্যাবলা চেঁচিয়ে উঠল—ওখানেই বুঝি রবীন্দ্রনাথ এসে থাকতেন?

—ঠিক ধরেছ। সাতকড়ি হাসলেন। সেইজন্যেই তো ওই পাহাড়টা চোখে পড়লেই আমার সব গোলমাল হয়ে যায়। ধরো, খুব একটা জটিল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখছি, যেই মংপুর দিকে তাকিয়েছি—ব্যস!

—ব্যস! হাবুল বললে-অমনি কবিতা আইসা গেল!

—গেল বই কি। তরতর করে লিখতে শুরু করে দিলুম।

আমার মনে পড়ে গেল, সিঞ্চলে বসে কবিতা শুনিয়েছিলেন সাতকড়ি—ওগো পাইন। ঝলমল করছে জ্যোৎস্না, দেখাচ্ছে কী ফাইন।

টেনিদা বললে—তা হলে তো প্যালাকে নিয়ে মুস্কিল হবে। ওর আবার একটু কাব্যিরোগ আছে, রাত জেগে কবিতা লিখতে শুরু করে না দেয়। যদিও অঙ্কে বারো-টারোর বেশি পায় না, তবে কবিতা নেহাত মন্দ লেখে

না।

কাব্যিরোগের কথা শুনে মন্দ লাগেনি, কিন্তু অঙ্কে বারোর কথা শুনেই মেজাজটা দারুণ খিচড়ে গেল। আমি নাকমুখ কুঁচকে বিচ্ছিরিভাবে দাঁত বের করে বললুম—আর তুমি? তুমি ইংরেজিতে সাড়ে সাত পাওনি? তুমি পণ্ডিতমশাইকে ধাতুরূপ বললানি, গৌ-গৌবৌ-গৌবর?

—ইয়ু প্যালা, শাট আপ।—বলে টেনিদা আমায় মারতে এল, কিন্তু মাঝখানে হাঁ হাঁ করে সাতকড়ি ওকে থামিয়ে দিলেন—আহা-হা, এখন এসব গৃহযুদ্ধ কেন? লড়াই করবার সময় অনেক পাবে, কাগামাছি তো আছেই।

সেই বিদঘুটে কাগামাছি! শুনেই মন খারাপ হয়ে গেল। এতক্ষণ বেশ ছিলুম, দিব্যি প্রাকৃতিক শোভাটোভা দেখা হচ্ছিল, হঠাৎ অলুক্ষণে কাগামাছির কথা শুনে খুব খারাপ লাগল!

টেনিদা বললে—জানেন, কাল আপনি চলে আসবার পরেই পার্কের ভেতর কে একটা ছুঁচোবাজি ছুঁড়েছিল।

—অ্যাঁ, তবে ওর গুপ্তচর ওখানেও ছিল? সাতকড়ি একটা খাবি খেলেন। লোকটা নিশ্চয় কদম্ব পাকড়াশি।

—আসবার সময় দেখলাম, এক জায়গায় খড়ি দিয়ে পাথরের গায়ে লেখা আছে-'কুণ্ডুমশাই।' —আমি জানালুম।

—আর একখানে লেইখ্যা রাখছে—হাঁড়িচাঁচা। হাবুল সরবরাহ করল ।

—ওফ! আর বলতে হবে না!—সাতকড়ি বললে—তবে তো শৎব্রু এবার দস্তুর-মতো আক্রমণ করবে। আমার ফরমুলাটা বুঝি আর কাগামাছির হাত থেকে বাঁচানো যাবে না।

সাতকড়ি হাহাকার করতে লাগলেন।

ক্যাবলা বললে—তা পুলিশে খবর দিলেই তো—

পুলিশ! সাতকড়ি মাথা নাড়লেন। পুলিশ কিছু করতে পারবে না। বন্ধুগণ, তোমরাই ভরসা! বাঁচাবে না আমাকে, সাহায্য করবে না আমাকে?

বলতে বলতে তাঁর চোখে প্রায় জল এসে গেল।

ওঁর অবস্থা দেখে আমার বুকের ভেতরটা প্রায় হায় হায় করতে লাগল। মনে হল, দরকার পড়লে প্রাণটা পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারি। এমনকি, টেনিদা পর্যন্ত করুণ স্বরে বললে—কিছু ভাববেন না সাতকড়িবাবু, আমরা আছি।

হাবুলও একটা ঘোরতর কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় সাতকড়িবাবুর কাঞ্ছা এসে খবর দিলে, খানা তৈরি।

এটা সুখবর। দার্জিলিঙের রুটি-ডিম অনেক আগেই রাস্তায় হজম হয়ে গিয়েছিল। আর সত্যি কথা বলতে কী, সাতকড়িবাবুর রান্নাঘর থেকে মধ্যে-মধ্যে এক-একটা বেশ প্রাণকাড়া গন্ধের ঝলক এসে থেকে-থেকে আমাদের উদাস করেও দিচ্ছিল বই কি!

সারাটা দিন বেশ কাটল। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া হল, দুপুরে সাতকড়িবাবু অনেক কবিতা-টবিতা শোনালেন। সেই ফরমুলাটার কথা বললেন—যা দিয়ে একটা গাছে আম কলা আঙুর আপেল সব একসঙ্গে ফলানো যায়। আমি একবার ফরমুলাটা দেখতে চেয়েছিলুম, তাতে বিকট ভ্রূকুটি করে সাতকড়িবাবু আমার দিকে তাকালেন।

—এনসাইক্লোপিডিক ক্যাটাফি বোঝো?

সর্বনাশ! নাম শুনেই পিলে চমকে গেল। আমি তো আমি, স্কুল ফাইনালে স্কলারশিপ পাওয়া ক্যাবলা পর্যন্ত থই পেল বলে মনে হল না।

—প্রাণতোষিণী মহাপরিনির্বাণ-তন্ত্রের পাতা উল্টেছ কোনওদিন?

টেনিদা আঁতকে উঠে বললেন—আজ্ঞে না। ওল্টাতেও চাই না।

—নেবু চাডনাজার আর পজিট্রপেনর কম্বিনেশন কী জানো? —জানি না।

—থিয়োরি অব রিলেটিভিটির সঙ্গে অ্যাকোয়া টাইকোটিস যোগ করলে কী হয় বলতে পারো?

হাবুল বললে—খাইছে!
মিটিমিটি হেসে সাতকড়ি বললেন—তা হলে ফরমুলা দেখে তো কিছু বুঝতে পারবে না।
ক্যাবলা মাথা চুলকোতে লাগল। একটু ভেবে-চিন্তে বললে—দেখুন—কী বলে, অ্যাকোয়া টাইকোটিস মানে তো জোয়ানের আরক—তাই নয়? তা জোয়ানের আরকের সঙ্গে থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি—
—ওই তো আমার গবেষণার রহস্য! সাতকড়ি আবার মিটমিট করে হাসলেন—ওটা বুঝলে তো ফরমুলাটা তুমিই আবিষ্কার করতে পারতে!
টেনিদা বললে—নিশ্চয়-নিশ্চয়! ক্যাবলার কথায় কান দেবেন না। সব জিনিসেই ওর সব সময় টিকটিক করা চাই। এই ক্যাবলা ফের যদি তুই ওস্তাদি করতে যাবি, তা হলে এক চড়ে তোর কান
আমি বললুম কানপুরে উড়ে যাবে। সাতকড়ি বললে—আহা থাক, থাক; নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে নেই। যাক বিকেল তো হল, তোমরা এখন চা-টা খেয়ে একটু ঘুরে এসো—কেমন? রাত্তিরে আবার গল্প করা যাবে।
সাতকড়ি উঠে গেলেন।
আমরা বেড়াতে বেরুলুম। বেশ নিরিবিলি জায়গাটি গ্রামে লোকজন অল্প, পাহাড়-জঙ্গলফুল আর ঝরনায় ভরা। থেকে-থেকে ফগ ঘনিয়ে আসছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। দূরে সমতলের একটুখানি সবুজ রেখা দেখা যায়, সেখানে একটা রুপোলি নদী চিকচিক করছে। একজন পাহাড়ি বললে—ওটা তিস্তা ভ্যালি।
সত্যি দার্জিলিঙের ভিড় আর হট্টগোলের ভেতর থেকে এসে মন যেন জুড়িয়ে গেল। আর মংপুর পাহাড়টাকে যতই দেখছিলুম, ততই মনে হচ্ছিল, এখানে থাকলে সবাই-ই কবি হতে পারে, সাতকড়ি সাঁতারর কোনও দোষ নেই। কেবল হতভাগা কাগামাছিটাই যদি না থাকত—
কিন্তু কোথায় কাগামাছি। আশেপাশে কোথাও তার টিকি কিংবা নাক ফাক কিছু আছে বলে তোবোধ হচ্ছে না। তাহলে পাথরের গায়ে খড়ি দিয়ে ওসব লিখলই বা কে! কে জানে!
রাত হল, ড্রয়িংরুমে বসে আবার আমরা অনেক গল্প করলুম। সাতকড়ি আবার একটা বেশ লম্বা কবিতা আমাদের শোনালেন—আমরা বেড়াতে বেরুলে ওটা লিখেছেন। তার কয়েকটা লাইন এই রকম—

ওগো শ্যামল পাহাড়—
তোমার কী বা বাহার,
আমার মনে জাগাও দোলা
করো আমায় আপনভোলা
তুমি আমার ভাবের গোলা
জোগাও প্রাণের আহার—

টেনিদা বললে-পেটের আহার লিখলেও মন্দ হত না।
সাতকড়ি বললেন-তা-ও হত। তবে কিনা, পেটের আহারটা কবিতায় ভালো শোনায় না।
হাবুল জানাল—ভাবের গোলা না লেইখ্যা ধানের গোলাও লিখতে পারতেন।
এইসব উচুদরের কাব্যচর্চায় প্রায় নটা বাজল। তারপর প্রচুর আহার এবং দোতলায় উঠে সোজা কম্বলের তলায় লম্বা হয়ে পড়া।

নতুন জায়গা, সহজে ঘুম আসছিল না! আমরা কান পেতে বাইরে ঝিঝির ডাক আর দূরে ঝরনার শব্দ শুনছিলুম। ক্যাবলা হঠাৎ বলে উঠল—দ্যাখ, আমার কী রকম সন্দেহ হচ্ছে। জোয়ানের আরকের সঙ্গে থিয়োরি অফ রিলেটিভিটিইয়ার্কি নাকি! তারপর লোকটা নিজেকে বলছে বৈজ্ঞানিক—অথচ সারা বাড়িতে একটাও সায়েন্সের বই দেখতে পেলুম না। খালি কতকগুলো বিলিতি মাসিকপত্র আর ডিটেকটিভ বই। আমার

মনে হচ্ছে—

বলতে বলতে ক্যাবলা চমকে থেমে গেল—ওটা কিসের আওয়াজ রে!

কির-কির-কির—পাশের বন্ধ ঘরটা থেকে একটা মেশিন চলবার মতো শব্দ উঠল। আর তারপরেই—

অন্ধকার ঘরের সাদা দেওয়ালে মাঝারি সাইজের ছবির ফ্রেমের মতো চতুষ্কোণ আলো পড়ল একটা। আরে এ কী! আমরা চারজনেই তড়াক করে বিছানায় উঠে বসলুম—ছবি পড়ছে যে!

ছবি বই কি! সিনে ক্যামেরায় তোলা রঙিন ছবি। কিন্তু কী ছবি। এ কী—এ যে আমরাই! ম্যালে ঘুরছি—সিঞ্চলে সাতকড়ির সঙ্গে কথা কইছি—টেনিদা ক্যাবলাকে চাঁটি মারতে যাচ্ছে ঝাউ বাংলোর নীচে আমাদের গাড়িটা এসে থামল।

তারপর আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা

কাটা মুণ্ডুর নাচ দেখবে

শুনবে হাঁড়িচাঁচার ডাক

কাগামাছির প্যাঁচ দেখে নাও—

একটু পরেই চিচিংফাঁক।

সব শেষে

‘ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত হও।’

—ঝুমুরলাল

ফর কাগামাছি।

চৌকো আলোটা শাদা হয়ে দপ করে নিবে গেল। কির-কির করে আওয়াজটাও আর শোনা গেল না।

অন্ধকারে ক্যাবলাই চেঁচিয়ে উঠল—পাশের ঘর, পাশের ঘর! ওখান থেকেই প্রোজেক্টার চালিয়েছে।

টেনিদা আলো জ্বালাল। ক্যাবলা ছুটে গিয়ে পাশের বন্ধ ঘরের দরজায় লাথি মারল একটা।

দরজাটা খুলল না, ভেতর থেকে বন্ধ।

হাবুল ছুটে গিয়ে আমাদের ঘরের দরজা খুলতে গেল। সেটাও খুলল না। বাইরে থেকে কেউ শেকল বা তালা আটকে দিয়েছে বলে মনে হল।

কাটামুণ্ডুর নাচ

যতই টানাটানি করি আর চেঁচিয়ে গলা ফাটাই, দরজা আর কিছুতে খোলে না। শেষ পর্যন্ত হাবুল সেন থপ করে মেজের ওপরে বসে পড়ল।

—এই কাগামাছি অখন আমাগো মাছির মতন টপাটপ কইরা ধইরা খাইব।

—চার-চারটে লোককে গিলে খাবে ইয়ার্কি নাকি? ক্যাবলা কখনও ঘাবড়ায় না। সে বললে—পুবদিকের জানলার কাছে বড় একটা গাছ রয়েছে টেনিদা। একটু চেষ্টা করলে সেই গাছ বেয়ে আমরা নেমে যেতে পারি।

আমি বললুমআর নামবার সঙ্গে-সঙ্গে কাগামাছি আমাদের এক একজনকে—

—রেখে দে তোর কাগামাছি! সামনে আসুক না একবার, তারপর দেখা যাবে। টেনিদা তুমি আমাদের লিডার, তুমিই এগোও।

কনকনে শীত, বাইরে অন্ধকার, তার ওপর এই সব ঘঘারতর রহস্যময় ব্যাপার। জানালা দিয়ে গাছের ওপর লাফিয়ে পড়াটডা সিনেমায় মন্দ লাগে না, কিন্তু টেনিদার খুব উৎসাহ হচ্ছে বলে মনে হল না। মুখটাকে বেগুনভাজার মতো করে বললে-তারপর হাত-পা ভেঙে মরি আর কি? ও-সব ইন্দ্রলুপ্ত—মানে ধাপ্পামোর মধ্যে আমি নেই।

ক্যাবলা বললে—ইন্দ্রলুপ্ত মানে টাক। ধাপ্পামো নয়।

টেনিদা আরও চটে বললে-শাট আপ। আমি বলছি ইন্দ্রলুপ্ত মানে ধাপ্পামো। আমাকে বকাসনি ক্যাবলা, আমি এখন খুব সিরিয়াসলি সবটা বোঝবার চেষ্টা করছি।

ক্যাবলা বিরক্ত হয়ে বললে—তা হলে তুমি বোঝবার চেষ্টাই করো। আর আমি ততক্ষণে গাছ বেয়ে নামতে চেষ্টা করি।

টেনিদা বললে—এটা তো এক নম্বরের পুঁইচচ্চড়ি—মানে পুঁদিচ্চেরি বলে মনে হচ্ছে। এই প্যালা, শক্ত করে ওর ঠ্যাং দুটো টেনে ধর দিকি। এখুনি গাছ থেকে পড়ে একটা কেলেঙ্কারি করবে।

পত্রপাঠ আমি ক্যাবলাকে চেপে ধরতে গেলুম আর ক্যাবলা তক্ষুণি পটাং করে আমাকে একটা ল্যাং মারল। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাবুলের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়লুম আর হাবুল হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল খাইছে—খাইছে।

টেনিদা চিৎকার করে বললে—অল কোয়ায়েট! এখন সমূহ বিপদ। নিজেদের মধ্যে মারামারির সময় নয়। বালকগণ, তোমরা সব স্থির হয়ে বসো, আর আমি যা বলছি তা কান পেতে শোনো। দরজা বন্ধ হয়ে আছে থাকুক—ওতে আপাতত আমাদের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে না। আমরা আপাতত কম্বল গায়ে চড়িয়ে শুয়ে থাকি। সকাল হোক—তারপরে—

টেনিদা আরও কী বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনি বাইরে থেকে বিকট আওয়াজ উঠল—চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ—

হাবুল বললে—প্যাঁচা!

আওয়াজটা এবার আরও জোরালো হয়ে উঠল চ্যাঁ—চ্যাঁ-ঘ্যাঁচ—ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচা—

ক্যাবলা বললে—প্যাঁচা তো অত জোরে ডাকে না, তা ছাড়া ঘ্যাঁচা ঘ্যাঁচা করছে যে।

আমি পটলডাঙার প্যালারাম, অনেক দিন পালাজ্বরে ভুগেছি আর বাসকপাতার রস খেয়েছি। পেটে একটা পালাজ্বরের পিলে ছিল, সেটা পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খেতে-খেতে কোথায় সটকে পড়েছিল। কিন্তু ওই বিকট আওয়াজ শুনে কোত্থেকে সেটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, আবার গুরুগুরু করে কাঁপুনি ধরে গেল তার

ভেতর।

তখনি আমি বিছানায় উঠে পড়ে একটা কম্বল মুড়ি দিলুম। বললুম—আমি গোবরডাঙায় পিসিমার বাড়ি ও-আওয়াজ শুনেছি। ওটা হাঁড়িচাঁচা পাখির ডাক।

বাইরে থেকে সমানে চলতে লাগল সেই ঘ্যাঁচা—ঘ্যাঁচা শব্দ আর হাবুল ঝুমুরলালের সেই প্রায় কবিতাটা আওড়াতে লাগল

'গান ধরেছে হাঁড়িচাঁচায়,
কুণ্ডুমশাই মুণ্ডু নাচায়!'

সবাই চুপ, আরও মিনিটখানেক ঘ্যাঁচার ঘ্যাঁচার করে হাঁড়িচাঁচা থামল। ততক্ষণে আমাদের কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, মাথা বনবন করছে, আর বুদ্ধি-সুদ্ধি সব হালুয়ার মতো তালগোল পাকিয়ে গেছে একেবারে। বেপরোয়া ক্যাবলা পর্যন্ত স্পিকটি নট। জানালা দিয়ে নামবর কথাও আর বলছে না।

হাবুল অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে বললে খুবই ফ্যাসাদে পইড়া গেলাম দেখতাছি। অখন কী করন যায়?

আমি আরও ভালো করে কম্বল মুড়ি দিয়ে বললুম বাপ রে! কী বিচ্ছিরি আওয়াজ! আর-একবার হাঁড়িচাঁচার ডাক উঠলে আমি সত্যিই হার্টফেল করব, টেনিদা।

টেনিদা হাত বাড়িয়ে টকাস করে আমার মাথার ওপর একটা গাঁট্টা মারল।

—খুব যে ফুর্তি দেখছি, হার্টফেল করবেন। অঙ্কে ফেল করে করে তোর অভ্যেসই খারাপ হয়ে গেছে। আমরা মরছি নিজের জ্বালায় আর ইনি দিচ্ছেন ইয়ার্কি। চুপচাপ বসে থাক প্যালা! হার্ট-ফার্ট ফেল করাতে চেষ্টা করবি তো এক চাঁটিতে তোর কান—

এত দুঃখের মধ্যেও হাবুল বললে কানপুরে উইড়া যাইব।

ক্যাবলা গম্ভীর হয়ে বসেছিল। ডাকল—টেনিদা?

—বলে ফেল।

রাত্তিরে হাঁড়িচাঁচা ডাকে নাকি?

আমি বললুম কাগামাছি-স্পেশাল হাঁড়িচাঁচা। যখন খুশি ডাকতে পারে।

—দুত্তোর। ক্যাবলা বিষম ব্যাজার হয়ে বললে—আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে, টেনিদা।

—কী সন্দেহ শুনি?

—কাগামাছি-টাছি সব বোগাস। ওই সবুজদাড়ি সাতকড়ি লোকটাই সুবিধের নয়। রাত্তিরে ইচ্ছে করে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। প্রকৃতিকে ভালোবাসলেই সবুজ রঙের দাড়ি রাখতে হবে—এমন একটা যা-তা ফরমুলা বলছে—যার কোনও মানেই হয় না। থিয়োরি অভ রিলেটিভিটির সঙ্গে জোয়ানের আরক? পাগল না পেট-খারাপ ভেবেছে আমাদের।

টেনিদা বললে—কিন্তু সেই মিচকেপটাশ লোকটা?

—আর সিনে ক্যামেরা দিয়া আমাগো ছবিই বা তুলল কেডা? হাবুলের জিজ্ঞাসা।

—আর ছুঁচোবাজিই বা ছুঁড়ল কে? আমি জানতে চাইলুম।

ক্যবলা বললে—হুঁ। তবে সাতকড়ির পকেটে আমি দেশলাইয়ের খড়খড়ানি ঠিকই শুনতে পেয়েছিলুম। আমার মনে হয় সাতকড়িই কুয়াশার ভেতর থেকে ওটা ছুঁড়ে দিয়ে

বলতে বলতেই আবার

—চ্যাঁ-চ্যাঁ-ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচা-ঘ্যাঁচা—

হাবুল বললে—উঃ-সারছে। আমি প্রাণপণে কান চেপে ধরলুম।

ক্যবলা তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। বললেবুঝেছি জানলার নীচ থেকেই শব্দটা আসছে। আচ্ছা, দাঁড়াও।

বলেই আর দেরি করল না। টেবিলের ওপর কাচের জগভর্তি জল ছিল, সেইটে তুলে নিয়ে জানালা দিয়ে গব-গব করে ঢেলে দিলে। ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচা-ঘ্যাঁচ করে আওয়াজটা থেমে গেল মাঝপথেই। তারপরেই মনে হল, বাইরে কে যেন হুড়মুড় করে ছুটে পালাল। আরও মনে হল, কে যেন অনেক দূরে ফ্যাঁচো করে হেঁচে চলেছে।
ক্যাবলা হেসে উঠল।
—দেখলে টেনিদা, হাঁড়িচাঁচা নয়—মানুষ। এক জগ ঠাণ্ডা জলে ভালো করে নাইয়ে দিয়েছি, সারা রাত ধরে হেঁচে মরবে এখন। রাত্তিরে আর বিরক্ত করতে আসবে না।
হাবুল বললে কাগামাছি হাঁচতে আছে। আহা ব্যাচারাম শ্যাষকালে নিমোনিয়া না হয়।
টেনিদা বললে—হোক নিউমোনিয়া, মরুক। ফিলিম দেখাচ্ছে, সমানে ঘ্যাঁচা-ঘ্যাঁচা করছে—একটু ঘুমুতে দেবার নামটি নেই। চুলোয় যাক ওসব। দরজা যখন খুলবেই না—তখন আর কী করা যায়। তার চাইতে সবাই শুয়ে পড়া যাক।
কাল সকালে যা তোক দেখা যাবে।
ক্যবলা বললে—হুঁ, তা হলে শুয়েই পড়া যাক। আবার যদি হাঁড়িচাঁচা বিরক্ত করতে আসে, তা হলে ওপর থেকে এবার চেয়ার ছুঁড়ে মারব।

কম্বল জড়িয়ে আমরা বিছানায় লম্বা হলুম, মিনিট পাঁচেকের ভেতরেই টেনিদার নাক কুরকুর করে ডাকতে লাগল, হাবুল আর ক্যাবলাও ঘুমিয়ে পড়ল বলে মনে হল। কিন্তু আমার ঘুম আসছিল না। বাইরে রাত ঝমঝম করছে, ঝিঁঝি ডাকছে—জানালার কাচের ভেতর থেকে কালো কালো গাছের মাথা আর আকাশের জ্বলজ্বলে একরাশ তারা দেখা যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল বেশ ছিলুম দার্জিলিঙে, খামকা কাগামাছির পেছনে এই পাহাড়-জঙ্গলে এসে পড়েছি। কাছাকাছি জন-মানুষ নেই, এখন যদি কাগামাছি ঘরে ঢুকে আমাদের এক-একজনকে মাছির মতোই টপাটপ গিলে ফেলে, তা হলে আমরা ট্যাঁ-ফোঁ করবারও সুযোগ পাব না। তার ওপর এই শীতে এক-জগ ঠাণ্ডা জল গায়ে ঢেলে দেওয়ায় কাগামাছি নিশ্চয় ভয়ঙ্কর চটে রয়েছে। যদিও হাবুল আমার পাশেই শুয়েছে। তবু সাহস পাবার জন্যে ওকে আমি আস্তে আস্তে ধাক্কা দিলুম।
—এই হাবলা, ঘুমুচ্ছিস নাকি?
আর হাবুল তক্ষুনি হাঁউমাউ করে এক রাম-চিক্কার ছেড়ে ফিয়ে উঠল।
নাকের ডাক বন্ধ করে টেনিদা হাঁক ছাড়ল কী-কী—হয়েছে?
ক্যাবলা কম্বলসুদ্ধু নেমে পড়তে গিয়ে কম্বলে জড়িয়ে দড়াম করে আছাড় খেল একটা। টেনিদা বললে কী হয়েছে রে হাবুল, চেঁচালি কেন?
—কাগামাছি আমারে তো মারছে।
—কাগামাছি নয়, আমি। —আমি এই কথাটা কেবল বলতে যাচ্ছি, ঠিক তখন—
তখন সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটল। বড় আলো দুটো নিবিয়ে একটা নীল বাতি জ্বেলে আমরা শুয়ে পড়েছিলুম। হালকা আলোয় ছায়া-ছায়া ঘরটার ভেতর দেখা গেল এক রোমহর্ষক দৃশ্য।
আমরাই চোখে পড়েছিল প্রথম। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—ও কী? ঘরের ঠিক মাঝখানে শূন্যে কী ঝুলছে ওঠা!

আবছা আলোতেও স্পষ্ট দেখা গেল—ঠিক যেন হাওয়ায় একটা প্রকাণ্ড কাটামুণ্ডু নাচছে। তার বড় বড় দাঁত, দুটো মিটমিটে চোখ—ঠিক যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে সে।
আমরা চারজনেই এক সঙ্গে বিকট চিৎকার ছাড়লুম। তৎক্ষণাৎ ঘরের নীল আলোটাও নিবে গেল, যেন বিশ্রী গলায় হেসে উঠল, আর আমি—
আমার দাঁতকপাটি লাগল নির্ঘাত। আর অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগেই টের পেলুম, খাটের ওপর থেকে একটা

চাল কুমড়োর মতো আমি ধপাস করে মেঝেতে গড়িয়ে পড়েছি।

রা তে র ত দ ন্ত

খুব সম্ভব দাঁতকপাটি লেগে গিয়েছিল। আর রাত দুপুরে মাথার ওপর বেমক্কা একটা কাটা মুণ্ডু এসে যদি নাচতে শুরু করে দেয় তাহলে কারই বা দাঁতকপাটি না লাগে? কিন্তু বেশিক্ষণ অজ্ঞান হয়েও থাকা গেল না, কে যেন পা ধরে এমন এক হ্যাঁচকা টান মারল যে, কম্বল-টম্বল স্বদ্ধ আমি আর এক পাক গড়িয়ে গেলুম।
তখনও চোখ বন্ধ করেই ছিলুম। হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে বললুম—কাগামাছি-কাগামাছি।
—দুত্তোর কাগামাছি। ওঠ বলছি—কোত্থেকে যেন ক্যাবলাটা চেঁচিয়ে উঠল।
উঠে বসে দেখি কাটা মুণ্ডু-টু কিচ্ছু নেইঘরে আলো জ্বলছে। টেনিদা হাঁ করে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে। হাবুল সেন গুটিগুটি বেরিয়ে আসছে একটা খাটের তলা থেকে।
টেনিদা বললে ভূতের কাণ্ড রে ক্যাবলা। কাগামাছি স্রেফ ভূত ছাড়া কিছু নয়।
হাবুল কাঁপতে কাঁপতে বললে—মুলার মতো দাঁত বাইর কইর‍্যা খ্যাঁচখ্যাঁচ কইরা হাসতে আছিল। ঘাঁক কইর‍্যা একখান কামড় দিলেই তো কম্ম সারছিল!
ক্যাবলা বললে হুঁ।
আমি বললাম—হুঁ কী? রাত ভোর হোক, তারপরেই আমি আর এখানে নেই। সোজা দার্জিলিং পালিয়ে যাব।
ক্যাবলা বললে—পালা, যে-চুলোয় খুশি যা। কিন্তু যাওয়ার আগে একবার ওই স্কাই-লাইটটা লক্ষ করে দেখ।
—আবার মুণ্ড আসছে নাকি?—বলেই হাবুল তক্ষুনি খাটের তলায় ঢুকে পড়ল। টেনিদা একটা লাফ মারল আর আমি পত্রপাঠ বিছানায় উঠে কম্বলের তলায় ঢুকে গেলুম।
ক্যাবলা ভীষণ বিরক্ত হয়ে বললে—আরে তুমলোগ বহুত ডরপোক হো। দ্যাখ তাকিয়ে ও-দিকে। স্কাইলাইটটা খোলা। ওখান দিয়ে দড়ি বেঁধে একটা মুণ্ডু যদি ঝুলিয়ে দেওয়া যায় আর তারপরেই যদি কেউ সুড়ত করে সেটাকে টেনে নেয়—তা হলে কেমন হয়?
টেনিদা জিগগেস করলে—তা হলে তুই বলছিস ওটা—
—হ্যাঁ যদ্দুর মনে হচ্ছে, একটা কাগজের মুখোশ।
হাবুল আবার গুটিগুটি বেরিয়ে এল খাটের নীচের থেকে। আপত্তি করে বললে—না না, মুখোশ না। মুখে মুলার মতন দাঁত আছিল।
—তুই চুপ কর। —ক্যাবলা চেঁচিয়ে –ঠল-কাওয়ার্ড কোথাকার। শোন, আমি বলছি। যাওয়ার আগে যদি মুলোর মতো দাঁতগুলোকে গুঁড়ো করে দিয়ে যেতে না পারি, তাহলে আমার নাম কুশল মিত্তিরই নয়!
—তার আগে ওইটাই আমাগো কচমচাইয়া চাবাইয়া খাইব।
ক্যাবলা গজগজ করে কী বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় দরজা দিয়ে সাতকড়ি সাঁতরা এসে ঢুকলেন।
—ব্যাপার কী হে তোমাদের? রাত সাড়ে বারোটা বাজে—এখনও তোমরা ঘুমোওনি নাকি। আমি হঠাৎ জেগে উঠে দেখি তোমাদের ঘরে আলো জ্বলছে। তাই খবর নিতে এলুম।
টেনিদা চটে বললে--আচ্ছা লোক মশাই আপনি! এতক্ষণে খবর নিতে এলেন! ওদিকে আমরা মারা যাওয়ার জো! বাইরে থেকে দরজা বন্ধ, ভেতরে ভূতের কাণ্ড চলছে, আর আপনি বলছেন ঘুমুইনি কেন!
সাতকড়ি অবাক হয়ে বললেন—কেন, দরজা তো ভোলাই ছিল!
—খোলা ছিল! আধঘণ্ট টানাটানি করে আমরা খুলতে পারিনি।
সাতকড়ি ঘাবড়ে গেলেন। একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন কী হয়েছিল বলো দেখি?
আমি বললুম—বিনামূল্যে ফিলিম শো দেখেছি।
টেনিদা বললে—ঘ্যাঁচা-ঘ্যাঁচা করে কানের কাছে বিচ্ছিরিভাবে হাঁড়িচাঁচা ডাকছিল। এককুঁজো জল তার

মাথায় ঢেলে ক্যাবলা তাকে তাড়িয়েছে।
হাবুল বললে—আর চালের থনে অ্যাকটা কাটা মুণ্ডু বত্রিশটা দাঁত বাইর কইরা তুরুক রুরুক লাফাইতে আছিল।
টেনিদা কষে একটা গাঁট্টা বাগাল। দাঁতে দাঁত ঘষে বললে ব্যাটা নির্ঘাত মেফিস্টোফিলিস। একবার সামনে পেলে এমন দুটো ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেরে দেব যে ইয়াক-ইয়াক হয়ে যাবে।
সাতকড়ি বললে—দাঁড়াও-দাঁড়াও, ব্যাপারটা বুঝে দেখি। তার আগে তোমাদের একটু ভুল শুধরে দিই। মেফিস্টোফিলিস হল শয়তান। পুরুষ-ফরাসী ভাষায় মাসকুল্যাঁ! আর মাসকুল্যাঁ হলে বলা উচিত ল্য গ্রাঁ। অর্থাৎ কিনা মস্ত বড়। আর 'ডি'--অথাৎ 'দ্য টা ওখানে—
টেনিদা বললে—থামুন-থামুন। আমরা মরছি নিজের জ্বালায়, আর আপনি এই মাঝরাত্তিরে ফরাসী শোনাতে এসেছেন। আচ্ছা লোক তো!
—আচ্ছা, থাক-থাক। এখন খুলে বলো!
আমি বললুম—আপনি হাঁড়িচাঁচার ডাক শোনেননি?
—হাঁড়িচাঁচার ডাক? না তো! সাতকড়ি যেন গাছ থেকে পড়লেন।
হাবুল বললে—কন কী মশায়? আপনে কুম্ভকর্ণ নাকি! আমাগো কান ফাইটা যাইতাছিল আর আপনে শুনতেই পান নাই?
ক্যাবলা বললে—আঃ। তোরা একটু থাম তো বাপু। এমনভাবে সবাই মিলে বকবক করলে কোনও কাজ হয়? আমি বলছি শুনুন!
টেনিদা বললে—রাইট। অর্ডার—অর্ডার।
ক্যাবলা সব বিশদ বিবরণ শুনিয়ে দিলে সাতকড়িবাবুকে। সাতকড়ি কখনও হাঁ করলেন, কখনও চোখ গোল করলেন, কখনও বললেন, মাই ঘঃ—! শেষ পর্যন্ত শুনে একটা হুতোম প্যাঁচার মতো থ হয়ে রইলেন।
টেনিদা বললে তা হলে—
—তা হলে সেই কাগামাছি! এবার ঘোর বেগে আমাকে আক্রমণ করেছে দেখছি! না, ফরমুলাটা আর বাঁচানো যাবে না মনে অচ্ছে। আমার এতদিনের সাধনা—এমন যুগান্তকারী আবিষ্কার সব গেল—
আমি বললুম—এত ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে যদি পুলিশে খবর দেন—
—পুলিশ! সাতকড়ি সাঁতরা কিছুক্ষণ এমন বিচ্ছিরি মুখ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন যে, মনে হল এর চাইতে অদ্ভুত কথা জীবনে কোনওদিন তিনি শোনেননি।
ক্যাবলা বললে—আচ্ছা সাঁতরামশাই, আমাদের পাশের ঘরে কী আছে?
সাতকড়ি বললে—ওটা? ওটা স্ট্যাকরুম। মানে বাড়ির বাড়তি আর ভাঙাচুরো জিনিসপত্র জড়ো করে রাখা হয়েছে ওতে।
—ওর দরজায় চৌকো ফুটোটা এল কী করে? মানে যা দিয়ে এ-ঘরের দেওয়ালে প্রজেকটার দিয়ে ছবি ফেলা যায়?
চৌকো ফুটো? সাতকড়ি আকাশ থেকে পড়লেন—ফুটো আবার কে করবে? ফুটোফাটার কথা আবার কেন? কোনও ফুটোর খবর তো আমি জানিনে।
তা হলে জেনে নিন। ওই দেখুন।
সাতকড়ি উঠে দেখলেন আর দেখেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।
—সর্বনাশ! কাগামাছি দেখছি আমার ঘরে আড্ডা গেড়েছে। এবার আমি গেলুম! —সবুজ দাড়ি মুঠোয় চেপে ধরে তিনি হায় হায় করতে লাগলেন—একেবারে মারা গেলুম দেখছি।

ক্যাবলা বললে—মারা একটু পরে যাবেন। তার আগে ওই ঘরটা খুলবেন চলুন।
—ঘর? মানে ও-ঘরটা? ও খোলা যায় না!
—কেন খোলা যায় না?
সাতকড়ি বুঝিয়ে বললেন—মানে আসবার সময় ও-ঘরের চাবি কলকতায় ফেলে এসেছি কিনা। আর দুটো পেল্লায় তালা ও-ঘরে লাগানো আছে।
—সে-তালা ভাঙতে হবে!
সাতকড়ি হেসে বললেন—তা হলে দার্জিলিং থেকে কামার আনতে হয়। এমনিতে ও ভাঙবার বস্তু নয়।
টেনিদা বললে চলুন, দেখা যাক।
সবাই বেরুলুম। সারা বাড়িতে আলো জ্বলছে তখন। সাতকড়িই জ্বেলে দিয়েছেন নিশ্চয়। পাশের ঘরের সামনে গিয়ে দেখা গেল ঠিকই বলেছেন ভদ্রলোক। আধ হাত করে লম্বা দুটো তালা ঝুলছে। কামারেরও শানাবে বলে মনে হল না—খুব সম্ভব কামান দাগাতে হবে।
টেনিদা বললে কাল সকালে দেখতে হবে ভালো করে। ক্যাবলা বললে—এবার চলুন, বাইরে বেরুনো যাক।
আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললুম—আবার বাইরে কেন? কোথায় কাগামাছির লোক ঘাপটি মেরে বসে আছে। তার ওপর এই হাড় কাঁপানো শীত-বরং কালকে—
ক্যাবলা আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললে—তবে তুই একলা ঘরে শুয়ে থাক। আমরা দেখে আসি।
সর্বনাশ, বলে কী! একলা ঘরে থাকব! আর কায়দা পেয়ে ওপর থেকে কাটা মুণ্ডুটা ঝাঁ করে আমাকে তেড়ে আসুক! কামড়াবারও দরকার হবে—আর-একবার দন্ত-বিকাশ করলেই আমি গেছি।
দাড়িটা চুলকে নিয়ে বললুম—নানা, চলো, আমি তোমাদের সঙ্গেই যাচ্ছি। মানে, তোমাদেরও তো একটু সাহস দেওয়া দরকার!

বাইরে ঠাণ্ডা কালো রাত। পাইনের বন কাঁপিয়ে হু হু করে বাতাস দিচ্ছে কুয়াশা ছিড়ে ছিড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। দূরের কালো কালো পাহাড়ের মাথায় মোটা ভুটিয়া কম্বলের মতো পুরু পুরু মেঘ জমেছে, লাল বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে তার ভেতরে। সব মিলিয়ে যেন বুকের মধ্যে কাঁপুনি ধরে গেল আমার। এমন রাতে কোথায় ভরপেট খেয়ে লেপ কম্বলের তলায় আরামসে ঘুম লাগাব, তার বদলে হতচ্ছাড়া কাগামাছির পাল্লায় পড়ে—উফ!
সাতকড়ি সঙ্গে টর্চ এনেছিলেন। সেই আলোয় আমরা দেখলুম, ঠিক আমাদের জানালার নিচে মাটিতে খানিকটা জল রয়েছে তখনও, আর তার ভেতর কার জুতোপরা পায়ের দাগ।
ক্যাবলা বললে—হাঁড়িচাঁচা। মাথায় জল পড়তে কেটে পড়েছে।
পাশেই ঘাস। কাজেই জুতোপরা হাঁড়িচাঁচা কোনদিকে যে পালিয়েছে বোঝা গেল না। আরও খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে আমরা আবার ফিরে এলুম।
সাতকড়ি বললেন—যা হওয়ার হয়েছে এবার তোমরা শুয়ে পড়ো। আজ আর কোনও উৎপাত হয়তো হবে না। যাই হোক—আমি রাত জেগে পাহারা দেব এখন।
টেনিদা বললে—আমরাও পাহারা দেব!
—না-না, সে কী হয়। হাজার হোক তোমরা আমার অতিথি। শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো। দরকার হলে তোমাদের আমি ডাকব এখন।
আমরা যখন শুতে গেলাম, তখন ঝাউবাংলোর হলঘরের ঘড়িটায় টং করে একটা বাজল।
শোবার আগে দুটো কাজ করল ক্যাবলা। প্রথমে দড়ি টেনে টেনে সব কটা স্কাইলাইট ভালো করে বন্ধ করল,

তারপর ড্রেসিং টেবিলটা টেনে এনে পাশের ঘরের দরজার সামনে দাঁড় করালে যাতে ওখান থেকে কাগামাছি আবার আমাদের দেওয়ালে প্রজেক্টারের আলো ফেলতে না পারে।

তারপর কাগামাছির কথা ভাবতে-ভাবতে আমাদের ঘুম এল, আর সেই ঘুম একটানা চলল সকাল পর্যন্ত। কিন্তু তখন আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করিনি—পরের দিন কী নিদারুণ বিভীষিকা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

সা ত ক ড়ি গা য়ে ব

ঘুমব কী ছাই! সকলকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠতে হল কার হাঁউমাউ চিৎকারে ।

—কী হল কাঞ্ছা—ব্যাপার কী?

কাঞ্ছা বললেবাবু গায়েব।

—গায়েব? কাঞ্ছা জবাব দিল—জু!

—কোথায় গায়েব? কেমন করে গায়েব?

কাঞ্ছা হাঁউমাউ করে অনেক কথাই বলে গেল নেপালী ভাষায়। তোমরা তো আর সবাই নেপালী বুঝবে না, সন্দেশের সম্পাদকমশাইরাও সে কান্না-ভেজানো ভাষা কতটা বুঝবেন তাতে আমার সন্দেহ আছে। তাই সকলের সুবিধের জন্যে কাঞ্ছার কথাগুলো মোটামুটি শাদা বাংলায় লিখে দিচ্ছি—

কাঞ্ছার বক্তব্য হচ্ছে—

রোজ ভোর পাঁচটায় নাকি সাতকড়ি সাঁতরা এককাপ চা খেতেন। কাঞ্ছা বললে—'ব্যাড-টি'। আর শৌখিন লোক সবুজদাড়ি সাঁতরামশাই খারাপ চা খেতেন ভাবতেই আমরা বিচ্ছিরি লাগল। ক্যাবলা আমার কানে কানে বললে-বোধ হয় বেড-টি মিন করেছে। যাই হোক, ভোরবেলা কাঞ্ছা চা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই একেবারে থ । বাংলা ডিটেকটিভ বইতে লেখা থাকে—হুবহু ঠিক তাই ঘটেছে। অথাৎ ঘরটি একেবারে তছনছ বালিশ কম্বল সব মেঝেয় পড়ে আছে, এক কোণে একটা টিপয় কাত হয়ে রয়েছে, কার একটা ভাঙা হুঁকো রয়েছে সাতকড়ির বিছানার ওপর, দরজার বাইরে একগাছা মুড়ো ঝাঁটা, সিঁড়িতে দেখা যাচ্ছে কুকুরে-চিবুনো একপাটি চপ্পল। মানে অনেক কিছুই আছে—কেবল নেই সাতকড়ি সাঁতরা। তিনি স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছেন।

টেনিদা বললে কাঞ্ছা বোধহয় বেড়াতে বেরিয়েছেন।

কাঞ্ছা জানালে, সেটা অসম্ভব। কারণ ভোর পাঁচটায় ব্যাড-টি না পেলে, পাঁচটা বেজে সাত মিনিটের সময় সাতকড়ি চিৎকার করে কাঞ্ছাকে ডাকেন আর গ্যাড-ম্যাড করে ইংরেজিতে গাল দিতে থাকেন। সুতরাং চা না খেয়ে ঘর থেকে বেরুবেন এমন বান্দাই তিনি নন। তা ছাড়া নিজের বালিশ-বিছানা নিয়ে এর আগে তাঁকে কোনওদিন কুস্তি লড়তেও দেখা যায়নি। আরও বড় কথা, ভাঙা হুঁকো, মুড়ো ঝাঁটা আর কুকুরে-চিবনো চপ্পলই বা এল কোত্থেকে? তবু দেড় ঘণ্টা-দু ঘণ্টা ধরে কাঞ্ছা সব জায়গায় তাঁকে খুঁজেছে। কিন্তু কোথাও তাঁর সবুজ দাড়ির ডগাটি পর্যন্ত খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত এসে ডেকে তুলেছে আমাদের।

কিছুক্ষণ আমরা বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। শেষে টেনিদা বললে কাঞ্ছা তা হলে একবার দেখে আসা যাক ঘরটা।

হাবুল সেন বললে—দেইখ্যা আর হইব কী! কাগামাছিতে তারে লইয়া গেছে।

ক্যাবলা বললে—তুই একটু চুপ কর তো হাবুল। দেখাই যাক না একবার।

আমরা সাতকড়ি সাঁতরার ঘরে গেলাম । ঠিকই বলেছে কাঞ্ছা। ঘরের ভেতরে একেবারে হইহই কাণ্ড-রইরই ব্যাপার! সবকিছু ছড়িয়ে-টড়িয়ে একাকার। ভাঙা হুঁকো ছেড়া চপ্পল, মুড়ো-ঝাঁটা—সব রেডি।

টেনিদা ভেবে-চিন্তে বললে—ওই ছেড়া চপ্পল পায়ে দিয়ে হুঁকো খেতে খেতে কাগামাছি এসেছিল!

হাবুল মাথা নেড়ে বললে—হ। আর ওই ঝাঁটাটা দিয়া সাঁতরা মশাইরে রাম-পিটানি দিছে।

তখন আমার মগজে দারুণ একটা বুদ্ধি তড়াং করে নেচে উঠল। আমি বললুম-ভাঙা হুঁকোতে তামাক খাবে কী করে? ওর একটা গভীর অর্থ আছে। জাপানীরা হুঁকো কবিতা লেখে কিনা, তাই কাগামাছি হুঁকোটা রেখে জানিয়ে গেছে যে সে জাপানী ।

শুনে ক্যাবলা ঠিক ডিমভাজার মতো বিচ্ছিরি মুখ করে আমাকে ভেংচে উঠল—থাম থাম, তোকে আর

ওস্তাদি করতে হবে না। হাইকু কবিতা হুঁকো হবে কোন্ দুঃখে? আর কার এমন দায় পড়েছে যে সাত বছরের পুরনো কুকুরের-খাওয়া চটি পায়ে দেবে? পায়ে কি দেওয়াই যায় ওটা? তা ছাড়া কে কবে শুনেছে যে ডাকাত মুড়ো-ঝাঁটা নিয়ে আসে? সে তে পিস্তল-টিস্তল নিয়ে আসবে।

—হয়তো কাগামাছির পিস্তলটিস্তল নেই, সে গরিব মানুষ। আর ওটা যে সাধারণ একটা বুড়ো খ্যাংরা তাই বা কে বললে? হয়তো ওর প্রত্যেকটা কাঠিতে সাংঘাতিক বিষ রয়েছে, হয়তো ওর মধ্যে ডিনামাইট ফিট করা আছে—

ক্যাবলার ডিমভাজার মতো মুখটা এবার আলুকাবলির মতো হয়ে গেল—হয়তো ওর মধ্যে একটা অ্যাটম বম আছে, দুটো স্পুটনিক আছে, বারোটা নেংটি উদুর আছে? যত সব রদ্দিমার্কা ডিটেকটিভ বই পড়ে তোমাদের মাথাই খারাপ হয়ে গেছে দেখছি!—বলে, আমরা হাঁই-হাই করে ওঠবার আগেই সে মুড়ো-ঝাঁটায় জোর লাথি মারল একটা। বোমা ফাটল না, দাড়ুম-দুড়ুম কোনও আওয়াজ হল না, ক্যাবলা মারা পড়ল না, কেবল ঝাঁটাটা সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে সোজা বাগানে গিয়ে নামল।

ঠিক তখন ক্যাবলা চেঁচিয়ে উঠল—আরে এইটা কী?

হুঁকোর মাথায় যেখানটায় কলকে থাকে, সেখানে একটা কাগজের মতো কী যেন পাকিয়ে গোল করে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। হাবুল হুঁকোটা তুলে আনতেই টেনিদা ছোঁ মেরে কাগজটা তুলে নিলে।

ডিটেকটিভ বইতে যেমন লেখা থাকে, অবিকল সেই ব্যাপার!

একখানা চিঠিই বটে। আমরা একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ে দেখলুম, চিঠিতে লেখা আছে :

'প্রিয় চার বন্ধু !

কাগামাছি দলবল নিয়ে ঘেরাও করেছে—দু'মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে। আমি জানি, এক্ষুনি তারা লোপাট করবে আমাকে। তাই ঝটপট লিখে ফেলছি চিঠিটা। আমাকে গায়েব করে ফরমুলাটা জেনে নেবে। তোমরা আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো। কিন্তু সাবধান—পুলিশে খবর দিয়ো না। তা হলে তক্ষুনি আমায় খুন —'

আর লেখা নেই। কিন্তু চিঠিটা যে সাতকড়িরই লেখা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এটুকু লেখবার পরেই সদলবলে কাগামাছি এসে ওঁকে খপ করে ধরে ফেলেছে।

রহস্য নিদারুণ গভীর! এবং ব্যাপার অতি সাংঘাতিক!

আমরা চারজনেই দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে মাথা চুলকোতে লাগলুম! এখন কী করা যায়?

একটু পরে টেনিদা বললে—দা-দার্জিলিঙেই চলে যাব নাকি রে? হাবুল বললে, সেইডা মন্দ কথা না। বজ্ঞবাহাদুর গাড়ি নিয়া আসলেই—

ক্যাবলা চটে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—তোমাদের লজ্জা করে না? বিপদে পড়ে ভদ্রলোক ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে ডাকাতের হাতে ফেলে পালাবে? পটলডাঙার ছেলেরা এত কাপুরুষ? এর পরে কলকাতায় ফিরে মুখ দেখাবে কী করে?

হাবুল সেনের একটা গুণ আছে সব সময়েই সকলের সঙ্গে সে চমৎকার একমত হয়ে যেতে পারে। সে বললে —হ সত্য কইছ। মুখ দ্যাখান দাইব না।

আমি বললুম—কিন্তু সাঁতরামশাইকে কোথায় পাওয়া যাবে? হয়তো এতক্ষণে তাঁকে কোনও গুপ্তগৃহে

—শাট আপ—গুপ্তগৃহ! রাগের মাথায় ক্যাবলার মুখ দিয়ে হিন্দীতে বেরুতে লাগল—কেয়া, তুমলোগ মজাক কর রহে হো? বে-কোয়াশ বাত ছোড়ো। গুপ্তগৃহ অত সহজে মেলে না-ও শুধু ডিটেকটিভ বইতেই লেখা থাকে। চলো—বাড়ির পেছনে পাইনের বনটা আগে একটু খুঁজে দেখি! তারপর যা হয় প্ল্যান করা যাবে!

টেনিদা মাথা চুলকে বললে—এক্ষুনি?

—এক্ষুনি।

টেনিদার খাঁড়ার মতো নাকের ডগাটা কেমন যেন বেঁটে হয়ে গেল—মানে একটু চা-টা খেয়ে বেরুলে কী বলে ঠিক গায়ের জোর পাওয়া যাবে না। খিদেও তো পেয়েছে—তাই—

ক্যাবলা বললে—এই কি তোমার খাবার সময়? শেম—-শেম!

'শেম—শেম শুনেই আমাদের লিডার সঙ্গে সঙ্গে বুক টান করে দাঁড়িয়ে গেল। ঘরের একটা খুঁটি ধরে বার তিনেক বৈঠক দিয়ে টেনিদা বললে-অলরাইট। চল—এই মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়া যাক।

কিন্তু কাঞ্ছা অতি সুবোধ বালক। সাতকড়ি লোপাট হয়ে গেছেন বটে, কিন্তু কাঞ্ছা নিজের ডিউটি ভুলে যায়নি। সে বললে-ব্রেকফাস্ট তৈরিই আছে বাবু। খেয়েই বেরোন।

ক্যাবলার দিকে আমরা ভয়েভয়ে তাকালুম। ক্যাবলা বললে–বেশ, তা হলে খেয়েই বেরুনো যাক। কিন্তু মাইন্ড ইট–পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমাদের বেরুতে হবে। আর এই প্যালাটা যে আধ ঘণ্টা ধরে বসে টোস্ট চিবুবে সেটা কিছুতেই চলবে না।

—বা-রে, যত দোষ আমার ঘাড়েই! আমার রাগ হয়ে গেল। বললুম—আমিই বুঝি আধ ঘণ্টা ধরে টোস্ট চিবুই? আর তুই যে কালকে এক ঘণ্টা ধরে মুরগির ঠ্যাং কামড়াচ্ছিলি, তার বেলায়?

টেনিদা কড়াৎ করে আমার কানে জোর একটা চিমটি দিয়ে বললে—অ্যাই চোপ—বিপদের সময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে নেই।

আমি চেঁচিয়ে বললুম—খালি আমাকেই মারলে? আর ক্যাবলা যে—

—ঠিক! ও-ও বাদ যাবে না বলেই টেনিদা ক্যাবলাকে লক্ষ্য করে একটা রাম চাঁটি হাঁকড়াল। ক্যাবলা স্কুট করে সরে গেল, আর চাঁচিটা গিয়ে পড়ল হাবুলের মাথায়।

—খাইছে খাইছে! বলে চেঁচিয়ে উঠল হাবুল। একেবারে ষাঁড়ের মতো গলায়।

শত্রুর ভীষণ আক্রমণ

খেয়েদেয়ে আমরা বনের মধ্যে ঢুকে পড়লুম।

ঝাউ বাংলোর ঠিক পেছনেই জঙ্গলটা! পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে কত দূর পর্যন্ত চলে গেছে কে জানে! সারি সারি পাইনের গাছ, এখানে-ওখানে টাইগার ফার্নের ঝোপ, বড় ধুতরোর মতো সানাই ফুল, পাহাড়ি উঁই-চাঁপা। শাদায় কালোয় মেশানো সোয়ালোর ঝাঁক মধ্যে-মধ্যে আশপাশ দিয়ে উড়ে যেতে লাগল তীর বেগে, কাকের মতো কালো কী পাখি লাফাতে লাফাতে বনের ভেতর অদৃশ্য হল আর লতা-পাতা, সোঁদা মাটি, ভিজে পাথরের ঠাণ্ডা গন্ধ—সব মিলিয়ে ভীষণ ভালো লাগল জঙ্গলটাকে।

আমি ভাবছিলুম এই রকম মিষ্টি পাহাড় আর ঠাণ্ডা বনের ভেতর সন্নিসি-টন্নিসি হয়ে থাকতে আমিও রাজি আছি, যদি দু'বেলা বেশ ভালোমতন খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত থাকে। সত্যি বলতে কী, আমার সকালবেলাটাকে ভীষণ ভালো লাগছিল, এমন কি সবুজদাড়ি, সাতকড়ি সাঁতরা, সেই হতচ্ছাড়া কাগামাছি, সেই মিচকেপটাশ কদম্ব পাকড়াশি—সব মুছে গিয়েছিল মন থেকে। বেশ বুঝতে পারছিলুম, এই বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ান বলেই সাতকড়ির মগজে কবিতা বিজ বিজ করতে থাকে।

ওগো পাইন,
ঝিলমিল করছে জ্যোৎস্না
দেখাচ্ছে কী ফাইন!

আমিও প্রায় কবি কবি হয়ে যাচ্ছি, এমন সময় টেনিদা বললে—দুৎ, এ-সবের কোনও মানেই হয় না। কোথায় খুঁজে বেড়াবে বল দিকি বনের মধ্যে? আর তা ছাড়া সাতকড়িবাবুকে নিয়ে জঙ্গলের দিকেই তারা গেছে তারও তো প্রমাণ নেই।

আমি বললুম-ঠিক। সামনে অত বড় রাস্তা থাকতে খামকা জঙ্গলেই বা ঢুকবে কেন?

ক্যাবলা বললে প্রমাণ চাও? ওই দ্যাখো!

আরে তাই তো! একটা ঝোপের মাথায় রঙচঙে কী আটকে আছে ওটা? এক লাফে এগিয়ে গিয়ে সেটাকে পাকড়াও করল হাবুল

এই জিনিসটা আর কিছুই নয়। চকোলেটের মোড়ক! তা হলে নিশ্চয়—

আমি বললুম কদম্ব পাকড়াশি!

হাবুল ঝোপের মধ্যে কী খুঁজছিল।

ক্যাবলা বললে—আর কিছু পেলি নাকি রে?

হাবুল বললে-না—পাই নাই। খুঁইজ্যা দেখতাছি।

যদি চকোলেটখানাও এইখানে পইড়া থাকে, তাহলে জুত কইরা খাওন যাইব।

—জুত করে আর খেতে হবে না! চলে আয়! কড়া গলায় ডাকল ক্যাবলা।

ব্যাজার হয়ে হাবুল চলে এল। আর এর মধ্যেই আর-একটা আবিষ্কার করল টেনিদা। মোড়কটার পেছন দিকে শাদা কাগজের ওপর পেনসিল দিয়ে কী সব লেখা।

—এ আবার কী রে ক্যাবলা?

ক্যাবলা কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগল। এবারেও একটা ছড়া—

সাঁতরামশাই গুম
টাক ডুমাডুম ডুম।
বৃক্ষে ও কী লম্ব

বলছে শব্বীকদম্ব!

সেই কদম্ব পাকড়াশি! সেই ধুসো মাফলার জড়ানো, সেই মিচকে-হাসি ফিচকে লোকটা!

লেখা পড়ে আমরাও গুম হয়ে রইলুম। তারপর টেনিদা বললে—ক্যাবলা!

ক্যাবলা গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললে—হুঁ!

-কী বুঝছিস?

—এই জঙ্গলের মধ্যেই তা হলে কোথাও ওরা আছে।

—কিন্তু কোথায় আছে? আমি বললুম—জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা একেবারে সিকিম-ভূটান পার হয়ে যাব নাকি?

ক্যাবলা আরও গম্ভীর হয়ে বললে—দরকার হলে তাও যেতে হবে।

—খাইছে! হাবুলের আর্তনাদ শোনা গেল।

ক্যাবলা তাতে কান দিল না। ছড়াটা আর একবার নিজে নিজেই আউড়ে নিয়ে বললে—সাঁতরামশাই গুম হয়েছেন এটা তো পরিষ্কার দেখাই যাচ্ছে।

—আর সেইজন্য আনন্দে কাগামাছি আর কদম্ব বলছে টাক-ডুমাডুম। আমি ব্যাখ্যা করে দিলুম।

হাবুল বললে—কদম্ব সেই কথাই কইতে আছে।

ক্যাবলা ভুরু কোঁচকাল। শার্টের পকেট থেকে একটা চুয়িংগাম মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে বললে—এ-সব ঠিক আছে। কিন্তু বৃক্ষে ও কী লম্ব—এর মানে কী?—গাছে কী ঝুলছে?

—গাছে কী বুলব? পাকা কাঁঠাল ঝুলতে আছে বোধ হয়।

শুনেই টেনিদা ভীষণ খুশি হয়ে উঠল!

—পাকা কাঁঠাল ঝুলছে? তাই নাকি? কোথায় ঝুলছে রে?

—তুমলোগ কেতনা বেফায়দা বাত কর রহে হো? —ক্যাবলা চেঁচিয়ে উঠল—খাওয়ার কথা শুনলেই তোমাদের কারও আর মাথা ঠিক থাকে না। পাইন বনের ভেতর পাকা কাঁঠাল কোত্থেকে ঝুলছে? আর এই সময়? ওর একটা গভীর অর্থ আছে, বলে আমার মনে হয়।

—কী অর্থ শুনি?—কাঁটাল না পেয়ে ব্যাজার হয়ে জিগগেস করল টেনিদা।

—একটু দেখতে হচ্ছে। চলো, এগোনো যাক।

বেশি দূর এগোবার দরকার হল না। এবারে চেঁচিয়ে উঠল হাবুলই।

—ওই—ওইখানেই ঝুলতাছে।

—কী ঝুলছে? কী ঝুলছে?

—আমরা আরও জোরে চিৎকার করলুম।

—দেখতে আছ না? ওই গাছটায়?

কী একটা পাহাড়ী গাছ। বেশি উঁচু নয়, কিন্তু অনেক ডালপালা আর তাতে বানর লাঠির মতো লম্বা লম্বা সব ফল রয়েছে। সেই গাছের মগডালে শাদা কাপড়ের একটা পুঁটলি।

আমরা খানিকক্ষণ হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে রইলুম। তারপর টেনিদা বললে—তা হলে ওটাই সেই বৃক্ষে লম্ব ব্যাপার।

ক্যাবলা বললে—হু।

টেনিদা বললে—তা হলে ওটাকে তো পেড়ে আনতে হয়!

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললুম—দরকার কী টেনিদা—যা লম্বা হয়ে আছে তা ওই লম্বমান থাকুক না! ওটাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে কাজ নেই।

হাবুল বললে—হ, সত্য কইছস। কয়েকটা বোম্বা-টোম্বা লম্ব কইরা রাখছে কি কেডা কইব? দুডুম কইরা ফাইট্যা গিয়া শ্যাষে আমাগো উড়াইয়া দিব।

টেনিদা বললে তা-ও অসম্ভব নয়।

ক্যাবলা বললে—ভীতুর ডিম সব! ছো ছো, এমনি কাওয়ার্ডের মতো তোমরা কাগামাছির সঙ্গে মোকাবিলা করতে চাও! যাও—এখুনি সবাই মুখে ঘোমটা টেনে দার্জিলিঙে পালিয়ে যাও!

টেনিদা মধ্যে-মধ্যে বেগতিক দেখলে এক-আধটু ঘাবড়ে যায় বটে, কিন্তু কাওয়ার্ড কথাটা শুনলেই সে সিংহের মতো লাফিয়ে ওঠে। আর আমি—পটলডাঙার পালারাম, এককালে যার কচি পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোলই নিত্য বরাদ্দ ছিল, আমার মনটাও সঙ্গে সঙ্গে শিঙিমাছের মতো তড়পে ওঠে।

টেনিদা বললে কী বললি! কাওয়ার্ড! ঠিক আছে, মরতে হয় তো আমিই মরব! যাচ্ছি গাছে উঠতে। শুনে আমার রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ে গেল

'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান' ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও মনে হল, বীরের মতো মরবার সুযোগ যদি এসেই থাকে আমিই বা ছাড়ব কেন? এগিয়ে গিয়ে বললুম—তুমি আমাদের লিডার—মানে সেনাপতি। প্রাণ দিতে হলে সৈনিকদেরই দেওয়া উচিত। সেনাপতি মরবে কেন? আমিই গাছে উঠব।

ক্যাবলা বললে-শাবাশ-শাবাশ!

আর টেনিদা আর হাবুল মিলে দারুণ ক্ল্যাপ দিয়ে দিলে একখানা! ক্ল্যাপ পেয়ে ভীষণ উৎসাহ এসে গেল। আমি তড়াক করে গাছে চড়তে গেলুম! কিন্তু একটু উঠেই টের পেলুম, প্রাণ দেওয়াটা শক্ত কাজ নয়—তার চাইতে আরও কঠিন ব্যাপার আছে। মানে কাঠপিঁপড়ে!

টেনিদা বললে—তাতে কী হয়েছে! বীরের মতো উঠে যা! আর নজরুলের মতো ভাবতে থাক আমি ধূর্জটি--আমি ভীম ভাসমান মাইন।

কামড়ে ত্রিভুবন দেখিয়ে দিচ্ছে—এখন মাইন-টাইন কারও ভালো লাগে? দাঁত-টাঁত খিচিয়ে—মুখটাকে ঠিক ডিমের হালুয়ার মতো করে আমি গাছের ডগায় উঠে গেলুম!

সামনেই দেখছি কাপড়ের পুঁটলিটা। একবারের জন্য হাত কাঁপল, বুকের ভেতরটা হাঁকপাঁক করে উঠল। যদি সত্যিই একটা বোমা ফাটে? যদি—কিন্তু ভেবে আর লাভ নেই। কবি লিখেছেন—মরতে হয় তো মর গে! আর যেরকম পিপড়ে কামড়াচ্ছে, তাতে বোমার ঘায়ে মরাই ঢের বেশি সুখের বলে মনে হল এখন।

দিলুম হাত। ভেতরে কতগুলো কী সব রয়েছে। ফাটল না।

টেনিদা বললে,—টেনে নামা। তারপর নীচে ফেলে দে।

আমি দেখলুম, পুঁটলিটা আলগা করেই বাঁধা আছে, খুলতে সময় লাগবে না, নীচে ওদের ডেকে বললুম—আমি ফেলছি, তোমরা সবাই সরে যাও! যদি ফাটে-টাটে—

ফেলে দিলুম, তারপরেই ভয়ে বন্ধ করলুম চোখ দুটো। পুঁটলিটা নীচে পড়ল, কিন্তু কোনও অঘটন ঘটল না, কোনও বিস্ফোরণও হল না। তাকিয়ে দেখি, ওরা গুটিগুটি পুঁটলিটার দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু গাছে আর থাকা যায় না—কাঠপিঁপড়েরা আমার ছাল-চামড়া তুলে নেবার প্ল্যান করেছে বলে মনে হল। আমি প্রাণপণে নামতে আরম্ভ করলুম।

আর নেমে দেখি—

ওরা সব থ হয়ে পুঁটলিটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। ওটা ভোলা হয়েছে আর ওর ভেতরে কাঁচাকলা! স্রেফ চারটে কাঁচকলা! সাধুভাষায় যাকে তরুণ কদলী বলা যায়।

টেনিদা নাকটাকে ছানার জিলিপির মতো করে বললে—এর মানে কী? এত কাণ্ড করে চারটে কাঁচকলা!

ক্যাবলা মোটা গলায় বললে, ঠিক চারটে! আমরাও চারজন। মানে, মাথাপিছু একটা করে।

হাবুল বললে—তা হলে আমাগো—

আর বলতে পারল না, তক্ষুনি ছটাং-ছটাং

অদৃশ্য শত্রুর অস্ত্র ছুটে এল আমাদের দিকে। একটা পড়ল টেনিদার নাকে, আর একটা হাবুলের মাথায়। টেনিদা লাফিয়ে উঠলো—ই-ই-ই—

হাবুল হাউ হাউ করে বললে-খাইছে—খাইছে।

তা 'খাইছে খাইছে' ও বলতেই পারে! দুটো সাংঘাতিক অস্ত্র মানে পচা ডিম। পড়েই ভেঙেছে। টেনিদার মুখ আর হাবুলের মাথা বেয়ে নামছে বিকট দুর্গন্ধের স্রোত!

আমি কী বলতে যাচ্ছিলুম, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা পচা ডিম এসে আমার পিঠেও পড়ল। আর একটা ক্যাবলার কান ঘেঁষে বোঁ করে বেরিয়ে গেল—একটুর জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট!

ক্যা চ-ক ট-ক ট

চারটে কাঁচকলার ধাক্কা যদি বা সামলানো গিয়েছিল, পচা ডিম আমাদের একেবারে বিধ্বস্ত করে দিলে! বিশেষ যে লেগেছিল তা নয়—কিন্তু তার কী খোশবু! সে-গন্ধে আমি তো তুচ্ছ—স্বয়ং গন্ধরাজ ছুঁচোর পর্যন্ত দাঁতকপাটি লেগে যাবে!

হাবুল বললে—ইস, দফাখান সাইরা দিছে একেবারে। অখনি গিয়া সাবান মাইখ্যা চান করন লাগব!

আমি মিষ্টি গলায় পিনপিন করে বললুম—আমার এমন ভালো কোটটাকে—

কথাটা শেষ হল না। তার আগেই ক্যাবলা বললে-টেনিদা, উয়ো দেখখো!

ক্যাবলা অনেকদিন পশ্চিমে ছিল, চটে গেলে কিংবা খুশি হলে কিংবা উত্তেজিত হলে ওর গলা দিয়ে হিন্দি বেরুতে থাকে। পচা ডিমের গন্ধে টেনিদা তখন তিড়িং-মিড়িং করে লাফাচ্ছিল, দাঁত খিচিয়ে বললে—কী আবার দেখব র‍্যা? তোর কুবুদ্ধিতে পড়ে সেই জোচ্চোর কাগামাছিটার হাতে—

ক্যাবলা বললে—আরে জী, জেরা আঁখসে দেখো না উধার—উয়ো পেড় কি পিছে।

টেনিদা থমকে গেল।

—আরে তাই তো! ওই গাছটার পেছনে কেউ লুকিয়ে আছে মনে হয়। ওই লোকটাই তাহলে ডিম ছুঁড়ে মেরেছে, নিঘাত! পীরের সঙ্গে মামদোবাজি—বটে!

টেনিদা এমনিতে বেশ আছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, আমাদের পকেটে হাত বুলিয়ে দিব্যি আলুকাবলি থেকে চপ-কাটলেট পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছে, কিছু বলতে গেলেই চাঁটি কিংবা গাঁট্টা বাগিয়ে তেড়ে আসছে, কিন্তু কাজের সময় একেবারে অন্য চেহারা—যাকে বলে সিংহ। তখনই আমাদের আসল লিডার। আমাদের পাড়ায় ওদিকে গত বছর বস্তিতে আগুন ধরে গেল, ফায়ার ব্রিগেড পৌছবার আগেই একটা বাচ্চাকে পাঁজাকোলা করে বেরিয়ে এল তিন লাফে! সাধে কি টেনিদাকে এত ভালবাসি আমরা।

গাছের আড়ালে শত্রুকে দেখতে পেয়েই টেনিদা গায়ের কোটটাকে ছুঁড়ে ফেলল! বললে--হা-রে-রে-রে! আজ এক চড়ে কাগামাছির মুণ্ডু যদি কাটমুণ্ডুতে পৌছে না দিই তবে আমি টেনি মুখুজ্যেই নই।

বলেই 'ডি-লা-গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস' শব্দে এক রাম-চিৎকার। তারপরেই এক লাফে ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে তীরের মতো গাছটার দিকে ছুটে গেল ; আমরা হতভম্বের মত চেয়ে রইলুম, 'ইয়াক ইয়াক পর্যন্ত বলতে পারলুম না।

টেনিদাকে তীরের মত ছুটতে দেখেই লোকটা ভোঁ দৌড়! ঝোপজঙ্গলের মধ্যে ভালো দেখা যাচ্ছিল না, তবু যেন মনে হল, লোকটা যেন আমাদের অচেনা নয়, কোথাও ওকে দেখেছি!

বনের মধ্যে দিয়ে ছুটল লোকটা। টেনিদা তার পেছনে। এক মিনিট পরেই আর কিছু দেখতে পেলুম না, শুধু দৌড়ানোর আওয়াজ আসতে লাগল। তারপরেই কে যেন ধপাস করে পড়ল, খানিকটা ঝটাপটির আওয়াজ আর টেনিদার চিৎকার কানে এল হাবুল-প্যালা ক্যাবলা, ক্যাচ কটকট! কুইককুইক!

ক্যাচ-কট কট! তার মানে কাউকে ধরে ফেলেছে!

ডি-লা-গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস, ইয়াক-ইয়াক! আমরা তিনজনে বোঁ-বোঁ করে ছুটলুম সেদিকে। পাহাড়ি উঁচু-নিচু রাস্তায় ছুটতে গিয়ে নুড়িতে পা পিছলে যায়, ডান হাতে বিছুটির মতো কী লেগে জ্বালাও করতে লাগল, কিন্তু আর কি কোনওদিকে তাকাবার সময় আছে এখন! এক মিনিটের মধ্যেই টেনিদার কাছে পৌছে গেলুম আমরা।

দেখি, টেনিদা বসে আছে মাটিতে। তার এক হাতে একটা মেটে রঙের ধুসসা মাফলার, আর এক হাতে দুটো চকোলেট। সামনে কতকগুলো কাগজপত্র ছড়ানো।

আমরা কিছু বলবার আগেই টেনিদা করুণ গলায় বললে-ধরেছিলুম লোকটাকে, একদম জাপটে। কিন্তু দেখছিস তো, পাথর কী রকম পেছল, স্লিপ করে পড়ে গেলুম। লোকটাও খানিক দূরে কুমড়োর মতো গড়িয়ে উঠে ছুট লাগাল! এদিকে দেখি, একটা পা একটু মচকে গেছে—আর তাড়া করতে পারলুম না।

ক্যাবলা বললে—কিন্তু এগুলো কী?

—সেই হতচ্ছাড়া কাগামাছি না বগাহাঁচির পকেট থেকে পড়েছে। আর ধুসো মাফলারটা আমি কেড়ে নিয়েছি। বলেই একটা চকোলেটের মোড়ক খুলে তার এক-টুকরো ভেঙে নির্বিকারভাবে মুখে পুরে দিলে!

ক্যাবলা বললে—দাঁড়াও—দাঁড়াও, চকোলেট খেয়ো একটু পরে। এই মাফলারটাকে চিনতে পারছ?

—চিনতে বয়ে গেছে আমার। চকোলেট চিবোতে চিবোতে টেনিদা বললে—যেমন বিচ্ছিরি দেখতে, তেমনি তেল-চিটচিটে, বুঝলি, কাগামাছিটা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হলে কী হয়, লোকটার কোনও টেস্ট নেই, নইলে অমন একটা বোগাস মাফলার গলায় জড়িয়ে রাখে!

ক্যাবলা বললে—দুত্তোর।

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে—থাম। —দুত্তোর দুত্তোর করিসনি। পায়ে ভীষণ ব্যথা করছে-কষ্ট হচ্ছে উঠে দাঁড়াতে। ওই যাচ্ছেতাই মাফলারটা দিয়ে আমার পাটা বেঁধে দে দিকিনি ।

এতক্ষণ পরে হাবুল সেনের মাথাটা যেন সাফ হয়ে গেল একটুখানি। হাবুল বললেহ-চিনছি তো। এই মাফলারটাই তো দেখছিলাম কদম্ব পাকড়াশির গলায়।

আমি বললুম-ঠিক—ঠিক।

টেনিদা বললে—তাই তো! আরে, এতক্ষণ তো খেয়াল হয়নি। সেই লোকটাই তো চকোলেট প্রেজেন্ট করে শিলিগুড়ি স্টেশনে আমাদের ঝাউবাংলোয় আসতে নেমন্তন্ন করেছিল। আর সে-ই তো কাগামাছির চীপ অ্যাসিস্টান্ট—সাতকড়ি সাঁতরার কী সব মুলোটুলো চুরি করবার জন্যে—

ক্যাবলা ততক্ষণে মাটিতে-পড়া গোটা দুই কাগজ কুড়িয়ে নিয়েছে। আমি দেখলুম, দুখানাই ছাপা কাগজ—হ্যাণ্ডবিল মনে হল। তাতে লেখা আছে।

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

বিখ্যাত গোয়েন্দা-লেখক

পুণ্ডরীক কুণ্ডুর

রহস্য উপন্যাস??

পাতায় পাতায় শিহরন—ছত্রেছত্রে লোমহর্ষণ ।

প্রকাশক জগবন্ধু চাকলাদার এন্ড কোং

১৩ নং হারান ঝম্পটি লেন, কলিকাতা-৭২

ক্যাবলার সঙ্গে-সঙ্গে আমি আর হাবুলও হ্যান্ডবিলটা পড়ছিলুম। ওদিকে টেনিদা তখন তেমনি নিশ্চিন্ত হয়ে চকোলেট চিবিয়ে চলেছে, বিশ্ব-সংসারের কোনও দিকে তার কোন লক্ষ আছে বলে মনে হল না।

পড়া শেষ করে ক্যাবলা বললে—এর মানে কী? এইবার আমার পালা। ক্যাবলা ভারি বেরসিক ছেলে, ডিটেকটিভ বই-টই পড়ে না, বলে বোগাস! হাবুলের সমস্ত মন পড়ে আছে ক্রিকেট খেলায়—সেও বিশেষ খবর-টবর রাখে না। কিন্তু আমি? আমার সব কণ্ঠস্থ! রামহরি বটব্যালের ‘রক্তমাখা ছিন্নমুণ্ড’, ‘কঙ্কালের হুঙ্কার’, ‘নিশীথ রাতের চামচিকে থেকে শুরু করে যদুনন্দন আঢ্যের ‘কেউটে সাপের ল্যাজ’, ‘ভীমরুল বনাম জামরুল, ‘অন্ধকারের কন্ধকাটা’—মানে বাংলাভাষায় যেখানে যত গোয়েন্দা বই আছে সব প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছি। আর পুণ্ডরীক কুণ্ডু? হ্যাঁ, তাঁর বইও আমি পড়েছি। তবে ভদ্রলোক সেরকম জমিয়ে লিখতে পারেন না, দাঁড়াতেই পারেন না রামহরি কিংবা যদুনন্দনের পাশে। কিন্তু তাঁর তক্তপোশের পোক্ত ছারপোকা

আমার মন্দ লাগেনি। বিশেষ করে সেই বর্ণনাটা যেখানে হত্যাকারীর তক্তপোশের নীচে গোয়েন্দা হীরক সেন একটা মাইক্রোফোন লুকিয়ে ফিট করে রেখেছিলেন ; হত্যাকারী ঘুমের ঘোরে কথা কইত, আর দু মাইল দূরে বসে গোয়েন্দা মাইক্রোফোনের সাহায্যে তার সব গোপন কথা শুনতে পেতেন।

দু নম্বর কাগজটাও ওই একই হ্যান্ডবিল! ক্যাবলা সেটাও একবার পড়ে নিলে। তারপর আবার বললে—এর মানে কী? এই হ্যান্ডবিল কেন? কে পুণ্ডরীক কুণ্ডু? জগবন্ধু চাকলাদার বা কে?

আমি বললুম—পুণ্ডরীক কুণ্ডু গোয়েন্দা বই লেখেন, কিন্তু ওঁর বই ভালো বিক্রি হয় না। আর জগবন্ধু চাকলাদার ওঁর পাবলিশার।

—হুঁ।

হাবুল ধুসো মাফলারটা নাড়াচাড়া করছিল, হঠাৎ 'উঃ বলে চেঁচিয়ে উঠে মাফলারটা ফেলে দিলে আর প্রাণপণে হাত ঝাড়তে শুরু করে দিলে।

আমি চমকে উঠে বললুমকী হল রে হাবলা? মাফলারের মধ্যে কী কোনও বিষাক্ত ইনজেকশন

—আর ফালাইয়া গো তোর বিষাক্ত ইনজেকশন! একটা লাল পিঁপড়ে আছিল, একখান মোক্ষম কামড় মারছে।

আহত পিপড়েটা তখন মাটিতে পড়ে হাত-পা ছুঁড়ছিল। ক্যাবলা একবার সেদিকে তাকাল, তারপর আমার কোটের দিকে তাকিয়ে দেখল। কিছুক্ষণ কী ভাবল—মনে হল, কী যেন একটা গভীর রহস্যের সমাধান করবার চেষ্টা করছে।

তারপর বললে—তোর কোটেও তো দেখছি কয়েকটা মরা পিঁপড়ে লেগে আছে প্যালা!

বললুম-বাঃ! গাছে উঠে ওদের সঙ্গেই তো আমাকে ঘোরতর যুদ্ধ করতে হচ্ছিল।

—হুঃ । আচ্ছা ভালো করে চারদিকের ঝোপজঙ্গল লক্ষ করে দেখ তো, এরকম পিপড়ে এখানে আছে কি না।

এতক্ষণ পরে টেনিদা বললে—কী পাগলামো হচ্ছে ক্যাবলা। কাগামাছিকে ছেড়ে শেষে পিঁপড়ে নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করবি নাকি? উঃ, কদম্বটাকে ঠিক জাপটে ধরেছিলুম—একটুর জন্যে—ক্যাবলা বললে—একটু থামো দিকি। কদম্ব আর পালাতে পারবে না, ঠিক ধরা পড়বে এবার। কী রে হাবুল, প্যালা, আর লাল পিপড়ে পেলি এখানে?

হাবুল বললে—না, আর দেখতে আছি না। বলতে বলতে হাবুলের পিঠ থেকে কী একটা ঝোপের ওপর পড়ল। দেখলুম, সেই পচা ডিমের খোলার একটা টুকরো।

হাওয়ায় সেটা উড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ক্যাবলা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে সেটাকে ধরে ফেলল। একমনে কী যেন দেখেই সেটাকে রুমালে জড়িয়ে বুক-পকেটে পুরে ফেলল।

টেনিদা বললেও আবার কী রে! পচা ডিমের গন্ধে প্রাণ যাচ্ছে—গিয়ে জামাকাপড় ছাড়তে পারলে বাঁচি, তুই আবার সেই ডিমের খোলা কুড়িয়ে নিচ্ছিস!

ক্যাবলা সে কথার জবাব দিলে না। বললে-টেনিদা, উঠতে পারবে?

—পারব মনে হচ্ছে! ব্যথাটা কমেছে একটুখানি।

—তবে চলো। আর দেরি নয়।

—কোথায় যেতে হবে?

—ঝাউবাংলোয়। এক্ষুনি।

আর সাঁতরামশায়? যদি তেনারে এর মইধ্যে কাগামাছি একেবারে লোপাট কইর‍্যা ফ্যালায়?—হাবুল সন্দিগ্ধ হয়ে জানতে চাইল।

আরে, কাগামাছি কো বাত আভি ছোড় দো! আগে ঝাউ বাংলোয় চলল। সব ব্যাপারগুলোরই একটা ক্লু পাওয়া যাচ্ছে মনে হয়—শুধু একটুখানি বাকি। সেটা মেলাতে পারলেই—

আর তখুনি একটা কথা আমার মনে পড়ল। বড় বড় লেখকের অটোগ্রাফ জোগাড় করবার বাতিক আছে আমার, সেই সুবাদে আমি বছর তিনেক আগে একবার পুণ্ডরীক কুণ্ডুর সালকিয়ার বাড়িতে গিয়েছিলুম। একটা জলচৌকির উপর উবু হয়ে বসে পুণ্ডরীক তামাক খাচ্ছিলেন, গলায় একটা ঢোলের মত মস্ত মাদুলি দুলছিল। ছবিটা চোখের সামনে এখনও জ্বলজ্বল করছে। গোয়েন্দা-গল্পের লেখক, অথচ শার্লক হোমসের মতো পাইপ খান না। বসে বসে হুঁকো টানেন আর তাঁর গলায় ঘাসের নীলচে রংধরা একটা পেতলের মস্ত মাদুলি থাকে, এটা আমার একেবারেই ভালো লাগেনি। কিন্তু সবটা এখন নতুন করে মনে জাগল, আর সেই সঙ্গে—

আমার মগজের ভেতরে হঠাৎ যেন বুদ্ধির একটা জট খুলে গেল। তা হলে—তা হলে—

আমি তখুনি কানেকানে কথাটা বলে ফেললুম।

আর ক্যাবলা? মাটি থেকে একেবারে তিন হাত লাফিয়ে উঠল। আকাশ ফাটিয়ে আর্কিমিডিসের মতো চিৎকার করল—পেয়েছি—পেয়েছি!

কী পেয়েছিস? হাবুলের কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছিল টেনিদা, চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল—কী পেলি-হাতি না ঘোড়া? খামকা চেঁচাচ্ছিস কেন ষাঁড়ের মতো?

ক্যাবলা বললো পাবার পেয়েছি। একেবারে দুইয়ে দুইয়ে চার—চারে চার আট!

—মানে?

—সব জানতে পারবে পনেরো মিনিটের মধ্যেই। কিন্তু তার আগে প্যালাকেও কনগ্রাচুলেট করা দরকার। ওর ডিটেকটিভ বই পড়ারও একটা লাভ আছে দেখা যাচ্ছে। কলকাতায় ফিরেই ওকে চাচার হোটেলে গরম-গরম কাটলেট খাইয়ে দেব।

টেনিদা বললে—উহু উহু, মারা যাবে। ওর ও-সব পেটে সইবে না। ওর হয়ে আমিই বরং ডবল খেয়ে নেব।

হাবুল মাথা নেড়ে বললে সত্য কথা কইছ। আমিও তোমারে হেলপ করুম। কী কস প্যালা?

আমি মুখটাকে গাজরের হালুয়ার মতো করে চলতে লাগলুম। এ-সব তুচ্ছ কথায় কর্ণপাত করতে নেই।

পুণ্ডরীককুণ্ড এবং রহস্যভেদ

ঝাউ বাংলোর কাছাকাছি এসে পৌঁছুতেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। সামনের বাগানের ভেতরে কাঞ্ছা যেন কী করছিল—আমাদের ফিরে আসতে দেখেই থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপরেই ভেতর দিকে টেনে দৌড়।

টেনিদা বললেও কী! আমাদের দেখে কাঞ্ছা অমন করে পালাল কেন! ক্যাবলা বললে—পালাল না, খবর দিতে গেল!

কাকে? ক্যাবলা হেসে বললেকাগামাছিকে।

হাবুল দারুণ চমকে উঠল।

—আরে কইতে আছ কী! কাঞ্ছা কাগামাছির দলের লোক?

—হুঁ। টেনিদা বললে—আর কাগামাছি লুকিয়ে আছে এই বাড়িতেই!

ক্যাবলা হেসে বললো হ্যাঁ, সবাই আছে এখানে। কাগামাছি, বগাহাঁচি, দুধের চাঁছি—কেউ বাদ নেই।

টেনিদা গম্ভীর হয়ে বললে—ঠাট্টা নয় ক্যাবলা! ওরা যদি আমাদের আক্রমণ করে?

—কী নিয়ে আক্রমণ করবে? ওদের সম্পত্তির মধ্যে তো একটা ভাঙা হুঁকো, একগাছা মুড়ো ঝাঁটা আর একপাটি কুকুরে-চিবুনো ছেড়া চটি। সে-আক্রমণ আমরা প্রতিরোধ করতে পারব।

-ইয়ার্কি করছিস না তো?

-একদম না। চলেই এসো না আমার সঙ্গে।

আমরা সিঁড়ি বেয়ে ঝাউ বাংলোর দোতলায় উঠে গেলুম। বাড়িতে কোথাও কেউ আছে বলে মনে হয় না। চারদিক একেবারে নিঝুম! কাঞ্ছা পর্যন্ত কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেছে। টেনিদা খোঁড়াচ্ছিল বটে, তবু সেই ফাঁকেই এক কোণা থেকে একটুকরো ভাঙা কাঠ কুড়িয়ে নিলে। আমি জিগগেস করলুম—ওটা দিয়ে কী হবে টেনিদা?

—ঝাঁটা আর হুঁকোর আক্রমণ ঠেকানো যাবে।

ক্যাবলা বললে—কিছু দরকার নেই। অনেক বড় অস্ত্র আছে আমার কাছে। এসো সবাই—

কী যে ঘটতে যাচ্ছে ক্যাবলাই শুধু তা বলতে পারে! আমি মনে-মনে কিছুটা আন্দাজ করছি বটে, কিন্তু এখনও পুরোটা ধরতে পারছি না। দুরু দুরু বুকে ক্যাবলার পেছনে-পেছনে চললুম আমরা। এন্তার গোয়েন্দা বই পড়েছি আমরা রামগড়ের সেই বাড়িতে আর ডুয়ার্সের জঙ্গলে। এর মধ্যে আমাদের দু-দুটো অভিযানও হয়ে গেছে, কিন্তু এবার যেন সবটাই কেমন বিদঘুটে লাগছিল। আর সাতকড়ি—

নিশ্চয় সেই লোক? এখন আর আমার কোনও সন্দেহ নেই। আর ওই হ্যান্ডবিলটা—

ক্যাবলা বললে—এখানে।

দেখলুম সেই বন্ধ ঘরটার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। যেটায় দু'দুটো পেল্লায় তালা লাগানো! সাতকড়ি যাকে বলেছিলেন স্ট্যাকরুম—মানে যার ভেতর বাড়ির সব পুরনো জিনিসপত্র ডাঁই করে রাখা হয়েছে। ক্যাবলা বললে—এই ঘর খুলতে হবে।

টেনিদা আশ্চর্য হয়ে বললে—এই ঘর? হাতি আনতে হবে তালা ভাঙবার জন্যে, আমাদের কাজ নয়।

ক্যাবলা মরিয়া হয়ে বললে—চারজনে মিলে ধাক্কা লাগানো যাক। তালা না খোলে, দরজা ভেঙে ফেলব।

ভাবছি চারজনে মিলে চার বছর 'মারো জোয়ান-হেঁইয়ো'-বলে ধাক্কা লাগলেও খোলা সম্ভব হবে কি না, এমন সময় কোত্থেকে নেহাত ভালো মানুষের মতো গুটিগুটি কাঞ্ছা এসে হাজির। যেন কিছুই জানে না, এমনি মুখ করে বললে—চা খাবেন বাবুরা? করে দেব?

তক্ষুনি তার দিকে ফিরল ক্যাবলা। বলল—চা দরকার নেই, এই ঘরের চাবিটা বার করো দেখি ।
—চাবি? কাঞ্ছা আকাশ থেকে পড়ল!—চাবি তো আমি জানি না।
ক্যাবলা গম্ভীর হয়ে বললে—মিথ্যে কথা বোলো না কাঞ্ছা, ওতে পাপ হয়। চাবি তোমার প্যান্টের পকেটেই আছে। স্ভড়স্ভড় করে বের করে ফেলো।
কাঞ্ছা পাপ-টাপের কথা শুনে একটু ঘাবড়ে গেল। মাথা-টাথা চুলকে বললে—জু। চাবি আমার কাছেই আছে তা ঠিক। কিন্তু মনিবের হুকুম নেই—দিতে পারব না।
—তোমাকে দিতেই হবে! কাঞ্ছা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল!—না, দেব না।
ক্যাবলা বললে—টেনিদা, কাঞ্ছা নেপালীর ছেলে, জান দিয়ে দেবে, কিন্তু মনিবের বেইমানি করবে না। কাজেই চাবি ও কিছুতেই দেবে না। অথচ, চাবিটা আমাদের চাই-ই। তুমি যদি পায়ের মচকানিতে খুব কাতর না হয়ে থাকো—তা হলে—
ব্যস, ওইটুকুই যথেষ্ট। টেনিদাকে আর উসকে দেবার দরকার হল না। ডি-লা গ্রান্ডি বলেই তক্ষুনি টপাং করে চেপে ধরল কাঞ্ছাকে, আর পরক্ষণেই কাঞ্ছার প্যান্টের পকেট থেকে বেরিয়ে এল চাবির গোছা।
কাঞ্ছা চাবিটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করল নির্ঘাত একটা দারুণ মারামারি হয়ে যাবে এবারে এই রকম আমার মনে হল। কিন্তু সে বিচ্ছিরি ব্যাপারটা থেমে গেল তক্ষুনি। কোথা থেকে আকাশবাণীর মতো মোটা গম্ভীর গলা শোনা গেল কাঞ্ছা, চাবি দিয়ে দাও, গোলমাল কোরো না।
চারজনেই থমকে গেলুম আমরা। কে বললে কথাটা? কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না।
আবার সেই গম্ভীর গলা ভেসে এল লম্বা পেতলের চাবি দুটো লাগাও। তা হলে বেশি পরিশ্রম করতে হবে না।
এবার আর বুঝতে বাকি রইল না।
হাবুল রোমাঞ্চিত হয়ে বললে—আরে, সাঁতরামশাইয়ের গলা শুনতাছি যে।
টেনিদা নাকটাকে কুঁচকে সরভাজার মতো করে বললে, মনে হচ্ছে যেন বদ্ধ ঘরটার ভেতর থেকেই।
ততক্ষণে বিদ্যুৎবেগে তালা দুটো খুলে ফেলেছে ক্যাবলা। দরজায় এক ধাক্কা দিতেই—
কে বলে স্ট্যাকরুম! খাসা একখানা ঘর। সোফা রয়েছে, খাটে ধবধবে বিছানা। ও-পাশে যেদিকে আমাদের শোবার ঘর সেদিকের বন্ধ দরজাটার মুখোমুখি ছোট একটা প্রজেক্টার! আর—আর সোফায় যিনি বসে আছেন তিনি সাতকড়ি সাঁতরা স্বয়ং! একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আমাদের দিকে।
ক্যাবলা বললে—নমস্কার পুণ্ডরীকবাবু। দাড়িটা খুলুন।
বিনা বাক্যব্যয়ে সাতকড়ি একটানে নকল সবুজ দাড়িটা খুলে ফেললেন। আর আমি পরিষ্কার দেখতে পেলুম সেই ভদ্রলোককেই তিন বছর আগে যাঁর শালকিয়ার বাড়িতে অটোগ্রাফ আনতে গিয়েছিলুম আর যিনি উবু হয়ে মোড়ার ওপর বসে বসে তামাক টানছিলেন।
টেনিদা আর হাবুল একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।
—আরে!-আরে!
—এইটা আবার কী রে মশায়।
ক্যাবলা বললে-তোমরা চুপ করো। এখনি সব বুঝতে পারবে। —কুণ্ডুমশাই!
গম্ভীর হয়ে সাতকড়ি বললেন-বলে ফেলো!
—আপনার সোফার পেছনে যিনি লুকিয়ে আছেন আর ঢুকেই যাঁর নাকটা আমি একটুখানি দেখতে পেয়েছি, উনিই বোধহয় জগবন্ধু চাকলাদার?
সাতকড়ি—না, না, পুণ্ডরীক কুণ্ড, ওরফে কুণ্ডুমশাই বললেন—ঠিক ধরেছ। তোমাদের বুদ্ধি আছে। ও জগবন্ধুই বটে।

—সোফার পেছনে ঘাপটি মেরে বসে উনি মিথ্যেই কষ্ট পাচ্ছেন! ওঁকে বেরিয়ে আসতে বলুন।

পুণ্ডরীক ডাকলেন—বেরোও হে জগবন্ধু।

জগবন্ধু সোফার পেছনে দাঁড়িয়ে উঠল! সেই মিচকে-গোঁফ ফিচকে চেহারা—শুধু গলার মেটে রঙের বিটকেল মাফলারটাই বেহাত হয়ে গেছে। কেমন বোকার মতো চেয়ে রইল আমাদের দিকে। এখন একদম নিরীহ বেচারা, যেন জীবনে কোনওদিন ভাজা মাছটি উলটে খায়নি!

সাতকড়ি বললেন—বসে পড়ো হে ছোকরা, বসে পড়ো। ওরে কাঞ্ছা, আমাদের জন্য ভালো করে চা আন। আচ্ছা এখন বলো দেখি, ধরে ফেললে কী করে?

ক্যাবলা বললে—এক নম্বর, আপনার পাইন বনের কবিতা আর কদম্ব পাকড়াশির ছড়া। আপনার কবিতা শুনেই মনে হয়েছিল, ছড়াগুলোর সঙ্গে এর যোগ আছে।

—হুঁ। তারপর?

—দু'নম্বর, আপনার অদ্ভুত ফরমুলা। বাড়িতে একখানা সায়েন্সের বই নেই, আছে একগাদা ডিটেকটিভ ম্যাগাজিন—অথচ.আপনি সায়েন্টিস্ট? আর ধাঁ করে আপনি থিয়োরি অব রিলেটিভিটির সঙ্গে জোয়ানের আরক মিলিয়ে দিলেন? আমরা অন্তত কলেজে পড়ি, এত বোকা আমাদের ঠাওরালেন কী করে? তখনি মনে হল, আপনি আমাদের নিয়ে মজা করতে চান—কাগামাছি-টাছি সব বানানো।

—বলে যাও।

—কত বলব? জগবন্ধুবাবুকে নিয়ে দার্জিলিঙে সিঞ্চলে আমাদের ছবি তুললেন সিনে ক্যামেরায়, পাশের ঘর থেকে প্রজেক্টার ফেলে ছবি দেখালেন, কাঞ্ছা না জগবন্ধু কাকে দিয়ে হাঁড়িচাঁচার ডাক শোনালেন কাগজের মুণ্ডু নাচালেন—

জগবন্ধু এইবার ব্যাজার গলায় বললো হাঁড়িচাঁচার ডাক আমি ডেকেছিলুম। কিন্তু তোমরাই বা মাঝরাতে আমার মাথায় জল ঢাললে কী বলে—হ্যাঁ, এখনও সর্দিতে আমার মাথা ভার, নাক দিয়ে জল পড়ছে।

ক্যাবলা বললে—তবু আপনার ভাগ্যি ভালো যে ইট ফেলিনি! মাঝরাত্তিরে লোককে ঘুমুতে দেবেন না ভেবেছেন কী? তারপর শুনুন কুণ্ডুমশাই! জগবন্ধুবাবুর ধুসো মাফলার টেনিদা কেড়ে নিয়েছিল—তা থেকে একটা লাল পিপড়ে হাবুলকে কামড়ে দিয়েছে। তখনই বোঝা গেল, গাছে উঠে কাঁচকলা বেঁধেছিল কে! তারপরে পচা ডিম। কিন্তু এই দেখুন—পকেট থেকে হাবুলের পিঠে লেগে থাকা সেই ভাঙা ডিমের খোলাটা বের করে বললে—দেখুন, এতে এখনও বেগুনে পেন্সিলে-লেখা নম্বর পড়া যায়—৩২। আপনার রান্নাঘরে ডিমের গায়ে এমনি নম্বর দেওয়া আছে, সে আমি আগেই লক্ষ করেছি।

পুণ্ডরীক বললে শাবাশ। আমি গোয়েন্দা-গল্প লিখে থাকি, তোমরা আমার শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা হীরক সেনকেও টেক্কা দিয়েছ। কিন্তু আমাদের পরিচয় পেলে কী করে?

ক্যাবলা বললে—এটা ভুলে যাচ্ছেন কেন, আপনারা সাহিত্যিক। সবুজ দাড়ি লাগালেও ভক্তরা আপনাদের চিনতে পারে—যেমন প্যালা চিনে নিয়েছে। তা ছাড়া এই দেখুন হ্যান্ডবিল—টেনিদা যখন জগবন্ধুকে চেপে ধরেছিল, তখন ওঁর পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। আর জানতে কী বাকি থাকে?

পুণ্ডরীক আর জগবন্ধু দুজনেই হাঁড়ির মতো মুখ করে চুপ করে রইলেন।

ক্যাবলা বললে—এবার বলুন আমাদের সঙ্গে এ-ব্যবহারের মানে কী?

শুনে খ্যাচ-খ্যাচ করে উঠলেন কুণ্ডুমশাই।

—এত বুঝেছ, আর এটুকু মাথায় ঢুকল না যে আমার বই ভালো বিক্রি হচ্ছে না—আমি আর জগবন্ধু—দুজনেরই মন মেজাজ খারাপ। বিলিতি বই থেকে টুকতে যাব, দেখি আমার আগেই যদুনন্দন আঢ্য আর রামহরি বটব্যাল সব মেরে দিয়ে বসে আছে। প্লট ভাবার জন্যেই এখানে এসেছিলুম। জগবন্ধুও আসছিল

আমার এইখানেই, পথে তোমাদের সঙ্গে দেখা। দেখে ওর মাথায় মতলব খেলে যায়—তোমাদের কাজে লাগিয়ে একটা সত্যিকারের গোয়েন্দা গল্প বানালে কেমন হয়? একটা কথা বলি কবিতা-টবিতা আমার একদম আসে না। জগবন্ধু পাবলিশার হলে কী হয়, মনে-মনে ও দারুণ কবি—ওগো পাইনটাও ওরই লেখা। ও-ই ছড়া লিখে তোমাদের ঘাবড়ে দেয় আমাকে সবুজ দাড়ি পরায়, সব প্ল্যান করে তক্কে থেকে আমরা তোমাদের সঙ্গে টাইগার হিলে আর সিঞ্চলে যাই, জগবন্ধু ছবি তোলে আর ছুঁচোবাজি ছাড়ে—তারপর তারপর তো দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু তোমরা সব ভণ্ডুল করে দিলে হে। আর একটু জমাতে পারলে আমার দুর্দান্ত একটা ডিটেকটিভ বই তৈরি হয়ে যেত।

কুণ্ডুমশাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন-আর সত্যজিৎ রায় মশাইকে ধরেটরে যদি সেটাকে ফিল্ম করা যেত—

ক্যাবলা চটে বললে—সত্যজিৎ রায় ওসব বাজে গল্প ফিল্ম করেন না। সে যাক—পচা ডিম ছুড়ে যে আমাদের জামা-টামা খারাপ করে দিলেন, ধোয়াবার খরচা এখন কে দেবে?

কুণ্ডুমশাই আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন—আমিই দেব। ওহে জগবন্ধু, একখানা চকোলেট বার করো দেখি, খেয়ে মনটা ভাল করি।

জগবন্ধু বললে চকোলেট কোথায় স্যার? পকেটে যা ছিল এরাই তো মেরে দিয়েছে।

তারপর?

তারপর আবার কী থাকবে? দুপুরে বজ্ববাহাদুর গাড়ি নিয়ে এল পুবং থেকে। আমরা সেই গাড়িতে চেপে তার ওখানে বেড়াতে গেলুম। তার বাড়িতে খুব খাওয়া-দাওয়া হল। তার নাম ভাবভঙ্গি যেমনই হোক, সে ভীষণ ভালো লোক কত যে আদর-যত্ন করলে সে আর কী বলব! তারপর সন্ধেবেলায় তারই মোটরে দার্জিলিঙে ফিরে এলুম। সেই স্যানিটোরিয়ামে।

কিন্তু আমাদের বোকা বানিয়ে পুণ্ডরীক কুণ্ডু গোয়েন্দা গল্প লিখবেন, তা-ও কি হতে পারে? তাই তিনি তাঁর উপন্যাস ছাপবার আগেই সব ব্যাপারটা আমি ‘সন্দেশে’ ছেপে দিলুম। তারপরেও যদি কুণ্ডুমশাই বইটা লিখে ফেলেন, তা হলে আমি তার নামে গল্প চুরির মোকদ্দমা করব।

আর তোমরাও তখন আমার পক্ষেই সাক্ষী দেবে নিশ্চয়।